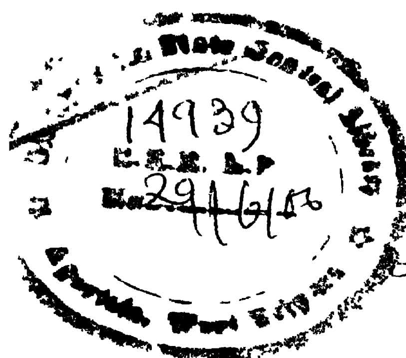
পাঁচ পুরুষের উপাখ্যান

(উপন্যাস)

মুকুল খাসনবিশ



মানবী প্রকাশনী
শহীদ ক্ষুদিরাম বসু লেন,
আগরতলা - ৭

PANCH PURUSHER UPAYKHAN
BY MUKUL KHASNOBISH
(A Bengali Novel)

পাঁচ পুরুষের উপাখ্যান

বাংলা উপন্যাস	ঃ	মুকুল খাসনবীশ
প্রকাশক	ঃ	কল্যাণী ভট্টাচার্য মানবী প্রকাশনী শহীদ ক্ষুদিরাম বসু লেন, আগরতলা ৭
প্রকাশ কাল	ঃ	৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	উদয়শঙ্কর ভট্টাচার্য
মূল্য	ঃ	একশত বিশ টাকা মাত্র
অক্ষর বিন্যাস	ঃ	ইউনিক কম্পিউটার, ধলেশ্বর আগরতলা, রোড নং-৫
মুদ্রণ	ঃ	উদয়ন প্রেস কলিকাতা - ১৪
প্রাপ্তিস্থান	ঃ	মানবী প্রকাশনী ধলেশ্বর এস. কে. বি লেন আগরতলা মকুল খাসনবীশ ধলেশ্বর রোড নং - ১১, আগরতলা।

উৎসর্গ

আমার পরম পূজনীয় পরলোকগত পিতৃদেব
রাজেন্দ্র চন্দ্র খাসনবিশ-এর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে
এই দীন রচনাখানি উৎসর্গ করা হল।

।। ভূমিকা ।।

শাশ্বত আবেদন রাখতে পারে এমন কোন ভাব বা বিষয় হয়ত আমার এ রচনায় বিধৃত নয়। আবার লেখক-সুলভ যে গুণ সামান্যকে অসামান্য করে তুলতে পারে, আমার মধ্যে সেরকম গুণের একান্তই অভাব বলেই আমি মনে করি। তাই আমার ধারণা, সাহিত্যের গুণমানের নিরিখে আমার এই রচনা গুণমানহীন বলেই গণ্য হবে। তবু যে লিখলাম, তার কারণ এই গ্রন্থের কিছুসংখ্যক চরিত্র কাল্পনিক নয়। রক্তমাংসের মানুষ রূপে তারা একসময় এই পৃথিবীতে বর্তমান ছিল। শৈশবে এদের কাহিনী একজন বৃদ্ধা আত্মীয়ার মুখে গল্পকথার মত শুনে ছিলাম। যদিও এই কাহিনীর সব কথা বুঝার মত বয়স তখন আমার ছিল না। কিন্তু এই কাহিনী আমার শিশুমনে বিশেষ দাগ কেটেছিল। পরিণত বয়সে স্বাভাবিকভাবেই জীবন সংগ্রামে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেও কাহিনীটা স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায় নি। মনের গহনে এদের কথা লিখে রাখার একটা সুপ্ত বাসনা ছিল। তাই অবসরজীবনে অপটুহস্তে আমার এই লেখনী ধারণ।

এই গ্রন্থের গুণাগুণ ব্যাখ্যা ও মুদ্রণ ব্যাপারে আমি যাদের কাছে সাহায্য ও প্রেরণা পেয়েছি, তাদের কথা উল্লেখ করতেই হয়। এ ব্যাপারে প্রথমেই অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় দিলীপ ভট্টাচার্যের নাম স্মরণ করছি। দিলীপবাবু ধৈর্য্য ধরে আমার এই গ্রন্থের পান্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছেন এবং নিরপেক্ষ সমালোচনার মাধ্যমে আমার ত্রুটি বিচ্যুতি বিষয়ে আমাকে অবহিত করে সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। এজন্য শ্রীযুক্ত দিলীপবাবুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থ মুদ্রণ ব্যাপারে আমার মনে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল তা কাটিয়ে উঠার জন্য আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগীতা করেছেন রিজিওন্যাল ইন্স্টিটিউট অফ্ ফার্মাসৌউটিক্যাল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির গার্লস হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্ট শ্রীমতী গৌরী চন্দ। এজন্য শ্রীমতী চন্দের কাছেও আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রইলাম।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বপন কুমার খাসনবীশও আমার গ্রন্থটি মনোযোগসহকারে পাঠ করেছে এবং বিশেষ ভুল প্রমাণগুলো উল্লেখ করে সংশোধন ব্যাপারে আমাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছে। আর এই গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যাপারে আমার ভ্রাতৃষ্পুত্র শ্রীমান অরিন্দম আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছে। বস্তুতঃপক্ষে তার ঐকান্তিক আগ্রহেই গ্রন্থটির মুদ্রণ সম্ভবপর হয়েছে। তবে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃষ্পুত্র আমার স্নেহভাজন বলে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন উঠে না।

মুকুল খাসনবীশ
ধলেশ্বর, রোড নং ১১
আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
ফোন নং - ২৩২-০৪০২

আগরতলা,
৫ই সেপ্টেম্বর ২০০৫ ইং

লেখিকা পরিচিতি

মুকুল খাসনবীশের জন্ম ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ ইং সনের অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারী নামক গ্রামে। তৎকালীন সময়ে গ্রামে মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য পাতুয়ারী গ্রামে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর তিনি কিশোরগঞ্জের সরযূ বিদ্যানিকেতন গার্লস স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যথারীতি কলেজে ভর্তি হয়ে পরীক্ষা দেওয়ার আগেই দুর্ভাগ্যক্রমে ভ্রাতৃবিয়োগ, পিতৃবিয়োগ এবং দেশের প্রতিকূল পরিস্থিতি ইত্যাদি কারণে একান্ত অসহায় হয়ে ত্রিপুরায় এসে আশ্রয়ে গ্রহণ করেন এবং সৌভাগ্যক্রমে ত্রিপুরা সরকারের অধীনে শিক্ষকতার চাকরী পেয়ে যান, কিন্তু পড়াশুনার অদম্য বাসনা ও একাগ্রতা থাকার দরুণ সরকারী দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পড়াশুনা চালিয়ে নিয়ে ১৯৬৯ ইং সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর ত্রিপুরার বিভিন্ন স্কুলে চাকরী করে ১৯৯৬ ইং সনে বোধজং উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকার পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর অবসর জীবনে কিছু কিছু লেখালেখি শুরু করেন এবং তার রচিত কিছু গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাছাড়া 'স্মরণ' নামক তার রচিত একটি কবিতাগ্রন্থও প্রকাশিত হয়। 'পাঁচ পুরুষের উপাখ্যান' উপন্যাসখানি তার দেখা ভুবন-এরই চিত্রলিপি। লেখিকার রচিত প্রথম উপন্যাসও বটে। পাঠক-পাঠিকার ভাল লাগলেই এ গ্রন্থ প্রকাশ সার্থক বলে মনে করব।



প্রকাশিকা

শান্ত নদী ফুলেশ্বরী, স্বচ্ছ তার জলধারা। নদীর দক্ষিণ পারে সমৃদ্ধ গ্রাম নীলগঞ্জ আর উত্তর পারে মস্ত বাজার। বাজারের নামও নীলগঞ্জ। সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রাজচন্দ্র মজুমদার এই নীলগঞ্জ গ্রামেরই বাসিন্দা। তিনি সমস্ত গ্রামবাসীর অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। গ্রামের সব মানুষই ভালমন্দ, বিপদ-আপদ, ঝগড়া-কাজিয়া ইত্যাদি সবকিছুর সমাধানের জন্য রাজচন্দ্রের কাছে ছুটে আসে এবং তিনিও একান্ত আপনজনের মতই সবসময় তাদের সবরকম সাহায্য করেন। এজন্য সবাই রাজচন্দ্রকে সমস্ত গ্রামের অভিভাবক বলেই মনে করে ।

ফুলেশ্বরী নদীর বুকে উত্তরে দক্ষিণে পাকা সেতু। নাম চণ্ডীর পুল। যে সময়ের এই কাহিনী, সে সময়ে গ্রামেগঞ্জে এরকম পাকা সেতু দেখা যেত না। শীতকালে বাঁশের সাঁকো আর বর্ষায় নৌকা ছিল গ্রামবাসীর নদী পারাপারের ব্যবস্থা। কিন্তু নীলগঞ্জ গ্রামের লোকেদের জন্য ছিল পাকা সেতু। এই পাকা সেতু তৈরীর পিছনে একটি ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র ইতিহাস রয়েছে।

চণ্ডী নামে ক্ষেপা স্বভাবের এক জেলেনী ছিল। সে বালবিধবা। তিনকুলে তার কেউ ছিল না। নদীর পারে বাজারের কাছে বাপের একটা চালাঘর ছিল। সেই চালাঘরেই তার বাস। দেখতে সে ছিল বড়ই কুরূপা। ঢেঙ্গা রোগা চেহারা,ধূমসা কালো গায়ের রং, উচুঁ দাঁত, মাথায় রুক্ষ কটা ঘন দীর্ঘ চুল। যেমন কুৎসিৎ চেহারা তার তেমনি অপয়া সে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার মা মরেছে। এক বিধবা পিসী তাকে লালন পালন করছিল। কিন্তু চণ্ডীর ভাগ্য দোষে তার ছয়মাস বয়সে সেই পিসীটাও হঠাৎ গেল মরে। বাপ লক্ষণ দাস ছয়মাসের শিশু চণ্ডীকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়ে গেল। চণ্ডী বাপের একমাত্র সন্তান। তাই যত দুর্ভাগাই হউক, বাপের ছিল সে নয়নের মণি। তাই বহু দুঃখে কষ্টে বাপ তাকে কোনমতে বড় করে তুলল। বাপের অবস্থা একেবারে খারাপ ছিল না। কিন্তু চণ্ডী দুর্ভাগা বলেই বাপ চালাঘরটা ছাড়া তার জন্য আর কিছুই রেখে যেতে পারেনি। চণ্ডী কুরূপা অপয়া যাই হউক না কেন, বাপের কাছে সে বড়ই আদরের ছিল। তাই বাপ যা কিছু সম্পত্তি ছিল সব বিক্রি করে অতিকষ্টে কুরূপা মেয়েকে সুপাত্রে পাত্রস্থ করেছিল। কিন্তু চণ্ডীর ভাগ্যে স্বামীর ঘর করার সুখ সইল না। বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই হঠাৎ কলেরা হয়ে তার যুবক স্বামী মারা গেল। অপেয়া বলে শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা চণ্ডীর বাপের দেওয়া সব জিনিসপত্র রেখে চণ্ডীকে

তাড়িয়ে দিল। বিধবা চণ্ডী একবস্ত্রে বাপের ঘরে ফিরে এল। মনের দুঃখে কিছুদিন যেতে না যেতে বাপ ও গেল মরে। বাপের মৃত্যুতে চণ্ডীর সহায় সম্বল বলে আর কিছুই রইল না। তবে নিজের এই ভাগ্যবিড়ম্বনায় চণ্ডীর কিন্তু মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বাপের চালাঘরে একা নির্ভয়ে রাত কাটায় , আর দিনের বেলা গান গেয়ে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে অন্নসংস্থান করে। ভগবান চণ্ডীকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করলেও একদিকে তাকে একটি গুণ দিয়েছেন। সে বড়ই সুকণ্ঠী.চণ্ডী যখন ভজন, কীর্তন ও দেহতত্ত্বের গান গায়, তখন তার গান শোনার জন্য চারপাশে লোক জমে যায়।

নিজের দুর্ভাগ্য, দারিদ্র ও একাকীত্বের জন্য উদ্ভট স্বভাবের চণ্ডীর কোন ভাবনা চিন্তা ছিল না। তার ছিল শুধু রোজগারের ধান্দা এবং অস্বাভাবিক কৃপণতা। সারাদিন সে অক্লান্ত পরিশ্রম করত। রাত জেগে জাল বুনে বিক্রী করত। জেলেদের মাছ কুটে শুকিয়ে শুঁটকী করে দিয়ে ভাল পয়সা রোজগার করত। অবার অবসর মত গৃহস্থের বাড়ীতে ধান ভানা, চাউল ঝাড়া ইত্যাদি কাজ করেও সে তার আয় বাড়াত। একদণ্ড সময়ও সে বসে কাটাত না। আর রোজগারের একটি পয়সাও সে খরচ করত না। সবই জমিয়ে রাখত। গান গেয়ে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে যা পেত ,তা দিয়ে কায়ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করত। এমনিতে কেউ কোন সাহায্য করতে চাইলে সে কখনই তা গ্রহণ করত না। গান না গেয়ে কখন ভিক্ষাও নিত না।

চণ্ডীর কুৎসিত চেহারা, ক্ষেপা স্বভাব, অকারণে অক্লান্ত শ্রম,উদ্দেশ্যহীন সঞ্চয় প্রবণতা, ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে গ্রামের মধ্যে সে এক উপহাসের পাত্রী ছিল। এজন্য অনেকে অনেক কথা বলে তাকে ক্ষেপাত। তার নামে ছড়া কাটত, তাকে উদ্দেশ্য করে ঢিল ছুঁড়ত । চণ্ডীর মধ্যে অবশ্য তাতে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যেত না। সে সব সময়ই নির্বিকার, আপন ভাবে বিভোর, অকারণে তার এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনী ও সঞ্চয়ের লিপ্সার জন্য অনেকে আবার করুণাও করত। কার জন্য কেন সে এত পরিশ্রম করে সঞ্চয় করছে। এসব কথা বুঝালেও তার মতিগতির কোন পরিবর্তন হত না। টাকা জমানো তার দারুণ নেশা, এই নেশায় সে মশগুল। সঞ্চয় করা ছাড়া তার জীবনে অন্য আর কোন চাহিদা ছিল না।

ছোটজাতের মেয়ে হলেও চণ্ডী বড় ভক্তিমতী। সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার পরে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে ভিক্ষান্ন ফুটিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে

প্রসাদ পেত। এই তার সারাদিনের আহার। দিনের বেলা সে জলটুকুও গ্রহণ করে না। দেবদ্বিজেও তার অচলা ভক্তি। সারাদিন কাজ করে ঘরে ফেরার আগে ব্রাহ্মণ রাজচন্দ্রকে রোজ সে প্রণাম করে যায়। এ নিয়মের কোনদিন ব্যতয় ঘটে না। রাজচন্দ্র গৃহী সাধক। তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি স্বচ্ছ। তাই একমাত্র তিনিই বুঝতে পেরেছিলেন যে চণ্ডী মোটেই ক্ষেপী নয়। সে এক উচ্চকোটির সাধিকা। জন্মান্তরের সুকৃতীর ফলেই তার সংসারের সব বন্ধন ঘুচে গেছে। ক্ষেপামীর আবরণে সে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে।

চণ্ডী সম্বন্ধে রাজচন্দ্রের এই ধারণার কথা তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেননি। কারণ সাধারণ মানুষ এসব কথা বুঝতেতো পারবেই না বরং একথা জানলে চণ্ডীর প্রতি তাদের উপহাসের মাত্রা আরও বেড়ে যাবে। পরবর্তী সময়ে এই ছোট জাতের মেয়ে চণ্ডীই রাজচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা বালবিধবা নবদুর্গার কানে গোপনে কৃষ্ণমন্ত্র দিয়ে বালিকা নবর অন্তরে কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ ঘটিয়েছিল এবং চণ্ডীর প্রভাবেই নবদুর্গা তার ব্যর্থ জীবন শ্যামসুন্দরের চরণে উৎসর্গ করে শান্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল। ব্রাহ্মণ কন্যা নবদুর্গার জীবনে জেলেকন্যা চণ্ডীর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ চণ্ডীই ছিল নবদুর্গার যথার্থ গুরু। তাছাড়া রাজচন্দ্রের নাত বউ শৈলবালাও চণ্ডীর কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

চণ্ডীর বয়স যখন প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি তখন একদিন সে গ্রামের বাবুলোকদের কাছে তার এক অদ্ভুত বাসনার কথা নিবেদন করল এবং তার বাসনা পূরণের জন্য সে বাবুলোকদের সাহায্যও প্রার্থনা করল। চণ্ডীর বাসনা তার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে গ্রামের লোকদের নদী পারাপারের সুবিধার জন্য সে একটি পাকা পুল তৈরী করতে চায়। কারণ বর্ষায় যখন নদীর জলের স্ফীতি ঘটে, তখন প্রতি বছরেই নৌকায় পারাপারের সময় একজন না একজন নৌকাডুবি হয়ে ফুলেশ্বরীর জলে তলিয়ে যায়। প্রতি বছরই ফুলেশ্বরী যে একটি মানুষকে গ্রাস করে তাতে চণ্ডী বড়ই মর্মবেদনা অনুভব করে। এই দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যই চণ্ডী নদীতে একটা মজবুত পুল তৈরী করতে চায়। কিন্তু সে ছোট জাতেব মূর্খ মেয়েমানুষ। টাকাটা দিতে পারলেও কাজটুকুতো করার সাধ্য তার নেই। তাই চণ্ডীর প্রার্থনা , বাবুলোকরা যদি উদ্যোগ নিয়ে কাজটুকু করে দেন,তবেই চণ্ডীর মনোবাসনা পূর্ণ হতে পারে।

ক্ষেপী চণ্ডীর এই মহৎ পরিকল্পনার কথা শুনে বাবুলোকরাতো বটেই,সমস্ত

গ্রামবাসীই বিস্ময়ে হতবাক্। পাগলী চণ্ডী যে এতবড় একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এতদিন ধরে তিল তিল করে সঞ্চয় করেছে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। যে চণ্ডী চিরকাল সমস্ত গ্রামবাসীর তামাশার পাত্রী ছিল, সেই চণ্ডীই লোকহিতের জন্য তার দানের এই প্রস্তাবে সবার অন্তরে রাতারাতি শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সবাই চণ্ডীকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। চণ্ডীর অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ চিরদিনই নিন্দা প্রশংসা তার কাছে সমান।

সারা জীবন কঠোর পরিশ্রমে ও স্বল্পাহারে চণ্ডীর শরীর ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে গিয়েছিল। জীবনের বেলা যে প্রায় শেষ, এটা বুঝতে পেরেই চণ্ডী তার সঞ্চিত অর্থের সদব্যবহারের জন্য বাবুদের সাহায্য প্রার্থনা করল। আর চণ্ডীর ভাগ্য গুণে তার সদিচ্ছা পূর্ণ করার জন্য বাবুরাও দ্রুত উদ্যোগ নিলেন।

পুলের কাজ শুরু হওয়ার পর চণ্ডী আর জাল বুনে না, শুটকী তৈরী করে না, গান গেয়ে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষাও করে না, দিনের যে কোন সময় শুধু একবার রাজচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়ে "নবদিদি কোথায় গো?" বলে ডাক দেয়। ডাক শুনেই কিছু চাল তরকারী নিয়ে নবদুর্গা বেরিয়ে আসে। আর চণ্ডী হাসিমুখে আঁচল মেলে ধরে, নব চণ্ডীর মেলে ধরা আঁচলে চাল তরকারী ঢেলে দেয়। চণ্ডী 'রাধাগোবিন্দ' বলে নবর দেওয়া চাল তরকারী নিয়ে বাড়ী চলে যায় এবং তাতেই একাহারী চণ্ডীর খাওয়ার সংস্থান হয়। চণ্ডী এমনিতে কারো কাছে কিছু গ্রহণ করে না, তবে নবর কথা আলাদা। নবতো আসলে তার শিষ্যা। নব যা দেয় তা গুরু দক্ষিণা হিসাবেই গ্রহণ করে চণ্ডী।

পুল তৈরী হচ্ছে দেখে চণ্ডীর মনে আনন্দ আর ধরে না। অসুস্থ শরীর নিয়ে সারাদিন নদীর পারে বসে থেকে সে পুলের কাজ দেখে। তারপর একদিন পুল তৈরীও হয়ে যায়। যেদিন পুলের কাজ শেষ হয়ে গেল সেদিন চণ্ডীর কি আনন্দ। আনন্দে তার কোটরাগত চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এল। চণ্ডীর চোখের জল দেখে লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেল, কারণ এর আগে চণ্ডীকে কেউ কাঁদতে দেখেনি। পুলের নাম দেওয়া হল 'চণ্ডীর পুল'। চণ্ডী অবশ্য এই নাম নিয়ে আপত্তি করেছিল। কিন্তু তার এই আপত্তি কেউ মেনে নেয়নি। তাই পুলের ঐ নামটিই বজায় রইল।

যেদিন থেকে পুলের উপর দিয়ে লোকের যাতায়াত শুরু হল তার ঠিক দুইদিন পরেই চণ্ডী মারা গেল। চণ্ডী নেই। কিন্তু তার তৈরী পুল গ্রাম ও বাজারের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। তাই ফুলেশ্বরী নদীর কথা, নীলগঞ্জ গ্রামের

কথা,রাজচন্দ্রের পরিবারের কথা বলতে গেলে অনিবার্যভাবেই জেলেনী চণ্ডীর কথা এসে পড়ে। কারণ নীলগঞ্জ গ্রাম ও রাজচন্দ্রের পরিবারের সঙ্গে ছোটজাতের মেয়ে চণ্ডী ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

নীলগঞ্জ খুবই সমৃদ্ধ গ্রাম। এই সমৃদ্ধির মূলে আছে গ্রামের জমির উর্বরতা। গ্রামের ক্ষেতগুলোতে ধান, পাট,তিল. সরিষা, কলাই,আঁখ, তামাক ইত্যাদি বহুবিধ ফসলের সবুজ সমারোহ। ক্ষেতের আলে, পথের ধারে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল, বেল, তাল তেঁতুল, শিমূল, কদম ইত্যাদি আর ও নানারকমের বড় বড় গাছ । তাছাড়া আছে প্রচুর বেত ও বাঁশের ঝাড়। আগাছার ঝোপজঙ্গলও নেহাৎ কম নেই। এই ঝোপজঙ্গলগুলোতে বাস করে বিষধর সাপ,গোসাপ, বনবিড়াল, সজারু ইত্যাদি নানান বন্য প্রাণী। রাত্রে ঝোপগুলোর পাশ দিয়ে চলতেহলে সাপের ভয়ে গ্রামের মানুষদের সতর্ক হয়ে পথ চলতে হয়। ঝোপজঙ্গলগুলোতে বন্যপ্রাণীর ভয় যেমন আছে, তেমনি সৌন্দর্য্যও আছে। কারণ সব ঋতুতেই ঝোপগুলোতে ফুটে থাকে অজস্র নানা রংএর বন্যফুল। এই বাহারী রং এর ফুলগুলোর জন্য ঝোপগুলোকে ভারী সুন্দর দেখায়। তাছাড়া বিশেষ সময়ে শিমূল গাছে, কদম গাছে যখন ফুল ফুটে, ক্ষেত খামারগুলো রকমারী ফসলে ভরে উঠে, তখন গ্রামটির শোভা হয় অপরূপ। যেমন শ্রী তেমনি এক অনাবিল শান্তি বিরাজমান গ্রামটির আকাশে বাতাসে, পথেঘাটে এবং মানুষের মনে। মনে হয়, নীলগঞ্জ গ্রামখানি যেন সৌন্দর্যের ভান্ডার, শান্তির পারাবার। শুধু নীলগঞ্জই নয়। আসলে পূর্ববঙ্গের সব গ্রামগুলোই শান্ত, স্নিগ্ধ ও প্রাকৃতিক সৌন্দযের্র আধার। পূর্ববঙ্গের গ্রামের মত এমন শান্ত;স্নিগ্ধ সবুজ গ্রাম বোধ হয় ভূভারতে আর কোথাও নেই।

নীলগঞ্জ গ্রামের বসতিও খুবই সুবিন্যস্ত। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারটি প্রধান পাড়ায় গ্রামটি বিভক্ত। চারটি পাড়াতেই ব্রাহ্মণ; কায়স্থ, কামার, কুমার ছুতার, তেলী, মালী, কৈবর্ত, নমশূদ্র, মুসলমান ইত্যাদি সব শ্রেণীর লোক বাস করে। আবার প্রত্যেক প্রধান প্রধান পাড়াতেই বামুনপাড়া, কায়স্থ পাড়ামালীপাড়া ইত্যাদি ভাগ আছে। প্রত্যেকে যে যার বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকানির্বাহ করে। তাছাড়া প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর জমিজমা আছে। তাই স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যাপারে কারো কোন অসুবিধা নেই। গ্রামবাসীদের সবার সঙ্গেই সবার প্রীতির সম্পর্ক। ঝগড়া বিবাদ দৈবাৎ হলেও তা মিটে যায়। বিপদে আপদে সবাই সবার

পাশে দাঁড়ায়, সবাই শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে।

শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়েও গ্রামটিকে উন্নতই বলা যায়। গ্রামে একটি পাঠশালা ও একটি মাইনর স্কুল আছে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব ছেলেই স্কুল গুলোতে পড়তে পারে। তবে মেয়েদের স্কুলে পড়ার কোন সুযোগ ছিল না। গ্রামের উচ্চবর্ণের পরিবারগুলোতে উচ্চশিক্ষার প্রচলনও ছিল। উচ্চবর্ণের পরিবারের ছেলেরা প্রায়ই শহরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করত। কাজেই নীলগঞ্জগ্রাম তৎকালীন যুগেও শিক্ষাদীক্ষায় যথেষ্ট উন্নত ছিল। সবদিক দিয়েই তখনকার দিনে নীলগঞ্জ ছিল একটি আদর্শ গ্রামে।

এই নীলগঞ্জ গ্রামেরই উত্তরপাড়ার বাসিন্দা ব্রাহ্মণ বংশীয় রায়পরিবার। তবে এই পরিবার এ গ্রামের আদিবাসিন্দা নয় এরা রাজচন্দ্র মজুমদারের দৌহিত্রবংশ। মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারসূত্রে রায় পরিবার এই গ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। রায়দের মাতামহ রাজচন্দ্র মজুমদার যেমন বিত্তবান ছিলেন, তেমনি ছিলেন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী। সৌম্য সুদর্শন রাজ প্রতিটি মানুষের কাছেই ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। গ্রামের মানুষের বিপদে আপদে উদার হৃদয় রাজচন্দ্রের সাহায্যের হাত সদা সর্বদা প্রসারিত থাকত। রাজ ছিলেন সমস্ত গ্রামবাসীর পিতৃস্বরূপ।

রাজচন্দ্রের পৈতৃক বিষয় আশয় বিশেষ কিছুই ছিল না। উদ্যোগী পুরুষ রাজচন্দ্র শুধুমাত্র নিজের বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের গুণে বিত্তবান হয়েছিলেন। শুধু বুদ্ধি ও উদ্যমই নয়, ব্যক্তিত্বে, সততায় ও চারিত্রিক মাধুর্য্যে ও তিনি ছিলেন অনন্য। তাই স্বাভাবিকভাবেই ধীর স্থির গৌরকান্তি এই ব্রাহ্মণের প্রতি লোকের মনে একটা শ্রদ্ধার ভাব সদাজাগরুক ছিল।

রাজচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র দুই ভাই। আকৃতি ও প্রকৃতিতে দুইভাইয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশী। রাজচন্দ্র অনিন্দ্যকান্তি, আর ঈশানের চেহারা নেহাৎ সাদামাটা। বুদ্ধি, উদ্যম, কর্মতৎপরতা,উদারতা,মিতভাষিতা ইত্যাদি যে সদ্গুণগুলো রাজের চরিত্রে বিদ্যমান, ঈশানের চরিত্রে ছিল সেগুলোর একান্ত অভাব। সে অলস, অকর্মন্য, অপরিণামদর্শী অমিতব্যয়ী, অমিতভাষী ও কিছুটা লোভ পরায়ণ। তাই স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামে রাজচন্দ্রের মত প্রভাব প্রতিপত্তি ঈশানের ছিল না। অলসতা ও অকর্মণ্যতার জন্য আর্থিক দিক দিয়েও সে ছিল বড়ই দুর্বল। ফলে দাদা রাজচন্দ্রের উপর সে ছিল নির্ভরশীল।উদারহৃদয় রাজচন্দ্র

ঈশানের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ছিলেন। তাই কনিষ্ঠের প্রতি ঐকান্তিক স্নেহবশতঃ তিনি তার সম্পত্তির ছয় আনা অংশ দলিল পত্র করে ছোটভাইকে দান করে দিয়েছিলেন।

নিজগুণে রাজচন্দ্র জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, আর নিজদোষে ঈশান প্রতিষ্ঠা লাভে বঞ্চিত ছিলেন। তবে একদিকে রাজচন্দ্রের জীবনে ছিল বড়ই ব্যর্থতা আর ঈশানের জীবনে ছিল সার্থকতা। দৈবপ্রতিকূলতায় রাজ নিঃসন্তান, আর দৈবআনুকূল্যে ঈশান বহু সন্তানের জনক।

সন্তানের জন্য রাজের মনে গভীর দুঃখ,তার বহুকষ্টার্জিত বিষয় সম্পত্তি ভোগ করার জন্য কোন উত্তরাধিকারী নেই। ধনে মানে সফল হলেও রাজের হৃদয় শূন্য। আর ঈশানের ধন মান না থাকলেও সন্তান সুখে সে সুখী। তার মনে নিশ্চিন্ত আশা যে আপাততঃ দাদা ছয় আনা দিলেও ভবিষ্যতে তার সন্তানরাই হবে দাদার সমস্ত সম্পত্তির মালিক। দাদার সম্পত্তির মোহও তাকে খানিকটা উপার্জন বিমুখ করে তুলেছিল।

ঈশান তার এই মনোভাব প্রাণপণে গোপন রাখতে চাইলেও তা গোপন থাকতনা। কথাবার্তায় আচার আচরণে তা প্রায়ই প্রকাশ হয়ে পরত। ভাইয়ের এই মনোভাব রাজচন্দ্রের বড়ই মনঃপীড়ার কারণ হত। কিন্তু এতে বলার কিছু ছিল না। সবই তাঁর দুর্ভাগ্য। ঈশান পুত্রকলত্র নিয়ে দাদার উপর খেয়ে পড়ে দিব্যি আরামে আয়াসে দিন কাটায়। তার কোন চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। দাদার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ নেই, এতটুকু হৃদয়ের টান নেই। সন্তানহীন বিত্তবান দাদার প্রতি বরং একটা উপেক্ষার ভাব আছে। ভাইয়ের আচরণে রাজচন্দ্র মনে মনে দুঃখ পান। কিন্তু প্রকাশ করেন না কিছুই।

সন্তানের জন্য রাজচন্দ্রের মনে যে গভীর দুঃখ তা ঘনিষ্ঠ দু'একজন ছাড়া তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেন না। কারণ যে দুঃখ নেহাৎ দৈবায়ত্ত, তা বলে বেড়ালে সহানুভূতির পরিবর্তে করুণা ও অবহেলাই ভাগ্যে জুটবে। তাই মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখা ভাল মনে করেন রাজচন্দ্র।

রাজচন্দ্রের সময়ে বাল্যবিবাহ প্রথাই প্রচলিত ছিল। তাই কুড়ি একুশ বছর বয়সেই অনেকের ঘরেই সন্তান এসে যেতো। রাজচন্দ্রের বয়স এখন চল্লিশের কাছাকাছি। কাজেই রাজচন্দ্রের ঘরে এখন সন্তান আসবে এমন আশা কেউই করে না। তাই রাজচন্দ্রের বিপুল বিষয় আশয়ের ভবিষ্যৎ মালিক যে ঈশানের

পুত্ররা, তা সবাই ধরে নিয়েছে। তবে রাজচন্দ্র নিজে এখনও মনে মনে আশা ছাড়েন নি। রাজচন্দ্র দেবী দশভুজার একনিষ্ঠভক্ত। দেবীর ঘট প্রতিষ্ঠিত তার ঘরে। নিত্য দেবীর পূজা অর্চনা না করে তিনি জল গ্রহণ করেন না : দেবীর চরণে সন্তান লাভের জন্য ব্যাকুল রাজচন্দ্র গোপনে প্রার্থনা জানান।

রাজচন্দ্রের মনের গভীর দুঃখ ও গোপন প্রার্থনার কথা জানে শুধু স্ত্রী হৈমবতী ও বাল্যবন্ধু পূর্বপাড়ার দীননাথ চক্রবর্তী। এ দু'জনও সমদুঃখে দুঃখী। রাজের ও হৈমর দুঃখতো স্বাভাবিক ভাবেই এক কিন্তু ভাগ্যদোষে দীননাথও একই দুঃখে দুঃখী।

দীননাথকে অবশ্য রাজের মত ঠিক নিঃসন্তান বলা চলে না, নিঃসন্তান না হয়েও তার ঘর সন্তানশূন্য। কারণ একের পর এক তার সন্তানেব জন্ম হয় আর জন্মের পরেই শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সন্তানের জন্ম হলেও শিশুর কলকাকলিতে তার ঘর ভরে উঠে না, তাই ঘরও শূন্য, হৃদয়ও শূন্য। অথচ প্রথম যৌবনে দুই বন্ধুর এক স্বপ্ন ছিল যে, তাদের পরস্পরের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে তারা বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হবেন এবং বন্ধুত্বকে আত্মীয়তায় পরিণত করবেন। কিন্তু এখন ভাবেন, সে স্বপ্ন বুঝি বা স্বপ্নই থেকে যাবে। দু'জনের মধ্যে সেই পুরানো কথা আলোচনা হয়, দুঃখ বিনিময় হয়।

রাজচন্দ্রের স্ত্রী হৈমবতী দেখতে তেমন সুন্দরী না হলেও তাঁর চেহারায় একটা শান্ত লক্ষ্মীশ্রী আছে। হৈম রাজচন্দ্রের যোগ্য সহধর্মিনী। সহজ সরল পতিপরায়ণা হৈমর কাছে স্বামীই সব। স্বামীর সুখেই তার সুখ, আর স্বামীর দুঃখই তার দুঃখ। সন্তানহীনতার জন্য তারও মনে বেদনা আছে , তবে তা রাজচন্দ্রের মত এত তীব্র নয়। জীবনের এই অসম্পূর্ণতা তিনি ঈশ্বরের প্রতিকারহীন বিধান বলেই মেনে নিয়েছেন। সন্তানের জন্য হৈমর মনে যত না দুঃখ, তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখ এ ব্যাপারে রাজচন্দ্রের অর্ন্তবেদনার জন্য। হৈমর অনেক সময় মনে হয়, হয়ত তারই কোন ত্রুটির জন্য তাদের জীবনে সন্তান আসেনি।

সন্তানের জন্য রাজচন্দ্র করেন দৈবের সাধনা, আর হৈমবতী করেন বাস্তবচিন্তা। তখনকার দিনে পুরুষের একাধিক বিয়ের খুবই প্রচলন ছিল, স্ত্রী সন্তানবতী না হলে বা রুগ্ন হলে পুরুষ নির্দ্বিধায় একাধিক বিয়ে করে ফেলত। আর নারীরা বন্ধ্যাত্বের গ্লানি নিয়ে অবহেলায় জীবন কাটাত। সন্তানের জন্য হৈমও স্বামীর আবার বিয়ে দেওয়ায় জন্য মন স্থির করে ফেললেন। সপত্নী ঘরে

আনলে স্বামীর উপর অধিকার হারিয়ে হৈমের যত কষ্টই হউক, তবু যদি সপত্নীর কোল জুড়ে সন্তান আসে তবে স্বামীর শূন্য হৃদয় যে পূর্ণতার আনন্দে ভরে উঠবে। তা দেখে হৈম নিজের সবরকম কষ্টই সহ্য করতে পারবেন। কারণ স্বামীর সুখকেই হৈম নিজের সুখ বলে মানতে অভ্যস্ত। মন স্থির করে হৈম সময় সুযোগমত স্বামীর কাছে দ্বিতীয়বার বিয়ের প্রস্তাবটা রাখলেন এবং স্বামী যাতে তার প্রস্তাবে সন্মতি দান করেন, এ অনুরোধ করতেও ভুললেন না।

হৈমর প্রস্তাবে রাজচন্দ্র যেমন বিস্মিত ও তেমনি বিরক্ত হলেন। হৈমর কাছ থেকে যে এমন একটা প্রস্তাব আসতে পারে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। কারণ হৈম যেমন স্বামীঅন্ত প্রাণ, রাজচন্দ্রও তেমনি স্ত্রীঅন্ত প্রাণ। তাই হৈমর জন্য সপত্নীজনিত যন্ত্রণা সৃষ্টি করা রাজচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নয়। রাজচন্দ্র সে যুগের মানুষ হলেও তার মানসিকতা ছিল অন্য রকম। একাধিক বিয়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। তাই এক পত্নীনিষ্ঠ রাজচন্দ্রের কাছে হৈমর প্রস্তাবগ্রহণ যোগ্য হল না। তাই হৈমকে স্বামীর পুণর্বিবাহের চিন্তাটা চিরতরে ত্যাগ করতে হলো।

রাজচন্দ্র আর পাঁচজন সংসারী লোকের মত ছিলেন না। তার মনের গতি প্রকৃতি ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। পুত্রকলত্র নিয়ে তার সফল সংসার জীবন যাপনের যেমন বাসনা ছিল, তেমনি ছিল ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভের ব্যাকুলতা। দুর্গতি নাশিনী দেবী দুর্গার উপাসক রাজচন্দ্র ছিলেন মূলতঃ গৃহীসাধক। তার জীবন ছিল,ভোগ ও ত্যাগের এক আশ্চর্য সমন্বয়,তিনি তার আরাধ্যা দেবীর চরণে ছিলেন সমর্পিত প্রাণ। আরাধ্য দেবীর কৃপালাভের জন্য তার যেমন সাধনা ছিল, তেমনি বাৎসরিক দুর্গাপূজার তার বাহ্যিক আড়ম্বর ও নেহাৎ কম ছিল না।

রাজচন্দ্রের বাড়ীতে বাৎসরিক দুর্গাপূজা খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে সম্পন্ন হত। মানুষ প্রমাণ দীর্ঘ প্রতিমা নির্মিত হত। ঝাড় লণ্ঠন, ফুল মালা, ও শিল্পীর নানা কারুকার্যের দ্বারা সজ্জিত হত পূজামন্ডপ। শুধু প্রতিমা ও সাজসজ্জাই নয়। পূজার আয়োজন উপাচারের প্রাচুর্যও যথেষ্ট ছিল। রাজের পূজাবাড়ীতে তিনদিন ধরে তিন গ্রামের লোক প্রাসাদ পেত। ধনী দরিদ্র সবাই সমানভাবে আপ্যায়িত হত। রাজচন্দ্রের দুর্গাপূজার জাঁকজমক ও আদর আপ্যায়ণ পাশাপাশি গ্রামগুলোর একটা আলোচনার বিষয় ছিল।

অধিক বয়সে দেবী দুর্গার প্রসাদে রাজচন্দ্র কন্যাসন্তান লাভ করেছিলেন।

এই কন্যাসন্তান লাভের ব্যাপারে তার পরিবারে এক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে।

কথিত আছে, দেবী দুর্গার কাছে ভক্ত রাজচন্দ্রের দুটি ঐকান্তিক প্রার্থনা ছিল। সশরীরে দেবীর দর্শন ও কৃপালাভ এবং দেবীর প্রসাদে পুত্রলাভ। এই দুই প্রার্থনা পূরণের জন্য তিনি নিরন্তর দেবীর অর্চনা করেন। কিন্তু দেবীর কৃপা আর হয় না। ভক্তের প্রতি মা বড়ই উদাসীন। তাই মাঝে মাঝে রাজচন্দ্রের মনে মায়ের প্রতি বড় অভিমান হয়। ভক্তের আকুল প্রার্থনা কি মায়ের কানে পৌছায় না? মা কি বধির? অভিমানে পূজারত রাজের চোখে জল গড়ায় অজস্রধারায়। এ কান্নার খবর আর কেউ জানে না। শুধু ভক্ত জানে আর জানেন ভগবতী।

পুত্র লাভ ও দেবীর দর্শন এই দুই প্রার্থিত বস্তু লাভের আশা রাজচন্দ্রের মনে বিলীন প্রায়। তবু অভ্যাসবশতঃ নিত্য পূজার শেষে তিনি এই দুই প্রার্থনা করেন দেবীর চরণে। রাজচন্দ্রের মানসিক অবস্থা যখন হতাশার শেষ পর্যায়ে, তখন এক রাত্রে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নে দেবী তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে নূতন একটি মাটির ঘর তৈরী করে ভাল করে লেপে মুছে ঘরের দরজা বন্ধ করে রাজচন্দ্র যদি দেবীর আরাধনা করেন, তবে মা দুর্গা সশরীরে আবির্ভূত হয়ে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

স্বপ্নভঙ্গে রোমাঞ্চিত কলেবর রাজচন্দ্র সহস্রবার দুর্গানাম জপ করলেন। তারপর স্ত্রীকে ডেকে বললেন স্বপ্নকথা। শুনে স্ত্রী হৈমবতীও বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত। হয়ত এতদিন পরে তাদের দেবীর কৃপালাভের শুভ সময় এসেছে।

ফলে কালবিলম্ব না করে বাঁশের বেড়া দিয়ে মাটির ঘর তৈরী হল। হৈম স্বহস্তে গোবর মাটি দিয়ে বেড়াসহ ঘরটি লেপে যথাসাধ্য পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করলেন। শুভতিথিতে রাজ চন্দ্র ব্রাহ্মমূহুর্তে স্নান সেরে শুদ্ধ পটবস্ত্র পরিধান করে পর্যাপ্ত পূজার উপকরণ নিয়ে নূতন ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করলেন। শুরু হল রাজচন্দ্রের মাতৃআরাধনা।

ধূপধূনা,চন্দন, অগুরু ও নানা সুগন্ধী ফুলের গন্ধে এবং অনুচ্চস্বরে উচ্চারিত মন্ত্রধ্বনিতে ঘরের চারপাশে কেমন একটা অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি হল। পূজার ঘরের কাছে যাতে কেউ আসতে না পারে সে ব্যাপারে হৈম তীক্ষ্ম নজর রাখলেন। বাড়ীর লোক পাড়ার লোক রাজচন্দ্রর এই বিশেষ পূজা দেখে কিছুটা অবাক হলেও তেমন কৌতুহল প্রকাশ করল না। কারণ সবাই জানে রাজচন্দ্র সাধক

প্রকৃতির লোক। তার পক্ষে এধরনের পূজা অর্চনা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

একটানা তিনদিন তিনরাত ধরে চলল রাজচন্দ্রের বিরামবিহীন মাতৃ আরাধনা। কিন্তু দেবী আবির্ভূতা হলেন না। তৃতীয় রাত্রিও যখন প্রায় শেষের পথে, তখন রাজচন্দ্র হঠাৎ দেখতে পেলেন, অপূর্ব এক জ্যোতিতে সমস্ত ঘর উদ্ভাসিত, রাজচন্দ্র তাকিয়ে আছেন পলকহীন চোখে। ধীরে ধীরে এই জ্যোতির মধ্যেই ফুটে উঠল দশভুজা দুর্গার পরম ঐশ্বর্যময়ী রূপ। মহাশক্তির এই অপরূপ রূপ রাজের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। মহাশক্তির সর্বঅঙ্গ দিয়ে যে তেজ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, তা সহ্য করতে পারলেন না রাজচন্দ্র। দুইচোখ বন্ধ করে অর্ধচেতন অবস্থায় তিনি লুটিয়ে পড়লেন পূজার আসনে।

এই অর্ধঅচেতন অবস্থাতেই রাজচন্দ্র অস্পষ্টভাবে সুনতে পেলেন দেবীর রুষ্ট কণ্ঠ, "আমাকে ডেকেএনে আমার রূপ সহ্য করতে পারলিনা তুই? ধিক তার ভীরুতায়, ধিক তোর সাধনায়,-বুঝলাম র্নিবংশ হওয়াই তোর ললাট লিখন। র্নিবংশ হবি তুই।" একথার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের উজ্জ্বল আলো মিলিয়ে গেল। পূজার প্রদীপটিও নিভে গেছে। ঘরময় চাপচাপ অন্ধকার। চেতনা ফিরে পেয়ে উঠে বসলেন রাজচন্দ্র এবং উপলব্ধি করলেন কি ঘটে গেছে। পরম সৌভাগ্য হাতের মুঠোয় এলেও ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। অনুতাপ, আত্মধিক্কারে র্জজরিত রাজচন্দ্র পাগলের মত দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। রাত্রি তখন শেষের পথে।

স্ত্রী হৈমবতী কাছাকাছিই ছিলেন। দরজা খোলার শব্দে এগিয়ে এসে দেখলেন, অবসন্ন স্বামী দরজায় হেলামন দিয়ে বসে পড়েছেন। হৈমর উদ্বিগ্ন হৃদয়ে প্রশ্ন, দেবীর দর্শন লাভ হয়েছে কি? মনোমত বর কি পেয়েছেন স্বামী? কিন্তু প্রশ্নগুলো মুখে ফুটল না চোখের জলে ভাসতে ভাসতে রাজচন্দ্রই স্ত্রীকে বললেন সবকথা। সব শুনে হৈম বাক্যহারা, ঘরের দরজায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন স্বামী স্ত্রী।

পূবের আকাশে সূর্য যখন উদয়ের পথে, তখন রাজচন্দ্রই নীরবতা ভাঙ্গলেন। এই মূর্হুতেই আবার পূজায় বসবেন তিনি। দেবীর অভিশাপ মাথায় নিয়ে জীবনের ভার বইবেন না। মাকে প্রসন্ন করতেই হবে। যদি সফল না হন তবে এই পূজার ঘরেই আত্মহুতি দেবেন। তার এই কঠিন সংকল্প জানিয়ে স্ত্রীকে দ্রুত পূজার সমস্ত আয়োজন করতে নির্দেশ দিয়ে স্নানে গেলেন তিনি।

স্বামীর সংকল্প শুনে হৈমর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। যে সৌভাগ্য

হাতছাড়া হয়ে গেছে তাতো ফিরে আসার কথা নয়। যা হবার হয়ে গেছে। সন্তানের আশাতো গেছেই। এবার বোধ হয় হৈম স্বামীকেও হারাতে চলেছেন। কিন্তু রাজচন্দ্র যে ধরনের মানুষ তাকেতো কোনক্রমেই নিবৃত্ত করা যাবেনা, সবই মায়ের ইচ্ছা ভেবে বিষন্ন অবসন্ন হৈম দ্রুত হস্তে পূজার আয়োজন করলেন।

স্নান সেরে পূজার ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করলেন রাজচন্দ্র। আবার শুরু হল সাধকের কঠোর কঠিন সাধনা। এবারও বৃথা কেটে গেল তিনদিন তিনরাত। বাইরে স্বামীর জীবনাশংকায় বিচলিত বিভ্রান্ত হৈম, আর ভিতরে পূজারত রাজচন্দ্র। চতুর্থ দিনও একভাবেই কেটে গেল। রাজচন্দ্র জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে। অনাহারে অনিদ্রায়, হতাশায় সাধনশ্রমে রাজচন্দ্র মৃতকল্প। তবু রাজচন্দ্র একভাবে দেবীর প্রসন্নতা যাচ্ঞা করে চলেছেন। চতুর্থদিনের গভীর রাতে রাজচন্দ্রের ভাগ্য কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হল। দেবীর দর্শন মিলল না,তবে বাজচন্দ্রের কানে ধ্বনিত হল দেবীর দৈববাণী, দেবী যেন বলছেন,"রাজ তোর পূজায় তুষ্ট আমি। তবে আমার দর্শন আর কোনদিন পাবি না তুই। যে আমার দিব্যরূপ দেখে জ্ঞান হাবায় তাকে আর দর্শন দেই না আমি। আর র্নিবংশ হওয়ার কথাটা যখন বলে ফেলেছি তাতো আর খণ্ডন হবার নয়। পুত্রসন্তান হবে না তোর। আমার বরে কন্যাসন্তানের দ্বারা তোর বংশ রক্ষা হবে। নয়টি কন্যাজন্মাবে। কিন্তু একটি মাত্র কন্যা সন্তানলাভ করবে ও তোর বংশ রক্ষা করবে। আর নয়, এবার পূজা সমাপ্ত কর। তোর পূজায় প্রসন্ন আমি।"

দেবী দুর্গার নির্দেশে বাজচন্দ্র পূজা সমাপ্ত করে ধীরে সুস্থে দরজা খুললেন। একটানা সাতদিন সাতরাত অনাহারে অনিদ্রায় তপক্লিষ্ট রাজচন্দ্র যে স্বাভাবিকভাবে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছেন, তা দেখেই হৈমবতী আনন্দে আত্মহারা, দ্বিতীয় বারের পূজার ফল জানার তেমন আগ্রহ তার নেই। স্বামীকে যে ফিরে পেয়েছেন তাই হৈমর কাছে যথেষ্ট। রাজচন্দ্রই স্ত্রীকে বললেন দৈববাণীর সব কথা। আগের পূজার ভীষণ ব্যর্থতার পর এটুকু আর্শীবাদ যে লাভ হয়েছে তাতেই হৈম পরম সন্তুষ্ট।

এরপর তাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক গতিতে চলতে লাগল এবং মনে মনে স্বামী স্ত্রী দৈববাণী সফল হওয়ার দিন গুণতে লাগলেন। দেবীর বাক্য তো মিথ্যা হতে পারে না, যথাকালে রাজচন্দ্রের কন্যাসন্তান জন্মেছিল এবং সেই কন্যার সন্তানরাই রাজচন্দ্রের উত্তরাধিকারী হয়েছিল। নীলগঞ্জের রায় পরিবারইএই

রাজচন্দ্রের দৌহিত্র বংশ।

দেবীর দৈববাণীর কিছুদিন পরেই হৈমবতীর শরীরে মাতৃত্বের লক্ষণ দেখা দিল। যথাকালে তিনি জন্ম দিলেন দুই যমজ কন্যার। তাদের নাম রাখা হলো নীলমণি ও গঙ্গামণি , নীল একটু আগে ও গঙ্গা একটু পরে জন্মাল। এই হিসাবে নীলই রাজচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা। অধিক বয়সে কন্যামুখ দেখে রাজের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। পুত্রলাভ হল না বলে কোন দুঃখ আর তার মনে রইল না। সন্তান পুত্রই হউক বা কন্যাই হউক সন্তানতো বটে। এতদিন পরে দেবীর কৃপায় সন্তানলাভ করে রাজচন্দ্র কৃতার্থ। যথা সময়ে খুব ঘটা করে তিনি মেয়েদের মুখে ভাত দিলেন।

নীল ও গঙ্গাঁর পরে হৈমবতীর পর পর আরও তিনটি মেয়ে হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ওরা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল। এতে রাজ ও হৈমবতী মনে খুব আঘাত পেলেও ভগবতীর ইচ্ছা বলে মেনে নিলেন।

ইতিমধ্যে নীল ও গঙ্গাঁ বেশ বড় হয়েছে। সর্বক্ষণ দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করে, ঘরের জিনিসপত্র ওলটপালট করে, আর অনর্গল কথায় ও হাসিতে খুশীতে বাপমায়ের হৃদয় জুড়িয়ে দেয়। রাজ মেয়েদের দৌরাত্ম দেখেন , শান্তিতে তৃপ্তিতে তার মন ভবে যায়। পুত্রসন্তানের জন্য এতটুকু ক্ষোভ উদয় হয় না মনে।

দু'বোনের মধ্যে নীলই বেশী চঞ্চল, মুখে তার কথার ফুলঝুরি, হাসির ফোয়ারা। মূহুর্তে রাগ মূহুর্তে খুশী। চঞ্চল হলেও সহজ সরল নীলের স্বভাব। নীল পরমা সুন্দরী। দুধে-আলতায় তার গায়ের রং, কালো টানা চোখ, ঘন কোঁকড়ানো চুল, তার সুকোমল শরীরটি যেন মোমে গড়া প্রতিমা। গাঁয়ের লোকে বলে, সে তার বাপের চেহারার আদল পেয়েছে। সুন্দরী হাসিখুশী নীলমণি বাপের বড়ই আদরিনী।

নীল ও গঙ্গাঁ যমজবোন হলেও তাদের চেহারা ও স্বভাবে মিলের চেয়ে অমিলই বেশী। গঙ্গাঁ গম্ভীর প্রকৃতির, সে কথাও কম বলে। নীলের মত হাসাহাসি দাপাদাপিও করে না, চট করে রেগেও যায় না এত। আবার রেগে গেলে সহজে তার রাগ পড়ে না। বেশ জেদী প্রকৃতির মেয়ে সে। গঙ্গার চেহারাও খারাপ কিছু নয়, তবে নীলের সঙ্গে কোন তুলনা চলে না। নীল রূপসী, গঙ্গাঁর চেহারা মোটামুটি। তবে সে খুবই বুদ্ধিমতী। বাপের বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব কিছুটা গঙ্গাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। লোকে বলে নীল পেয়েছে বাপের রূপ, গঙ্গাঁ পেয়েছে বাপের বুদ্ধি।

হৈমর শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছে না। আবার তিনি মা হতে চলেছেন।

আগের তিন তিনটি সন্তান মারা যাওয়ার দোষ কাটানোর জন্য প্রবীণাদের পরামর্শে হৈমকে হাতে মাথায় বেশ কয়টি কবজ তাবিজ ধারণ করতে হয়েছে। যদিও রাজচন্দ্রের কবজ তাবিজে মোটেই আস্থা নেই। তবে এসব মেয়েলী ব্যাপার মেনে নিতেই হয়। তাই রাজ এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করেন নি।

যথাসময়ে হৈমর ষষ্ঠ কন্যার জন্ম হলো। কবজ তাবিজের গুণে বা অন্য কোন কারণে এই মেয়েটি অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল। দিব্যি সুস্থ শরীরে সে ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। তার নাম রাখা হল গুণমণি। গুণমণির পরে বছর দুই আড়াইয়ের মধ্যে আরও দুটি মেয়ে হল হৈমবতীর। কিন্তু দুভার্গ্যবশতঃ তারাও বেঁচে রইল না। মোট আটটি মেয়ের পিতামাতা হয়েছেন রাজচন্দ্র –হৈমবতী। কিন্তু আটজনের মধ্যে বেঁচে রইল মাত্র তিনজন।

পাঁচটি মেয়ে অকালে ঝরে গেল,পুত্রসন্তান হল না। এসব নিয়ে রাজচন্দ্র হৈমবতী দুঃখ করেন না। দেবী দুর্গা যা দিয়েছেন, তা যথেষ্ট। সন্তানহীন শূন্য ঘর তিনমেয়েই পূর্ণ করে দিয়েছে। তবু একটা দুঃখ রাজচন্দ্রকে বড় পীড়া দেয়। বন্ধু দীননাথের শূন্য ঘর শূন্যই রয়ে গেল। ভগবান তার দিকে মুখ তুলে চাইলেন না। দীননাথের পাঁচটি সন্তানই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। তাও হয়ে গেছে বেশ কয়েক বছর। মনে হয় দীননাথের স্ত্রী কাদম্বিনীর হয়ত আর ছেলেপুলে হবেনা।

দীননাথ পরম বৈষ্ণব। রাধামাধব প্রতিষ্ঠিত তার গৃহে। তিনি রাধামাধবের একনিষ্ঠ সেবক। তাই তিনি প্রভুর ইচ্ছাকেই মেনে নিয়েছেন। তাছাড়া বন্ধু রাজচন্দ্রের মেয়েদের সাহচর্যও তার নিজের শূন্যতা ভুলতে বেশ কিছুটা সাহায্য করে।

সাধারণতঃ সৎ ও সাত্ত্বিক মানুষের আকাঙ্খা অপূর্ণ থাকে না। দীর্ঘদিন পরে দীননাথের স্ত্রী কাদম্বিনী আবার মা হতে চলেছেন। দীর্ঘদিন পরে যখন সন্তান আসছে, তখন দীননাথ আশা করছেন ,হয়ত ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন। এ সন্তান মা বাবার কোল পূর্ণ করে হয়ত বেঁচেবর্তে থাকবে। দীননাথের অনুমান মিথ্যে হল না। যথাসময়ে তার পুত্রসন্তান জন্মাল ও বেঁচে রইল। পরম বৈষ্ণব দীননাথ পুত্রের নাম রাখলেন বিষ্ণুপদ। অধিক বয়সে পুত্রলাভে দীননাথ বড়ই খুশী, খুশী বন্ধু রাজচন্দ্রও। এবার যদি দেবী দুর্গার বাক্য অনুসারে রাজচন্দ্রের নবম কন্যার জন্ম হয় ও বেঁচে থাকে, তবে উভয় বন্ধুর বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছাটুকু ও পূর্ণ হতে পারে। রাজের যে তিন মেয়ে আছে তারাতো বিষ্ণুর চেয়ে অনেক

বড়। বয়সে ছোট বিষ্ণুর সঙ্গেতো ওদের বিয়ে হতে পারে না।

রাজচন্দ্র দেবীর বাক্য অনুসারে নবম কন্যার জন্মের প্রতীক্ষা করেন। যদিও হৈমের মা হওয়ার বয়স অনেক আগেই অতিক্রান্ত। এসব ভাবনা চিন্তার মধ্যেই রাজচন্দ্র যমজ দুই মেয়ে নীলমণি ও গঙ্গামণির বিয়ে দিলেন। নীলমণি বাপের নয়নের মণি। কাজেই তাকে পরের ঘরে পাঠিয়ে রাজচন্দ্র কিছুতেই থাকতে পারবেন না। তাছাড়া নীলমণির সন্তানই হবে তাঁর উত্তরাধিকারী। এটাই রাজচন্দ্রের মনের ঐকান্তিক আকাংখা। তাই গরীব ঘরের ছেলের সঙ্গে নীলের বিয়ে দিয়ে জামাইকে তিনি ঘরজামাই করে রাখবেন। পাত্র উল্লাসচন্দ্রের চেহারা মোটামোটি ভাল তবে পড়াশুনা কম। সুন্দরী নীলের সঙ্গে জামাই তেমন মানানসই নয়। তাছাড়া বয়সও একটু বেশীই। তবে ছেলেটি আপাতঃদৃষ্টিতে শান্তস্বভাবের ও বাধ্যপ্রকৃতির। আদরে আস্কারায় মানুষ হওয়ায় নীল একটু উদ্ধত স্বভাবের। শান্তশিষ্ট ছেলে না হলে সে মানিয়ে নিতে পারবে না এই চিন্তা করে রাজচন্দ্র শান্তস্বভাবের জন্য গরীব ঘরের ছেলে উল্লাসকে পছন্দ করলেন এবং মহাসমারোহে উল্লাসের সঙ্গেই নীলের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

যমজ বলে রাজচন্দ্র নীল ও গঙ্গার বিয়ে একদিনেই দিলেন। কাছে না হলেও খুব বেশী দূরে নয় গঙ্গার শ্বশুরবাড়ী। জামাই কোটীশ্বর খুবই রূপবান। কিন্তু তেমন শিক্ষিত নয়। স্বচ্ছল পরিবার। পিতৃহীন কোটীশ্বরের বড় দুই ভাই উচ্চশিক্ষিত ও ভাল চাকুরী করে। কোটীশ্বর সঙ্গীত প্রিয়। গানের নেশায় পড়াশুনায় মনোযোগ ছিল না। পিতৃমাতৃহীন কোটীশ্বর বড়ভাইদের একান্ত স্নেহ ও প্রশ্রয়ে মানুষ বলে সাংসারিক কোন দায়দায়িত্ববোধ তার নেই। তবে সে খুবই সরল প্রকৃতির কোন'রকম ঘোর প্যাঁচ বোঝে না।

গঙ্গাকে শ্বশুর বাড়ীতে পাঠিয়ে রাজচন্দ্রের মনে একটা অস্বস্তি ছিল। যমজ দুইবোনের মধ্যে একজন গেল পরের ঘরে। অন্যজন রইল বাপের ঘরে। নীলের প্রতি রাজ বরাবরই বেশী পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। বুদ্ধিমতী গঙ্গা তা মেনে নিয়েছে। এখন বিয়ের পরে নীলকে কাছে রাখা ও গঙ্গাঁকে দূরে ঠেলে দেওয়া নিয়ে গঙ্গার মনে বাপের প্রতি ক্ষোভ অভিমান হতেই পারে । তবে চাপাস্বভাবের গঙ্গা কখনও তা প্রকাশ করবে না। নিজের মনেই দুঃখ পাবে। সব সন্তানকেই সমান দেখা উচিত বুঝেও রাজচন্দ্র নীলের প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব না করে পারেন না। নীল যে হৃদয় তার জুড়ে রয়েছে। অল্পদিনের মধ্যেই রাজচন্দ্রের গঙ্গা সম্পর্কে

অস্বস্তির ভাবটা কেটে গেল। গঙ্গার দুই ভাশুরই দেবতুল্য মানুষ। কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ গঙ্গারপ্রতি তাদের কন্যাতুল্য স্নেহ। শ্বশুর বাড়ীতে গঙ্গার মত এত স্নেহ ভালবাসা সচরাচর কোন মেয়ের ভাগ্যে জোটে না। এদিক দিয়ে গঙ্গা বড়ই ভাগ্যবতী। এতে রাজচন্দ্র বড়ই নিশ্চিন্ত বোধ করলেন।

দিনগুলো চলছিল স্বাভাবিক গতিতেই। এমন সময় এক অসম্ভব ঘটনা ঘটল। এ জগতে মাঝে মধ্যে অসম্ভবও সম্ভব হয় এবং মানুষ তাতে বিস্ময় বোধ করে। তেমনি এক বিস্ময়কর ঘটনা প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় হৈমবতীর শরীরে সন্তানের আগমনবার্তা। সবাই অবাক হলেও রাজচন্দ্র ও হৈমবতী অবাক হলেন না। মহাশক্তির মহাবাক্যতো আর মিথ্যে হতে পারে না। আর একটি কন্যাকে তো তাদের ঘরে আসতেই হবে। তাই সন্তান ধারণের বয়স অতিক্রান্ত হলেও আশ্চর্যভাবে হৈমর গর্ভে সন্তানের আবির্ভাব ঘটেছে।

ভুবনমোহন রূপ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হল রাজচন্দ্র-হৈমবতীর নবম কন্যা। কন্যার রূপ দেখে সবাই অবাক হয়। এতো রূপতো সাধারণ মেয়ের হতে পারে না। মেয়েটি বোধহয় কোন শাপভ্রষ্টা দেবী। আর রাজচন্দ্র ভাবেন, তার আরাধ্য দেবী দুর্গাই এবার কন্যারূপে তাঁর ঘরে আবির্ভূতা হয়েছেন। দেবী দুর্গাজ্ঞানে এবং নবম কন্যা বলে রাজচন্দ্র মেয়ের নাম রাখলেন নবদুর্গা।

শশীকলার মত বাড়তে লাগল দীননাথের ঘরে বিষ্ণুপদ আর রাজচন্দ্রের ঘরে নবদুর্গা। দুই বন্ধুর যে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার বাসনা ছিল তাও পূর্ণ হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। তাই দুই বন্ধুর যেন তর সয় না। কথা পাকা করে ফেলতে উভয়েই ব্যস্ত। যদিও বিষ্ণু ও নব নেহাৎ শিশু তবু তারা কথা পাকা করে ফেলতে মনস্থ করলেন। শুভদিন দেখে একদিন দুই বন্ধু গ্রামের দু'চারজন গন্য মান্য লোকদের সাক্ষী রেখে বিষ্ণু ও নবর বিয়ের কথাটা পাকা করে ফেললেন। অর্থাৎ বাক্‌দান পর্বটা সেরে রাখলেন। সাক্ষীদের মধ্যে দু'একজন অবশ্য কাজটা সুবিবেচনার বলে মনে করলেন না। কারণ ভবিষ্যতে কার্যকারণে যদি এ বিয়ে না হয়, তবে বাক্যের খেলাপের জন্য পাপভাগী হতে হবে। দুই বন্ধু তাদের কথায় আমল দিলেন না। বাক্‌দান হয়েই রইল।

ঈশানের পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই রাজচন্দ্রের পরিবারের সম্পর্কটা ভিতরে ভিতরে ভাল চলছিল না। নানা ছুতোয় সব সময় একটা না একটা অশান্তি লেগেই থাকে। রাজচন্দ্র হৈমবতীর সম্পর্কটা আগের মত সহজ করে তোলার

চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু ঈশানের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা অকারণে দুর্ব্যবহার করে। ঈশানকে অবশ্য এসব ব্যাপারে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না। কারণ দাদার ও বউঠানের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবটা সামনাসামনি সে কাটিয়ে উঠতে পারে না। আড়ালে পুত্রপরিবারের প্রতি প্রশয় আছে তা বুঝা যায়। রাজচন্দ্র বোঝেন আসলে রাজচন্দ্রের মেয়েদের জন্মের পর থেকে এই বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি হয়েছে। নিঃসন্তান রাজচন্দ্রের সম্পত্তি পাওয়ার যে নিশ্চিন্ত আশা তাদের ছিল , রাজের মেয়েদের জন্মের পরে সেই আশা পূর্ণ হওয়ার মত পরিস্থিতি আর নেই। সেই আশাভঙ্গের কারণেই যত বিদ্বেষ ও অশান্তি। তবে ঈশানের মনে একটা ক্ষীণ আশা আছে যে হিন্দুশাস্ত্রমতে মেয়েরাতো শ্রাদ্ধাধিকারিণী নয়। রাজের মৃত্যুর পর তার শ্রাদ্ধের অধিকারী ভাইপোরাই অর্থাৎ ঈশানের ছেলেরা। তাই শ্রাদ্ধাধিকারী হিসাবে সবটা না পেলেও আংশিক পাওয়ার সম্ভাবনা আছেই।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন রাজচন্দ্র নীলমণিকে ঘরজামাই রেখে বিয়ে দিলেন তখন ঈশানের সে আশাও ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কারণ রাজচন্দ্র যে দৌহিত্রকে অর্থাৎ নীলমনির সন্তানকে উত্তরাধিকারী করবেন, তা স্পষ্ট। আর প্রসঙ্গত রাজচন্দ্র ঘনিষ্ঠ দু'একজনের কাছে তার এই ইচ্ছার কথা উল্লেখও করেছেন। এতবড় সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার জ্বালায় ঈশানের পরিবার ক্ষোভে দুঃখে জ্বলে পুড়ে মরছে। তাদের দুর্ব্যবহারের মধ্যে এই জ্বালারই প্রকাশ। রাজচন্দ্র অনেক আগেই স্থির করে রেখেছিলেন যে জ্যেষ্ঠা কন্যা নীলমণির সন্তানরাই হবে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তাই তিনি নীলকে ঘরজামাই রেখে বিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দেবী দুর্গার ইচ্ছা যে অন্যরকম তা তিনি বুঝতে পারেন নি। মানুষের আশা বা ইচ্ছা অনুসারে জগতে কিছুই হয় না। তবু মানুষ ইচ্ছা করে, আশা করে এবং আশা পূর্ণ না হলে দুঃখ পায়।

বিয়ের পর সাধারণতঃ মেয়েদের চেহারা শ্রীমন্ত হয়।গঙ্গাঁর চেহারা বিয়ের পর খুবই শ্রীমন্ত হয়ে উঠেছে। তাকে এখন রীতিমত সুন্দরী বলা চলে। কিন্তু নীলমণির কিন্তু তেমন হয়নি। বরং বিয়ের পর থেকে দিন দিন সে বড়ই কাহিল ও শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে। আগের সে উচ্ছলতাও নেই। কেমন একটা মনমরা ভাব। এখন সে আগের মত হাসে না, কথা বলে না, চুপচাপ একা একা বসে থাকে। কেমন একটা উদাসভাব। প্রথম প্রথম রাজচন্দ্র বা হৈম কেউই নীলের এই পরিবর্তনে তেমন গুরুত্ব দেননি। বিয়ের পর অমন একটু আধটু পরিবর্তন হয়েই

থাকে। কারোর স্বাস্থ্য ভাল হয়, কারোর বা শরীরে সামান্য ভাঙ্গন ধরে। তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। নীলেরও নিশ্চয় ধীরে ধীরে শরীর মন ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু যতদিন যেতে লাগল নীলের স্বাস্থ্যের অবনতিই হতে থাকল। নাওয়া খাওয়া সাজগোজ সব ব্যাপারেই তার খুব অনীহা। তার অসুখ অসুবিধাব কথা জানতে চাইলে সে বড়ই বিরক্ত হয়। অমন সুন্দর প্রাণবন্ত মেয়ে বিয়ের পর থেকে শুকিয়ে পোড়াকাঠ হয়ে যাচ্ছে। নীলের বিষন্ন রুগ্ন চেহারার দিকে তাকানো যায় না। নীলের এই অবস্থা দেখে মা বাবা অবশেষে বড়ই চিন্তিত হয়ে পডলেন। ডাক্তার দেখানো হল। কিন্তু তার শরীরে বিশেষ কোন রোগ ধরা পড়ল না। তখন মা বাবার মনে হাজার প্রশ্নের উদয় হল। নীলের কি বর পছন্দ হয়নি? অথবা স্বামীর ব্যবহারে তার মনে কি কোন আঘাত লেগেছে? নীলের স্বামীর স্বভাবচরিত্র কি ভাল নয়? মানসিক কোন আঘাতেই কি নীলের শরীর এমন ভেঙ্গে পড়েছে? কিন্তু মা বাবার পক্ষেতো মেয়েকে এসব ব্যাপারে সরাসরি প্রশ্ন করা শোভন নয়। সমবয়সীরাই সাধারনতঃ এসব জেনে নিতে পারে। তাই স্বামী স্ত্রী পরামর্শ করে ঠিক করলেন, গঙ্গাকে দিয়েই নীলের মনের খবর নিতে হবে। ওরা দু'জন যমজ বোন। দু'বোনের মধ্যে একটা সখ্যতার সম্পর্কও রয়েছে। গঙ্গাই পারবে নীলের মনের খবর জানতে। এরকম চিন্তা ভাবনা করে রাজচন্দ্র গঙ্গাকে শ্বশুরবাড়ী থেকে নিয়ে এলেন এবং হৈম এ ব্যাপারে গঙ্গার সঙ্গে আলোচনা করলেন। গঙ্গাও নীলের শরীরের হাল ও আচার আচরণ দেখে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল।

গঙ্গা এ ব্যাপারে খুবই আন্তরিকভাবে নীলের সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু নীল গঙ্গার কোন কথারই উত্তর দিল না। যেমন চুপচাপ ছিল, তেমনি রইল। অনর্গল কথা বলে যেত যে নীল, সে যে এমন চুপচাপ হয়ে যেতে পারে তা দেখে গঙ্গার চোখে জল এসে গেল। মনে পড়ল, বিয়ের আগে নীল গঙ্গাব সঙ্গে অকারণে অর্থহীন কত কথা বলে যেত। গঙ্গা মাঝে মাঝে বিরক্ত হলেও নীলের মুখ বন্ধ হত না। চঞ্চল, উচ্ছল নীল একেবারে স্তব্ধ। যেন পাষাণ প্রতিমা। নিজেতো কোন কিছু বলতেই চায় না, কেউ তার কাছে কথা বললেও সে খুব বিরক্ত হয়। তার কাছাকাছি কেউ থাকলেও সে মোটেই পছন্দ করে না। বিয়ের আগে নীলের বকবকানিতে বাড়ীশুদ্ধ লোক অতিষ্ঠ হত। আর আজ সে কোন বাক্যই ব্যয় করে না। চিন্তাভাবনাব ধারতো নীল কোনদিনই ধারত না। এখন সে একা একা কি ভাবে? গঙ্গা নীলের এই পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পাবল না। মা বাবার উপরে

তার রাগ হল। কারণ মা বাবার উচিত ছিল আর একটু চিন্তা ভাবনা করে নীলের জন্য পাত্র নির্বাচন করা। গঙ্গা নিজেও উল্লাসকে দিদির যোগ্য পাত্র মনে করে না। অবশ্য তার স্বভাবচরিত্র কেমন গঙ্গাঁ জানে না। ভগ্নীপতির সঙ্গে তেমন আলাপ হয়নি তার। নীলের কাছে কোন সাড়া না পেয়ে গঙ্গা ভগ্নীপতি উল্লাসের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলল। উল্লাসও কোন রাখঢাক না করে গঙ্গার সঙ্গে একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার আলোচনা করল। সে স্পষ্ট করেই বলল, বিয়ের একমাস কাল পর্যন্ত তাদের স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক মধুরই ছিল। সে আরও বলল, "তোমার বোনকে তো তোমরা আমার চেয়ে বেশীই জান। বড়ই সহজ সরল মনের সে। যোগ্য অযোগ্যর প্রশ্ন তুলে অবজ্ঞা অবহেলা করার মত মন তার নয়। স্বামীকে স্বামীজ্ঞানেই সে ভালবেসেছে, শ্রদ্ধাভক্তি করেছে। আমি অন্ততঃ এরকমই বুঝি। তারপর থেকে আস্তে আস্তে সে যে কেন এমনধারা হয়ে গেল,কিছুতেই ভেবে পাছি না।" এটুকু বলেই উল্লাসের কণ্ঠ ধরে এল। দু'ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ল,বাধা মানল না। গঙ্গারও চোখে জল এসে গিয়েছিল। আঁচলে চোখ মুছে সে নীরবে ভগ্নীপতির ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নীলের এই অবস্থাটা যে কোন দাম্পত্য-সমস্যাজনিত নয়, এটা গঙ্গা ভালই বুঝতে পারল এবং উল্লাসের সব কথাই মাকে জানাল। তারপর বলল, "ওদের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কোন অশান্তি বা ভুলবুঝাবুঝি নেই মা। দিদির মনে হয় কোন শক্ত অসুখ হয়েছে যা ডাক্তাররা ধরতে পারছেন না। তোমরা আরও ভাল ডাক্তার দেখাও। রোগ ধরা পড়লে ও ঠিকমত চিকিৎসা হলে দিদি নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে। অযথা চিন্তা করো না।

গঙ্গার বুদ্ধিবিবেচনার উপর মা বাবা উভয়েরই খুবই আস্থা। তাই তারা গঙ্গার কথামত নামকরা ডাক্তার এনে বিধিমত নীলের চিকিৎসা শুরু করলেন।

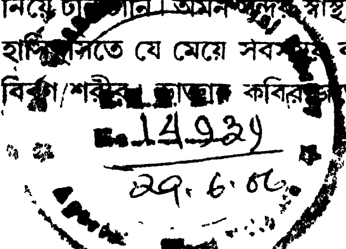
হৈমর চিন্তা একটা নয়। একদিকে নীলের অসুস্থতা অন্যদিকে গুণমণিকে পাত্রস্থ করার চিন্তা। গুণ বড় বেপরোয়া স্বভাবের মেয়ে। গ্রামেঘরে মেয়ে বড় হলে সংযত হয়ে যে ঘরে থাকতে হয়, এ জ্ঞান গুণের নেই। বুঝালেও বুঝে না, কোন শাসন ও মানে না। মাঠে ঘাটে,পাড়ায় পাড়ায় সে ঘুরে বেড়ায়। ছেলেমেয়ে সবার সঙ্গে সে নিঃসংকোচে গল্পে মেতে যায়। এতে কে কখন কোন নিন্দে রটিয়ে দেবে, হৈমর এই ভয়। এমন মেয়েকে ঘরে রাখাদায়। কোন রকমে পাত্রস্থ করতে পারলেই যেন হৈমর মাথার বোঝা নামে। কিন্তু রাজচন্দ্রের গুণর বিয়ের ব্যাপারে

একেবারে কোন চেষ্টা নেই। নীলমণির অসুখ নিয়েই তিনি ব্যস্ত। কাজেই হৈম দিনরাত গুণর বিয়ের জন্য মা দুর্গার চরণে প্রার্থনা জানান।

হৈমর প্রার্থনায় ও গুনমণির ভাগ্যের জোরে কোন চেষ্টাচরিত্র ছাড়াই একটি ভাল পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। গুণ এমন কিছু সুন্দরী নয়, আবার গৃহকর্মেও সে আনাড়ী। তাই এমন ভাল পাত্র যে গুণকে পছন্দ করবে তা রাজচন্দ্র হৈমবতী ভাবতেই পারেননি। বড় দুই জামাই থেকে এই পাত্র সবদিক থেকেই অনেক যোগ্য। ছেলেটি শিক্ষিত, সুদর্শন. উচ্চবংশীয়। আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল। তবে একটু দূরের গ্রাম। চট্ করে মেয়েকে আনা বা খোঁজখবর নেওয়ার ব্যাপারে একটু অসুবিধাই হবে। তবে সবদিকতো আর পাওয়া যায় না। তাই শুভদিন দেখে রাজচন্দ্র কানিহারী গ্রামনিবাসী অভয়চরণের হাতে কন্যা সম্প্রদান করলেন। নীল ও গঙ্গার বিয়ে যেমন জাঁকজমকপূর্ণ হয়েছিল, গুণর বিয়ে তেমন জাঁকালো হল না। কোনরকমে রাজচন্দ্র কন্যাদায়মুক্ত হলেন। এদিকে নীল গুরুতর অসুস্থ. গঙ্গা অসন্ন প্রসবা। তাই রাজচন্দ্র হৈমবতীর মনের সুস্থিতি ছিল না। তবু বিয়েটা হয়ে যাওয়ায় হৈম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

গুণর বিয়ের সাতদিন পরে রাজচন্দ্র খবর পেলেন যে গঙ্গার একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। রাজচন্দ্র পুত্রসন্তান আশা করেছিলেন কিন্তু তার আশাভঙ্গ হল। কিন্তু হৈমবতী মোটেই মন খারাপ করলেন না। ভালভাবে যে শিশুর জন্ম হয়েছে এবং মা ও শিশু যে ভাল আছে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট এবং এ নিয়ে রাজচন্দ্রের যে মোটেই মন খারাপ করা উচিত নয় তাও তিনি স্পষ্ট করে স্বামীকে বলে দিলেন। স্ত্রীর কথায় রাজচন্দ্রও মনে আর কোন খেদ রাখলেন না। তিনি মেয়ের বাড়ীতে গিয়ে মোহর দিয়ে নাতনীর মুখ দেখলেন এবং নাতনীর নাম রাখলেন তরঙ্গিনী।

গুণমণির আশাতীত ভাল বিয়ে হয়েছে, গঙ্গা 'মা' হয়েছে, এসব খুবই সুখের বিষয়। কিন্তু রাজচন্দ্র- হৈমবতীর মনে এতটুকু শান্তি সুখ নেই , কারণ সবচেয়ে প্রিয় কন্যা নীলের অসুস্থতা। নীলমণির সন্তানইতো তারা আগে আশা করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ । 'মা' হওয়াতো দূরের কথা, এখন তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। অমন সুন্দর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে দিন দিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে । হাসিখুশিতে যে মেয়ে সবসময় ঝলমল করত, আজ তার বিষন্ন বদন. বিশীর্ন বিবর্ণ শরীর। ডাক্তার কবিরাজতো অনেক দেখানো হয়েছে এবং হচ্চে. কাঁড়ি



কাঁড়ি ওষুধও খাওয়ানো হচ্ছে। কিন্তু উন্নতির বদলে দিন দিন অবস্থার অবনতি ঘটছে। রাজচন্দ্রের ধারণা ডাক্তাররা সঠিক রোগ ধরতে পারছেনা, অনুমানের উপর ওষধ দিচ্ছে। তাই রোগীর অবস্থার এমন অবনতি ঘটছে। কি করলে কোন চিকিৎসক ডাকলে যে ভাল হবে, রাজ কিছুই বুঝতে পারছেন না। নীলেরদিকে তাকালে রাজচন্দ্র-হৈমবতীর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। শুধু নীল কেন, হৈমর মাতৃহৃদয়ে জামাই উল্লাসের জন্যও অনুক্ষণ একটা বেদনাবোধ জেগে থাকে। গরীবের ছেলে কত আশা করে বড়ঘরের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে ছিল। কিন্তু ভাগ্যদোষে সে সুখশান্তির মুখ দেখতে পেল না। ম্লানমুখে উল্লাস যখন নীলের শয্যাপার্শে এসে দাঁড়ায় , তখন হৈমর হৃদয় বেদনায় টনটন করে উঠে।

সব দেখে শুনে একদিন গ্রামের কয়েকজন বৃদ্ধা হৈমকে ডেকে বললেন, " এ কোন রোগ নয় গো নীলের মা, নিশ্চয়ই কোন অপদেবতার দৃষ্টি পড়েছে। অথবা এমনও হতে পারে কোন শত্তুর মত্তুর বাণ মেরে তোমার মেয়েকে এমনিধারা করে দিয়েছে। নইলে কোন ওষুধেই কাজ দেবে না কেন ? তুমি আর দেরী না করে ভাল ওঝা গুণীন দেখাও, কবজ তাবিজ ধারণ করাও। দেখবে মেয়ে তোমার ভাল হয়ে যাবে।"

কথাটা হৈমর খুবই মনে ধরল। রাজচন্দ্রের অবশ্য এসবে তেমন বিশ্বাস নেই। তবু বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য মানুষকে সব রকম চেষ্টাই করতে হয়। এই ভেবে তিনি কয়েকজন নামকরা ওঝাগুণীন ডাকলেন। তারা এসে উদ্ভট প্রক্রিয়ায়, উৎকট উপচারে নানান পূজা করল, বিকটসুরে মন্ত্রপাঠ করল, জলপড়া দিল, ধারণ করার জন্য দিল ছোট বড় অনেক মাদুলি। তারপর যথেষ্ট অর্থ নিয়ে প্রচুর আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিল। কিন্তু ফল কিছুই হল না। কবজে তাবিজে নীলের অঙ্গ ছেয়ে গেল। কিন্তু তার অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হল না। দিন দিন সে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে , প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থা। তবে ডাক্তার বৈদ্য ওঝা-গুনীনের আসা যাওয়ার বিরাম নেই। এর মধ্যে এল আর এক গুণীন। তার ধরণ ধারণ অন্য গুণীনদের মত নয়। সে অপদেবতা তাড়ানোর পূজা করল না, কোন মন্ত্র আওড়ালোনা, জলপড়া দিল না, কোন কবজতাবিজ ধারণ করতেও বলল না। রোগীকে দেখেই আঁতকে উঠল সে। তারপর ডাইনে বাঁয়ে অনেকক্ষণ মাথা নেড়ে বলল," এ রোগীকে শক্ত বাণ মারা হয়েছে। মেয়ের নখ, চুল, পরনের কাপড় ও ব্যবহারের গামছার টুকরা ,তার ব্যবহৃত আলতা, সিঁদূর ইত্যাদি গোপনে সংগ্রহ

করে একটি মাটির ভাঁড়ে পূরে মাটির সরা দিয়ে ঢেকে ,অমাবস্যার রাতে শেওড়া গাছের নীচে মন্ত্র পড়ে ভাঁড়ের মুখ নূতন লাল গামছা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে বাড়ীর সামনের পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ঐ ভাঁড় জল থেকে উঠাতে পারলেই মেয়ে ভাল হয়ে যাবে। কোন মন্ত্রতন্ত্র বা কবজ তাবিজের প্রয়োজন নেই। তবে ভাঁড় উঠাতে না পারলে রক্ষা নেই, মৃত্যু আনিবার্য।"

গুণীনের কথা শুনে সবাই ভয়ে, আতংকে শিউড়ে উঠল। রাজচন্দ্র দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে জেলে ডেকে পুকুরে জাল ফেলার ব্যবস্থা করলেন এবং গুণীনের কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য গুণীনকে বাড়ীতে আটকে রাখলেন। কিন্তু জেলেদের আপ্রাণ চেষ্টাসত্ত্বে ও জালে কোন মাটির ভাঁড় উঠল না। তারপর জেলেরা পুকুরের জলে নামল, ডুব দিয়ে দিয়ে ভাঁড় খুঁজল। পূরো তিনদিন ধরে পুকুরের জল তোলপাড় হল। কিন্তু কোন ভাঁড়ের সন্ধান মিলল না। এত চেষ্টা সত্ত্বে ও ভাঁড় না পাওয়ায় গুনীন বুজরুক বলে সাব্যস্ত হল। যুবকেরা তাকে মারধরের উপক্রম করল। রাজচন্দ্র তাদের নিরস্ত করলেন এবং গুনীনকে তিরস্কার করে বাড়ী থেকে বার করে দিলেন। যাবার সময় গুণীন বলে গেল. "কর্তা! আমাকে যতই গালাগাল দেন না কেন তবু আমি হলপ করে বলছি যে আমার গণনা ভূল হতে পারে না।" লোকে একথা শুনে তাকে যাচ্ছেতাই টিটকারি দিল। শোনা যায় নীলমণির মৃত্যুর সাতদিন পরে কোন এক মাছধরা জালে নাকি সেই ভাঁড়টি উঠেছিল এবং গুণীনের কথামত জিনিসগুলোও সেই ভাঁড়ে পাওয়া গিযেছিল। কিন্তু তখন সেই ভাঁড় উঠা না উঠা সবই সমান। রাজচন্দ্রেব ভাগ্যে যা হবার তাতো হয়েই গিয়েছে। তবু রাজচন্দ্র কিছু পয়সা কড়ি দেবার জন্য সেই আশ্চর্য গুণীনের খোঁজ করেছিলেন। কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া যায়নি। আর কে বা কারা এই জঘন্য কাজটা করেছে , সে অনুসন্ধান আর বাজচন্দ্র করার প্রয়োজন মনে করেন নি।

নীলমণি কন্যা হলেও রাজচন্দ্রের কাছে পুত্রপ্রতিম। নীলমণিকে নিয়ে রাজচন্দ্রের কত আশা কত স্বপ্ন ছিল। নীলের পুত্র, রাজচন্দ্রের ভাবী উত্তরাধিকারীকে ঘিরে রাজের কত না সুখের কল্পনা ছিল। সেই নীলের আজ জীবনসংশয়। মা বাবার মনে হাহাকার। জামাই উল্লাসও দুঃখে ম্রিয়মান। তাই শুধু মেয়ে নয়, জামাইয়ের জন্যও রাজচন্দ্র-হৈমবতীর মনে গভীর দুঃখবোধ আছে।

উদ্বেগ উৎকন্ঠার মধ্য দিয়েই রাজচন্দ্র-হৈমবতীর দিনের পর দিন কাটে।

নাতনীকে নিয়ে মাঝে মাঝে গঙ্গা আসে বাপের বাড়ীতে। আসে গুণমণিও। বিয়ের পর গুণর স্বাস্থ্য বেশ ভাল হয়েছে। স্বভাবও ধীর স্থির হয়েছে। গুণ শ্বশুর বাড়ীতে খুব আদরে যত্নেই আছে। আর জামাইটিও হয়েছে চমৎকার। যেমন তার রূপ গুণ, তেমনি অমায়িক ব্যবহার। গঙ্গা-গুণ দুই মেয়েই সুখী হয়েছে। আজ যদি নীল সুস্থ থাকত , তবে রাজচন্দ্র-হৈমবতী কত সুখী হতেন। কিন্তু তারা মন্দ ভাগ্য বলেই মেয়ে এত রোগভোগ করছে এবং তার জীবনসংশয় দেখা দিয়েছে।

মেয়েরা বাপের বাড়ীতে এলে জামাইরাও দু'একদিনের জন্য আসে শ্বশুর বাড়ীতে। তখন দুঃখের মধ্যেও রাজচন্দ্রের ঘরে একটা সুখের হাওয়া বয়। ওরা এলে নীলমণিও একটু ভালথাকে,বিশেষ করে গঙ্গার মেয়ে তরুকে সে বড় ভালবাসে। তখন সে আর সারাদিন শুয়ে থাকে না। তরুকে কোলে নিয়ে বেশ একটু সময় বসে থাকে, ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে, দুর্বলহাতে ওকে সাজিয়ে দেয়, পায়ের উপরে শুইয়ে ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে বোনঝিকে ঘুম পাড়ায় এবং মাঝে মাঝে গঙ্গাকে বলে ," গঙ্গা এবার তুই যাওয়ার সময় তরুকে আমার কাছে রেখে যাবি। ওকে আমি মানুষ করব।" এমনিতে নীল একেবারে কথাবার্তা বলে না। শুধু তরুকে দেখলেই সে মুখ খোলে। তরুর প্রতি নীলের এই স্নেহ ভালোবাসা দেখে হৈমের চোখে জল আসে। তাঁর মনে হয় নীলমণির কোলে যদি সন্তান আসত, তবে হয়ত সে সুস্থ হয়ে যেত।

এমনি করে আরও বছর খানেক কেটে গেল। নীলেব শরীর অস্থিচর্মসার, অবস্থা খুবই খারাপের দিকে। দিন দিন তার জীবনের আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। সব ধরনের চিকিৎসাই ব্যর্থ হল। রাজ নিরুপায়। বুঝতে পারছেন, শেষের দিনপ্রায় সমাগত। রাজচন্দ্র-হৈমবতীর চোখের সামনে শুধুই অন্ধকার। এমন সময়ে একটা বিশেষ সুসংবাদ এল। গঙ্গার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। বহু আকাঙ্খিত দৌহিত্র এল ঘরে। এই দুঃখের মধ্যেও রাজের হৃদয় আনন্দে উদ্বেল। গুণমণির এখন পর্যন্ত কোন সন্তানাদি হয়নি। শিশু নবব ভাগ্যে কি আছে কে জানে ? হয়ত গঙ্গাঁর পুত্রই হবে রাজের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। সবই মহামায়ার ইচ্ছা। মানুষের ইচ্ছায়তো আর কিছুই হয় না। এসব ভাবনা ভেবে রাজচন্দ্র দৌহিত্রের মঙ্গল কামনা করে মহেশ্বরীর উদ্দেশ্যে প্রণতি জানালেন এবং দেবাদিদেব মহেশ্বরকে স্মরণ করে দৌহিত্রের নাম রাখলেন মহেশ।

গঙ্গার পুত্রসন্তান জন্মানের খবরে অসুস্থ নীলমণিও বড়ই খুশী হয়েছে।

আনন্দে সে তার শীর্ণ হাতে রাজের হাত ধরে বলল," বাবা তুমি আজই গিয়ে গঙ্গার ছেলেকে এখানে নিয়ে এস। ওকে দেখতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে।" রাজচন্দ্র মেয়ের এই অবুঝ আবদারে খুবই স্নেহপূর্ণ স্বরে বললেন, "গতকাল মাত্র জন্মেছে। আজ কি করে নিয়ে আসব, অশৌচ না গেলে কি আনা যায়? অশৌচের ব্রতটা হয়ে গেলেই গঙ্গার ছেলেকে তোমার কাছে নিয়ে আসব মা" নীল অবুঝ হল না। বাবার কথা শুনে ক্লান্তস্বরে শুধু বলল।" তাই এনো বাবা। দেরী করো না কিন্তু।"একথাই নীলের শেষ কথা। এরপর নীল আর কথা বলেনি, চোখ খোলেনি। গঙ্গার ছেলের জন্মের সাতদিনের দিন রাজচন্দ্রের নয়নের মণি, সোনার প্রতিমা নীলমণির জীবনদীপ নিভে গেল। গঙ্গার ছেলেকে দেখার সাধ আর মিটলনা। সব সাধ অপূর্ণ রেখে নীল চলে গেল।

শোকে রাজচন্দ্র উন্মাদ, উদ্‌ভ্রান্ত হৈমবতী। সন্তানশোক যে কত তীব্র তা ভূক্তভোগীই জানে। পৌরুষদৃপ্ত রাজ দিনরাত স্ত্রীলোকের মত রোদন করেন। সে রোদন যার কানে যায় সেও চোখের জল সামলাতে পারেনা। কারোর সান্ত্বনা বাক্যেই রাজের মন প্রবোধ মানে না। আর সান্ত্বনাই দেবে কে? এই দুঃসময়ে কাছের মানুষতো কাছে নেই। গঙ্গা নেই, গুণ নেই, নেই বন্ধু দীননাথও। গঙ্গা আঁতুড় ঘরে, তাই তার পক্ষে আসা অসম্ভব। আর হঠাৎ করে গুণর স্বামী অভয়চরণ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার শয্যাপার্শ্ব থেকে গুণর উঠবার উপায় নেই। মা বাপের কাছে যায় কি করে? আর দীননাথ গেছেন ভিনগাঁয়ে সদ্যবিধবা বোনের বাড়ী। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বোনের শরীকরা যে ঝামেলা করছে তার মোকাবিলা করতে। নীলের মৃত্যুর খবর তিনি জানেনই না। দুঃসময়ে বোধ হয় এরকমই হয়। তাই নিজের শোক ঝেড়ে ফেলে হৈমকেই শোকে বেসামাল স্বামীকে সামাল দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতে হল। নিজের শোক চেপে রেখে হৈম শোকসন্তপ্ত স্বামীকে নিরন্তর প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন।

নীলমণির এই অকাল মৃত্যুতে গঙ্গা; গুনমণিও খুবই শোকাগ্রস্ত। তাছাড়া এই বিপদে তারা যে বাপমায়ের পাশে দাঁড়াতে পারলনা এটাও তাদের খুব কষ্টের কারণ। কবে যে বাপমায়ের কাছে যেতে পারবে এই চিন্তায় দু'জনেই ছটফট করে মরছে, তাদের কাছে পেলে মা বাবার কষ্ট নিশ্চয় খানিকটা লাঘব হত। কিন্তু দু'বোনের একজনও সময়মত যেতে পারল না। সবই ভাগ্য। হৈম ভাবেন গঙ্গা গুণকে কাছে পেলে রাজচন্দ্র খানিকটা শান্তি পেতেন, আর নিজেরও একটু শান্তি

হত। তাই হৈম মেয়েদের আসার জন্য দিন গুণেন। অবশ্য জামাই কোটিশ্বর দু'চারদিন পর পরই আসে। উল্লাসও সবসময় কাছাকাছি থাকে। দিন এভাবেই চলতে থাকে।

গঙ্গার শরীর বিশেষ ভাল নেই। পর পর দুটো সন্তানের জন্ম হওয়াতে তার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। তবু ছেলের সূর্যদর্শনের ব্রতের পরদিনেই সে দুই শিশুসন্তান সহ চলে এল বাপের বাড়ীতে। গঙ্গাকে দেখে রাজচন্দ্র-হৈমবতীর কান্না আর থামে না। বহুকষ্টে গঙ্গা ছেলেকে বাপের কোলে ও মেয়েকে মায়ের কোলে দিয়ে তাদের শান্ত করল। গঙ্গা আসার দিনদুই পরে গুণও এসে পড়ল। দুই মেয়ে ও নাতি নাতনীকে কাছে পেয়ে রাজচন্দ্র আপাতদৃষ্টিতে খানিকটা শান্ত হলেন। হৈমর শোকও খানিকটা প্রশমিত হল। নাতিকে নিয়ে রাজচন্দ্রের যেন আনন্দের সীমা নেই। নাতির অন্নপ্রাশন, তার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে খুব আলোচনা করেন। নীলের জন্যও শোকতাপ করেন বটে। তবে নাতির প্রসঙ্গ তুললেই তা খানিকটা চাপা পড়ে যায়। আবার জামাই অভয়ের অসুখের জন্যও দুশ্চিন্তা করেন। যদিও সে এখন একটু ভালই আছে। নীলপ্রসঙ্গ ছাড়া সংসারের অন্যান্য দিকেও যে রাজচন্দ্রের একটু মন ফিরেছে। এজন্য হৈম একটু নিশ্চিন্তবোধ করেন। কারণ যে গেছে সেতো আর হাজার কান্নাকাটি করলেও ফিরে আসবে না। কিন্তু রাজ বড়ই অবুঝ। তার শোকের যে তীব্রতা তাতে তারও জীবনহানি ঘটতে পারে, এমন চিন্তায় হৈম বড়ই বিব্রত ছিলেন,এখন গঙ্গা গুণর উপস্থিতিতে ,নাতি নাতনীর সান্নিধ্যে রাজ যে একটু স্বাভাবিক হয়েছেন, তাতে শোকের মধ্যেও তিনি একটু শান্তি অনুভব করেন। ইতিমধ্যে বন্ধু দীননাথও এসে পড়েছেন। তিনিও সবসময় শোক গ্রস্ত বন্ধুকে আগলে রাখেন। তাছাড়া সময়ের ব্যবধানেও স্বাভাবিকভাবে মানুষের শোকের মাত্রা কমে আসে। তাই রাজচন্দ্রকে এখন কিছু স্বাভাবিক মনে হয়। স্বামীর ব্যাপারে হৈম এখন নিশ্চিন্ত বোধ করেন। জীবনযাত্রা তাদের অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে।

কিন্তু মানুষের জীবনে বিপদ যখন আসে , তখন পর পর আসতেই থাকে। একটা বিপদের পিছনে যেন অনেকগুলো বিপদ ঘাপটি মেরে বসে থাকে। একটি বিপদ কাটিয়ে উঠার পরই আর একটা বিপদ আচমকা এসে ঝাপিয়ে পড়ে। নীলের মৃত্যুর পর হৈমর জন্য যে অনেকগুলো বিপদ সারি বেধেঁ অপেক্ষা করছিল তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। মেয়েদের উপস্থিতেতে বাইরের দিক থেকে

রাজচন্দ্রকে স্বাভাবিক মনে হলেও অন্তরে তার শোকেব জ্বালার কিছুমাত্রহ্রাস ঘটেনি। মেয়েরা দুঃখ পাবে বলে তাদের সামনে প্রাণপণে তিনি নিজের কষ্ট চেপে রেখেছিলেন। যতদিন যাচ্ছে, ততই তার শোকের জ্বালা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। নীলবিহনে তিনি যেন কিছুতেই জীবনধারণ করতে পারছেন না। লোকচক্ষে অবশ্য তিনি অনেকটা স্বাভাবিক শান্ত।

বাড়ীতে শোকের পরিবেশটা যখন অনেকটা হালকা হয়ে এল, তখন গঙ্গা-গুণ নিজ নিজ শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে গেল। এখন বালিকা নবদুর্গাই মা বাবার একমাত্র অবলম্বন। শিশু নব শোকতাপ বুঝে না। হেসে খেলেই দিন কাটায়। অবশ্য নীলের স্বামী উল্লাস এখন পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ীতেই রয়ে গেছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তারতো আর এখানে থাকার কথা নয়। সেতো নিজের বাড়ীতে গিয়ে আবার বিয়ে থা করে সংসারধর্ম পালন করতে পারে। তারতো এখন চলে যাওয়াই উচিত। তবু সে আছে। চক্ষুলজ্জাবশতঃ রাজচন্দ্র-হৈমবতী তাকে চলে যেতে বলতে পারছেন না বটে তবে তার থাকাটাও তাদের মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। এটা যে উল্লাস একেবারে বুঝতে পারে না তা নয়। তবু সে নির্বিকার। কেন কি উদ্দেশ্যে সে এখানে পড়ে আছে সেই জানে। রাজচন্দ্র-হৈমবতীব কাছে তাব এই থাকাটা স্বাভাবিক মনে হয় না।

প্রিয়কন্যার মৃত্যুর প্রচণ্ড আঘাতে রাজের মন একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে। তাছাড়া বয়সও হয়েছে। তাই এখন তার এটা সেটা অসুখ লেগেই থাকে। চিকিৎসা করাতেও তার মোটেই আগ্রহ নেই। চলে যেতে পারলেই যেন তিনি বেঁচে যান। কথাবার্তাও খুব কম বলেন আপনমনে কি যেন ভাবেন। প্রিয়বন্ধু দীননাথ পর্যন্ত এখন রাজের মনের নাগাল পান না। এমনি টুকিটাকি অসুখে ভুগে নীলের মৃত্যুর মাত্র ছয়মাস পরে সজ্ঞানে দুর্গানাম জপ করতে করতে রাজচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাঁর শোকতাপ নির্বাপিত হল। কন্যার মৃত্যুর মাত্র ছয় মাসের মধ্যে হঠাৎ রাজচন্দ্রের মৃত্যুতে হৈমবতী পড়লেন একেবারে অথৈ জলে। কন্যার পাশাপাশি স্বামী যে চলে যাবেন, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। শোকেদুঃখে হৈম যখন একেবারে দিশেহারা, তখন বোঝার উপর শাকের আঁটির মত দেখা দিল নানান বৈষয়িক সমস্যা। রাজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিষয় অনভিজ্ঞ হৈমকে ঠকানোর জন্য শরীকরা উঠে পড়ে লেগে গেল। এই দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর মত কেউ নেই। এক আছেন স্বামীর বন্ধু দীননাথ। কিন্তু রাজের মৃত্যুতে তিনিও

কেমন জবুথবু হয়ে পড়েছেন। জামাই কোটিশ্বরের বিষয়বুদ্ধি একেবারেই নেই। মেয়ে হলেও গঙ্গার কিছু বিষয়বুদ্ধি আছে। আর আছে জামাই অভয়চরণের। কিন্তু ভাগ্যদোষে হৈম তাদেরও পাশে পাচ্ছেন না। কারণ গঙ্গার শ্বশুরবাড়ীতেও বিষম বিপদ। গঙ্গার বড় ভাশুর ঈশ্বরের ষোল বছর বয়সী একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তাদের পরিবারেও মহাবিপর্যয়। পুত্রশোকে ঈশ্বর উন্মাদ হয়ে গেছে। তাকে সামলে রাখা দায়। গঙ্গার শ্বশুরকুলও বাপের কুলে সমান বিপদ। আর অভয়চরণতো দীর্ঘদিন ধরেই কঠিন অসুখে ভুগছে। তাই তার পক্ষেতো কোন কিছু করা সম্ভবই নয়। অভয়ের অসুখটা কি তা গুণ ওরা স্পষ্ট করে কিছু বলছে না। তবে লোকমুখে তিনি শুনেছেন যক্ষারোগ হয়েছে অভয়ের। বিপদের উপরে অভয়ের অসুখটাও একটা বিপদ। আর বড় জামাই উল্লাস? সে তার খাওয়া পরা আরাম -আয়েশ নিয়েই ব্যস্ত আছে। এ বাড়ীর ভালমন্দ, বিপদ আপদে তার কিছু যায় আসে না। অথচ খাচ্ছে পরছে এ বাড়ীতেই। এমনিতেই সে খুবই সুবিধাবাদী এবং ভিজেবেড়ালের স্বভাব তার। হৈম লক্ষ্য করেছেন , শ্বশুরের মৃত্যুর পর তার রূপ অনেক পালটে গেছে। চাকর বাকর নায়েব গোমস্তার সঙ্গে সবসময় ফিসফিস গুজগুজ করে। ক্রোধে হৈমর আপদ মস্তক জ্বলে যায়। তবু উল্লাসকে তিনি চলে যেতেও বলতে পারেন না।

বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে হৈম খুবই অজ্ঞ। স্বামীর জীবদ্দশায় বিষয় আশয়ের খোঁজ নেওয়ার কোন প্রয়োজন হয়নি তার। কিন্তু স্বামীর অবর্তমানে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে তাকে প্রচণ্ড নাজেহাল হতে হচ্ছে । হৈমর অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে শরীকরা যেমন তাকে ঠকানোর ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠেছে। তেমনি নায়েব-গোমস্তা ইত্যাদি কর্মচারীরাও সুযোগ বুঝে পুকুরচুরি শুরু করে দিয়েছে। হৈম একান্ত নিরুপায়। তবে মানুষ যখন একান্ত অক্ষম অসহায় হয়ে পড়ে, তখন ঈশ্বর তার সহায় হন, শক্তি দেন। হৈমর মধ্যেও একটা আত্মশক্তি জাগ্রত হল। সমস্ত শোকতাপ, দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য হৈম খুব শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। দুষ্ট কর্মচারীদের বিতাড়িত করে বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ করলেন। উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করে সাধ্যমত বিষয় আশয় বুঝে নিলেন। ফল ভালই হল। প্রতিকূল পরিস্থিতি খানিকটা অন... হল।

বৈষয়িক ঝামেলার পাশাপাশি জামাই উল্লাসকে নিয়েও হৈম নিত্য নূতন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ পরিবারে সে ঘরজামাই হিসাবে এসেছিল এবং

শ্বশুরের সম্পত্তি ও তারই পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার ভাগ্যদোষে তারস্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল। এজন্য সম্পত্তি লাভতো দূরের কথা, শ্বশুরবাড়ীতে তার আর কোন অধিকারই রইল না। তবু সে আগাছার মত শ্বশুরবাড়ীতেই পড়ে আছে। হৈমর স্বচ্ছল সংসারে একটা লোকের খাওয়াপরা থাকা কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু সে যে নেহাৎ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য এখানে পড়ে আছে, তা মনে হয় না। তার মনে বদমতলব আছে। রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর তার আচার আচরণে হৈম তা অনুমান করতে পারছেন। বেহাল সংসার দেখে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নায়েব-গোমস্তা চাকর বাকরও হৈমর প্রতিপক্ষ শরীকদের সঙ্গে একজোট হয়ে সে যে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছে তা এখন হৈমর কাছে একেবারে স্পষ্ট।

আর প্রশয় দেওয়া উচিত নয় ভেবে হৈম একদিন তাকে ডেকে বললেন, "দেখ বাবা, আমার মেয়ে যখন নেই, তখন তুমি আর এখানে থেকে কি করবে। তুমি তোমার বাড়ীতে চলে যাও এবং সেখানে গিয়ে আবার বিয়ে থা করে সংসারধর্ম কর। তোমার ভালর জন্যই একথা বলছি।" হৈমর কথা শুনে কপট উল্লাস কেঁদে শ্বাশুড়ীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল এবং বলল, "আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না মা! যে বাড়ী থেকে আমি চলে এসেছি, সেখানে আমি আর কোনদিন ফিরে যাব না। আপনি তাড়িয়ে দিলে আমি বরং গাছতলায় আশ্রয় নেব। কিন্তু ওবাড়ীতে নয়। আর নীলুর স্মৃতি মুছে ফেলে দ্বিতীয়বার বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার মেয়ে নেই একথা সত্যি। কিন্তু আপনিতো ধরে নিতে পারেন যে আমি আপনার এক অভাগা ছেলে। আমার মা নেই। বিয়ের পরে আপনাকেই আমার মা বলে মনে হয়েছে। তাই এখানে থেকেই আপনার চরণ সেবা করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাই, আপনি আমাকে যেতে বলবেন না মা।" এরপরেতো হৈমবতীর পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভব নয়। নষ্টামী দুষ্টামী যাই করুক না কেন তবুতো নিজেরই জামাই। তার কথা ও কান্নায় স্নেহশীলা হৈমর হৃদয় গলে গিয়েছিল। তাছাড়া মেয়ের স্মৃতির প্রতি জামাইয়ের এই আন্তরিক নিষ্ঠার কথা শুনে হৈমর মনটা উল্লাসের প্রতি এতই প্রসন্ন হয়ে গেল যে তার দোষত্রুটি গুলির কথা আর যেন মনেই রইল না। মেয়ের প্রতি জামাইয়ের এই গভীর ভালবাসা হৈমকে অভিভূত করল।

এরপর থেকে উল্লাসের মধ্যেও বেশ একটা পরিবর্তন দেখা দিল। তাকে আর কারোর সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে দেখা যায় না। সংসারের নানা কাজে সে

খুবই সাহায্য করে এবং শ্বাশুড়ীকে আগের চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধা ভক্তি করে। ব্যবহারটা তার অনেকটা ছেলের মতই।

এতবড় সংসার সামলাতে হৈমকে হিমসিম খেতে হয়। এখন উল্লাসের আন্তরিক সহায়তা পেয়ে তিনি একটু স্বস্তিবোধ করছেন। এখন সে যা করছে নিজের ছেলের মতই করছে। তাই উল্লাসের প্রতি হৈমর সে বিরূপ ভাবটা আর নেই। তার উপর তিনি এখন খুবই সন্তুষ্ট।

প্রায় একবছর হয়ে গেল রাজচন্দ্র হৈমকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। এই এক বছরের মধ্যে হৈমর উপর দিয়ে কত যে ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। যে ঈশানের জন্য রাজচন্দ্র এত করেছেন, সেই ঈশানও সুযোগ বুঝে ভ্রাতৃবধূর বিরুদ্ধে কম চক্রান্ত করেন নি। হৈম স্বামীর ছত্রছায়ায় নিশ্চিন্ত জীবন কাটিয়েছেন। তাছাড়া তিনি খুব সহজ সরল প্রকৃতির মানুষ। তাই মানুষের ছলছাতুরী,ধূর্ততা, শঠতা এসব চট করে বুঝতে পারেন না। ফলে রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাকে পদে পদে হোচট খেতে হয়েছে। এখন অবশ্য তিনি অনেকটা ধাতস্থ হয়েছেন। আর উল্লাসের আন্তরিক সহায়তা পেয়ে তার মনের বলও খানিকটা বেড়েছে। মেয়ে নেই অথচ জামাই যে এতটা করছে , এজন্য তিনি উল্লাসের নিকট খুবই কৃতজ্ঞ। উল্লাসের উপর এখন অনেক ব্যাপারেই নির্ভর করা যায়। গঙ্গা অবশ্য উল্লাসের পূর্বব্যবহারের উল্লেখ করে তাকে এতটা বিশ্বাস না করতে মাকে প্রায়ই পরামর্শ দেয়। কিন্তু হৈমগঙ্গার কথায় মোটেই পাত্তা দেন না। উল্লাসের স্বভাব চরিত্রের যে পরিবর্তন হয়েছে তাতো তিনি দেখেছেন। গঙ্গাতো সবসময় এখানে থাকে না। সে বুঝবে কি করে ? এরপর অবশ্য গঙ্গার কিছু বলার থাকে না , তবু তারমনে উল্লাসের প্রতি অবিশ্বাসের একটা কাঁটা বিঁধেই থাকে উল্লাসের জন্য একটা ভয়ঙ্কর ক্ষতি হতে পারে। এই আশংকা গঙ্গা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না।

গঙ্গার অনুমান মিথ্যে নয়। কুচক্রী লোভী উল্লাস যে ভালমানুষীর আবরণের অন্তরালে ভয়ঙ্কর বদ মতলব হাসিল করার তালে আছে , তার বিন্দু বিসর্গও হৈমবতী বুঝতে পারলেন না। উল্লাসের ব্যবহারে তৃপ্ত হৈম এখন একান্তভাবে উল্লাসের উপর নির্ভরশীল, তার পরামর্শই হৈমর কাছে সবচেয়ে গ্রহণ যোগ্য। উল্লাস শ্বশুরের বৎসরান্ত শ্রাদ্ধ গয়াধামে গিয়ে করার জন্য শাশুড়ীকে পরমর্শ দিল। গয়াতে পিন্ডদান করলে মৃত আত্মার অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। শ্বশুরমশাইতো

টাকা পয়সা কিছু কম রেখে যাননি। তার আত্মারসদগতির জন্য অবশ্য কিছু খরচ করা উচিত। গয়ার কাজ সেরে ইচ্ছে করলে কাছাকাছি তীর্থগুলোও ঘুরে আসা যায়। তাতে পুণ্যসঞ্চয়ও হবে আর ভ্রমণের ফলে মনটাও একটু হাল্কা হবে। শাশুড়ীমা যদি ইচ্ছুক থাকেন, তবে উল্লাস যাত্রার সব রকম ব্যবস্থা করে ফেলতে পারে।

উল্লাসের প্রস্তাবটা হৈমর খুবই মনে ধরল। হৈম স্বামীগতপ্রাণা। স্বামীর স্বর্গবাসের জন্য গয়ায় পিণ্ডদান করাটা তার কাছে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে হল। আর তীর্থ করে পুন্যসঞ্চয়ের ব্যাপারেও তাঁর যথেষ্ট মোহ আছে। তাই উল্লাসের প্রস্তাবে রাজী হতে গিয়েও একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। সংসারের বিধিব্যবস্থা হয়ত কোনরকমে করা যাবে। মাসখানেকের ব্যাপার বইতো নয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা নবদুর্গা। সে মাত্র পাঁচ বছরের বালিকা। পথের ধকল এইটুকু শিশু হয়ত সহ্য করতে পারবেনা। তাকে রেখে যাওয়াও হৈমর পক্ষে সম্ভব নয়।

এ সমস্যার সমাধানও উল্লাসই করল। সে বলল, "নবকে নিয়ে আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না মা। আমি যখন সঙ্গে যাচ্ছি তখন ওকে দেখে শুনে রাখার দায়িত্বতো আমার। এরচেয়ে ছোট শিশু নিয়ে মানুষ তীর্থে যায়। তীর্থমাহাত্ম্যে সঠিক বিশ্বাস থাকলে কোন অকল্যাণ হতে পারে না। তাছাড়া দু'জন কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে যাব। অসুবিধের বিন্দুমাত্র কারণ নেই।"

উল্লাসের সব কথায়ই এখন হৈমর গভীর আস্থা। তাই সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে তিনি তীর্থযাত্রার জন্য মন স্থির করলেন। এ ব্যাপারে তিনি কারো সঙ্গে কোন পরামর্শ করার প্রয়োজনবোধ করলেন না। উল্লাসের উপর তাঁর এতটাই বিশ্বাস ও নির্ভরতা। গঙ্গা গুণকে পর্যন্ত এ ব্যাপারে তিনি কিছু জানালেন না।

তবে ভ্রাতৃবধূর তীর্থযাত্রার খবরটা ঈশানের কানে পৌছে গেল। ব্যাপারটা ঈশানের কাছে ভাল ঠেকল না। যদিও হৈমর সঙ্গে ঈশানের এতটুকু সদ্ভাব নেই তবু তারা এক পরিবারভূক্ত। বৈরীতা যতই থাক. রক্তের টান বলতে একটা কথা আছে ,হৈম অল্পবুদ্ধি গেঁয়ো মেয়েমানুষ, নব নেহাৎ শিশু ,আর সঙ্গী হল কুচক্রী উল্লাস। শ্বশুরের সম্পত্তি লাভের আশা বানচাল হওয়ায় দুষ্টবুদ্ধি উল্লাস যে অল্পবুদ্ধি শশুড়ীকে বেকাদায় ফেলে সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার তালে আছে, তা ঈশান ভালই বুঝতে পারেন। অথচ এই উল্লাসের উপর ভ্রাতৃজায়ার অগাধ বিশ্বাস এবং সেই হল তীর্থপথের সঙ্গী। যতই মনোমালিন্য থাক. হৈমর এই হঠকারী

সিদ্ধান্তে ঈশান চুপ করে থাকতে পারলেন না। গায়ে পড়েই একদিন হৈমকে বললেন,"বউঠান শুনলাম, তুমি নাকি উল্লাসকে নিয়ে তীর্থে যাচ্ছ? যদিও তুমি আমাকে কিছুই জানাওনি, তবু আমি বলছি, একটি শিশুকে সঙ্গে নিয়ে তোমার উল্লাসের সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি মেয়েমানুষ পথঘাট সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই। তীর্থের পথ সুগম নয়, আর তীর্থস্থানের পরিবেশও সর্বত্র ভাল নয়। নবকে নিয়ে তোমার এই তীর্থযাত্রার ব্যাপারে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। একথা আমি তোমাকে স্পষ্ট করেই জানালাম।"

দেবরের কথায় হৈম মনে মনে বড়ই বিরক্ত হলেন। কিন্তু বিরক্তি চেপে শান্তভাবেই বললেন, "শুধু উল্লাসকে নিয়েইতো যাচ্ছি না। হরিচরণ, কানাই এই দু'জন কর্মচারীকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আর উল্লাসতো পর নয়, নিজেরই জামাই। আর তার যথেষ্ট দায়িত্বজ্ঞানও আছে।" উত্তরে ঈশান বললেন,"দেখ বউঠান কথায় আছে 'মা মরলে বাপ তালুই।' মা মরলে বাপই যখন পর হয়ে যায়, আর তোমার মেয়ে নেই, তবু জামাই এত আপন হয়ে গেল। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই বলেই ওকে তুমি এত আপন ভাবছ। কিন্তু সে যে কত ধূর্ত ও মতলবাজ তা আমার অজানা নয়। বিদেশে নিয়ে গিয়ে তোমাকে সে যে কোন বিপদে ফেলে দিতে পারে? একথা আমি তোমাকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলাম। তুমি আমাবে যাই ভাবনা কেন তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। তবে আমি যা কিছু বলছি তোমার ভালর জন্যই বলছি। তুমি আমার ঘরের লোক বলেই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি। নইলে বলতাম না।"

এবার হৈম আর ধৈর্য্য রাখতে পারলেন না। বললেন,"আমার কত ভাল যে করেছ, সে আমিও জানি, তুমিও জান। আর ভাল করার দরকার নেই। উল্লাসদুষ্ট প্রকৃতির, মতলববাজ. আর তুমি খুব ভালমানুষ তাই না? তোমার দাদার মৃত্যুর পর তুমি আমার কতশত ভাল করেছ, তা ভুলে যাইনি আমি। আমাকে উপদেশ না দিয়ে বরং আমার জোতজমি ছলছাতুরী করে নিজের নামে লিখে নেওয়ার চেষ্টা করোগে এবং তাতেই তোমার ভালমানুষীর যর্থাথ পরিচয় দেওয়া হবে আর তুমি যে ঘরের শত্রু বিভীষণ এও আমার জানা আছে। তবে জেনে রাখ, আমি উল্লাসকে নিয়ে যাব যখন ঠিক করে ফেলেছি, তখন যাবই।"

এরপর ঈশানের আর কিছু বলার রইল না। বিষন্নমনে তিনি হৈমর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। স্বার্থের সংঘাতে তাদের পাবারিক সম্পর্কের ভিত

নড়ে গেছে এবং এ ব্যাপারে তিনিই সম্পূর্ণ দায়ী। বউঠানতো আর কিছু মিথ্যে বলেননি। দাদার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার লোভ কি তারই কিছু কম? অথচ দাদা কত উদার মনের মানুষ ছিলেন। দাদার জন্য বেদনায় এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় ঈশানের চোখ দিয়ে জলের ধারা নামল। তবে ঈশানের এই বেদনাবোধ ও অনুতাপ সবই ক্ষণিকের। অর্থলোভ জ্ঞাতিশত্রুতা বড় ভয়ানক জিনিষ। লালসা ঈষা মানুষকে ন্যায়ের পথে থাকতে দেয না। স্নেহপ্রীতির সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরায়। লোভ ঈর্ষা, আপনকে পর করে দেয়। আজ ঈশানের সংসারে ও তাই হয়েছে। আগে যে বউঠান তার সবকথা নির্বিচারে মেনে নিতেন সেই বউঠানের আজ তার উপর কোন আস্থা নেই। বিষন্নমনে ঈশান নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং দুঃখিত মনে ভাবতে লাগলেন। স্বার্থের জন্য ঘরভাঙ্গা খুবই সহজ কিন্তু জোড়া দেওয়া বড়ই কঠিন। হৈমবতীর তীর্থযাত্রার কথাটা দীননাথের কানেও গেল। হৈম অন্য সব ব্যাপারে দীননাথের সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু উল্লাসের পরামর্শে তিনি এ ব্যাপারে দীননাথের সঙ্গে কোন কথা বলেন নি। লোকমুখে শুনে দীননাথও এলেন এবং এভাবে তীর্থে রওনা হতে বারণও কবলেন। দীননাথ বললেন,'' আপনি তীর্থে যাবেন একথাটা তো আমাকে জানালেন না বউঠান। আমি লোকের মুখে শুনে কথাটা সত্যি কিনা জানতে এলাম। তা আপনি না জানালেও আমার নিজেরত আপনার ভালমন্দেব ব্যাপারে একটা কর্তব্য আছে। তাই বলছি ,উল্লাস লোক ভাল নয়। ওকে নিয়ে বিদেশ বিভূঁয়ে গেলে বিপদ হতে পারে। কাজেই আপনি উল্লাসেব কথায় পা বাড়াবেন না। আমি অনেক ভেবে চিন্তেই কথাটা বলছি।''

হৈমকে তীর্থের মোহে পেয়ে বসেছে তাই দীননাথের পরামর্শ শুনে তিনি মনে মনে রেগে গেলেন। মনেমনেই বললেন বিপদেব সময় দেখা পাওয়া যায়নি,এখন এসেছেন একটা পুণ্য কাজে বাগড়া দিতে। উল্লাস শয়তান, আর সবাই ভগবান। মনে এসব ভেবে খুব শান্ত ভাবে বললেন, আপনি মোটেই ভাববেন না। তীর্থের কাজ সেরে আমি ভাল ভাবেই ফিরে আসতে পারব। শুধু উল্লাস নয়, দু'জন কর্মচারীও সঙ্গে যাচ্ছে। আপনার বন্ধুর গয়াশ্রাদ্ধ করার আমার একান্ত ইচ্ছা।'' দীননাথ বললেন,আপনার যখন একান্ত ইচ্ছা তখন আমি আর কি বলব। তবে আমার মনে হয়, নব আর একটু বড় হলে ওর বিয়েটা সেরে গেলে ভাল হত। যাক সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা , দীননাথ কিছু সময় বসে অন্য দু'চার কথা বলে

বিদায় নিলেন। বন্ধুপত্নীকে এর বেশী তিনি কীইবা বলতে পারেন। তবে কাজটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না ভেবে তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কিছু করার নেই। বন্ধুপত্নীকে তিনি আর কতটুকু বাধা দিতে পারেন। তাছাড়া কোন বাধাই যে হৈমকে ঠেকাতে পারবে না তা তিনি বুঝে গিয়েছেন।

হৈমর তীর্থযাত্রার ব্যাপারে এরূপ বাধার সৃষ্টি হওয়ায় উল্লাস বড়ই চিন্তায় পড়ে গেল। ঈশান জ্ঞাতিশত্রু । তাই হৈম তার কথায় যে আমল দেবেন না সে সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত। তবে দীননাথের কথায় তার মন ঘুরে যেতে পারে। তারপর রয়েছে গঙ্গা । সে জানতে পারলে মাকে কিছুতেই উল্লাসের সঙ্গে যেতে দেবে না। গঙ্গা বড় চতুর মেয়ে। গঙ্গাকে উল্লাস দু'চোখে দেখতে পারে না। ছেলের মা হওয়ার সুবাদে বাপের সম্পত্তি পাবে বলে তার বড়ই গুমর। অথচ শ্বশুরের এই সোনার থালা সম্পত্তির মালিকতো তারই হওয়ার কথা ছিল। সন্তানহীন অবস্থায় নীলমণির মৃত্যু হওয়ায় সে বঞ্চিত হল। কিন্তু এই বঞ্চনা সে কিছুতেই মেনে নেবে না। উল্লাসের মতে জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ সন্তানই ন্যায়তঃ পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কাজেই নীলের অবর্তমানে এই সম্পত্তি নবদুর্গার প্রাপ্য। কিন্তু ছেলের সুবাদে গঙ্গাই সম্পত্তির মালিক হতে চলেছে। উল্লাস তা হতে দেবে না কিছুতেই। একটা কিছু বিহিত তাকে করতেই হবে এবং সেই বিহিত করতে হলে হৈমকে কিছু দিনের জন্য এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া দরকার সেই ব্যবস্থাটা সে পাকা করে ফেলেছিল। কিন্তু এখন যে ধরনের বাধার সৃষ্টি হচ্ছে , তাতে যদি হৈম যাওয়া স্থগিত করেন তবে উল্লাসের পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। তাই চিন্তিত উল্লাস হৈমকে বাজিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে গেল এবং কৃত্রিম একটা উদাসভাব নিয়ে বলল,''সবাই যখন অমত করছে তখন যাওয়াটা স্থগিতই করুন মা। আমি ভালর জন্যই বলেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি 'সৎ কাজে শতেক বাধা'। বিপদ আপদ পথে বেরুলেই হবে আর বাড়ীতে থাকলে হবে না। এ কেমন কথা। ভাগ্যে যা লেখা আছে ,তা আপনি যেখানেই থাকুন না কেন সেটা ঘটবেই। ঈশানকাকা, দীনুমেসোরতো মত নেই। মনে হচ্ছে গঙ্গাও আপত্তি করবে। সে আপনাকে যেতেই দেবেনা। তাই যাওয়াটা স্থগিত করাই ভাল। আমি ভালর জন্যই বলেছিলাম। কিন্তু এখন ভেবে দেখলাম আমার কি দরকার এসব দায়দায়িত্বে যাওয়ার ? শুধু শুধু নিন্দামন্দের ভাগী হব। তাছাড়া কিছু মনে করবেন না মা! আপনার মেজোমেয়ে গঙ্গার যা কড়া স্বভাব ,ভালমন্দ কিছু হলে সে আমাকে

যাচ্ছে তাই অপমান করে বসবে। আর বিপদ আপদ যে হবেই না সে তো আমি হলপ করে বলতে পারি না। আমিতো আর ভগবান নই। তাই বলছি যাওয়ার চিন্তাটা বাদ দিন। আমার মন ঘুরে গেছে।'' উল্লাস খুব কায়দা করে টোপ ফেলল এবং হৈমও সে টোপ গিলে ফেললেন।

বিপদ ঘনিয়ে এলে মানুষের বুদ্ধি নাশ হয়। হৈমরও তাই হয়েছে। যাওয়ার ব্যাপারে উল্লাসের কৃত্রিম অনীহা দেখে তাঁর উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। তিনি বললেন,''তুমি ঠিকই বলেছ বাবা! তোমার তো এব্যাপারে কোন স্বার্থ নেই। আমার কথা ভেবেই যে তুমি যাওয়ার ব্যবস্থা করেছ তা আমি ভালই বুঝি। কাজেই এসব অবান্তর কথা। আসলে আমি সৎকাজ করি এটা কেউ চায় না। ঠাকুরপোর কথাতো আমি গ্রাহ্যই করি না। সেতো আমার চিরশত্রু। আর তোমার শ্বশুর চলে যাবার পর দীনুঠাকুরপোই বা আমার কোন উপকারটা করেছেন? লোক চিনতে আর আমার বাকী নেই। তবে গঙ্গার কথা অবশ্য আমি ঠেলতে পারব না। মনে হচ্ছে সে অমত করবেই। তাই ভাবছি আমি যাবই যখন ঠিক করেফেলেছি, তখন যাবই। গঙ্গাকে আগে থেকে না জানালে সে আর মতামত বলার সুযোগই পাবে না। ভাবছি রওনা হওয়ার আগমূহুর্তে ওকে একটা খবর দিয়ে চলে যাব। মাসখানেকের ব্যাপার বৈত নয়। ফিরে এলে সে অ বশ্য খুবই রাগারাগি করবে। তখন চুপ করে থাকলেই তার রাগ পড়ে যাবে। আর গুণতো ভালমন্দ কিছু বলবেই না। তাই আমি বলছি মন খারাপ না করে তুমি তাড়াতড়ি যাওয়ার ব্যবস্থাটা করে ফেল। লোকের কথায় কান দিলে কার্য পণ্ড হয়। কাজেই যাব যখন স্থির করেছি তখন যাবই। তুমি ব্যবস্থা করার ব্যাপারে আর দোনামনা কর না। হৈমর সিদ্ধ্যান্তে উল্লাস বড়ই উল্লসিত হল। তার উদ্দেশ্য প্রায় সিদ্ধির পথে। এখন মানে মানে রওনা হতে পারলেই হয়। কাজেই সে তড়িঘড়ি যাত্রার সম্পর্ণ আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলল এবং শুভদিন দেখে তীর্থযাত্রীর দল রওনা হয়ে পড়ল। বুদ্ধিভ্রংশ হৈম বুঝতেই পারলেন না তিনি কি ভয়ঙ্কর ফাঁদে পা দিতে চলেছেন।

গঙ্গা গুণ যখন মায়ের তীর্থযাত্রার খবরটা পেল, তার আগের দিনই হৈম রওনা হয়ে গেছেন। তাই এ ব্যাপারে তাদের কিছু করার ছিল না। খবরটা পেয়ে ক্রোধে- দুশ্চিন্তায় গঙ্গা দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হল। মা যে তার সঙ্গে পরামর্শ না করে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তা সে কল্পনাও করতে পারে নি। গঙ্গা জানে উল্লাস লোক ভাল নয়। নিশ্চয় কোন বদউদ্দেশ্য নিয়ে মাকে ফুসলিয়ে নিয়ে

গেছে। গঙ্গার মুখে অন্নজল রোচে না। দিনরাত শুধু চিন্তা আর চিন্তা।

চিন্তা যে কোটিশ্বরেরও কিছু হয়নি তা নয়। তবু তীর্থে যখন গিয়েছেন শাশুড়ীমা, তীর্থমাহাত্ম্য গুণে হয়ত মঙ্গল মতেই ফিরে আসবেন। তাছাড়া চলেই যখন গিয়েছেন এখন আর চিন্তা করে কি হবে। এখন বিশ্বনাথ ভরসা। তাই উতলা গঙ্গাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সে বলল,"এত ভাবনা চিন্তা কর না। তীর্থে যখন গিয়েছেন, দেবতার দয়ায় নিশ্চয় তীর্থধর্ম সেরে মঙ্গলমতে ফিরে আসবেন শাশুড়ীমা, আর উল্লাসদাদা যেমনই হউক না কেন, সঙ্গেত হরিচরণ কানাইও আছে। তাই বলছি এত চিন্তা ভাবনা না করে ঠাকুরকে ডাক।"কিন্তু কোটিশ্বরের সান্ত্বনাবাক্যে গঙ্গার মন প্রবোধ মানল না। ভয়ানক একটা অমঙ্গল আশংকায় তার মন শংকিত হয়েই রইল।

তাদের দু'বোনের কাউকে না জানিয়ে মায়ের এই তীর্থযাত্রার খবরে গু ণও যারপর নাই বিরক্ত হল। এমনিতে সে মোটেই চিন্তা ভাবনা করতে পারে না। এরমধ্যে অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে তার ভাবনার অন্ত নেই। আবার এখন এই উটকো ঝামেলা। মায়ের যা ইচ্ছা হয়েছে তাই করেছেন। এখন যা হবার হবে। সে আর ভেবে কি করবে। কিন্তু গুণ ভাবনা চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিলেও অভয় কিন্তু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল। সে অসুস্থ বটে, কিন্তু তার বুদ্ধি বিবেচনাতো আর লোপ পায়নি। শাশুড়ীঠাকুরুনের এই হঠকারী সিদ্ধান্তে সে খুবই বিচলিত হল। উল্লাস লোক ভাল নয়। কি কাণ্ড করে আসে কে জানে। অভয় বড় চিন্তিত হয়ে পড়ল। কিন্তু তার চিন্তার কথা গুণকে বলল না গুণ হাসিখুশি মানুষ। দুশ্চিন্তাদুর্ভাবনা করতেই পারে না। তাছাড়া তার অসুখ নিয়েও তো গুণর কষ্ট চিন্তা কিছু কম হচ্ছে না। তাই অভয় গুণকে এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু না বলে দুর্ভাবনাটা নিজের মনেই চেপে রাখল।

বিষয়সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ হলেও হৈম ও নব ঈশানের পরিবারের লোক। স্বাভাবিকভাবেই ঈশানও হৈমর এই যাওয়াতে উদ্বেগ বোধ করছেন। বিশেষ করে নবর জন্য ঈশানের খুব চিন্তা হচ্ছে। নবকে তিনি বড়ই স্নেহ করেন। নবর চিন্তা তার মন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও দূর হয় না। শুধু ঈশান কেন ? ঈশানের গোটা পরিবারেই হৈমর এই তীর্থযাত্রার ব্যাপারে একটা উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।

দীননাথ অবশ্য এতসব চিন্তা করছেন না। তবে হৈমবতীর আচরণে তিনি মনে মনে খুবই বিরক্ত। স্ত্রীলোকের এত বাড়াবাড়ি মোটেই ভাল নয়। হৈমকে

তিনি বরাবরই সহজ সরল নম্র প্রকৃতির বলেই ভেবে এসেছেন। কিন্তু তার মধ্যে যে এতটা একগুঁয়েমী আছে তা বুঝতেই পারেন নি। যাক যা হবার হয়েছে। এখন ভালয় ভালয় আসতে পারলেই হয়। তাছাড়া বিপদ আপদ হলেই বা কি করা যাবে। স্ত্রীলোকের এত ঔদ্ধত্যের পরিণাম ভাল হয় না। এখন ঠাকুর ভরসা। দেবর ঈশান এবং সুহৃদ দীননাথের বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করে,বিবাহিতা মেয়েদের না জানিয়ে, পূণ্যলোভাতুর হৈমবতী বালিকা কন্যা নবদুর্গাকে নিয়ে যাত্রা করলেন তীর্থের উদ্দেশ্য। সঙ্গী জামাই উল্লাস আর দুই কর্মচারী হরিচরণ ও কানাই। হৈম গাঁয়ের মেয়ে। মাঝে মধ্যে একগ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়া ছাড়া জীবনে তাঁর কোথাও যাওয়া হয়নি। পথের সৌন্দর্য, গাড়ীঘোড়া শহর, নদী দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাদের প্রথম গন্তব্য স্থল ছিল গয়াধাম। কারণ গয়াতে স্বামীর পিণ্ডদানই এইযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য। দীর্ঘপথে কোনরূপ বিঘ্ন হল না। শাশুড়ী এবং শ্যালিকার যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয়, এজন্য উল্লাস খুবই সর্তক ছিল। গয়াতে তারা একটি যাত্রীনিবাসে আশ্রয় নিলেন ও হৈমবতী বিধিমত নিষ্ঠাসহকারে স্বামীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। উল্লাসেব সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনায় ক্রিয়াকর্ম খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হল। স্বামীগতপ্রাণা হৈম মৃত স্বামীব জন্য এটুকু কর্তব্য করতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। শ্রাদ্ধক্রিয়া সেরে উল্লাস গয়ার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি শাশুড়ীকে দেখিয়ে আনল। যাত্রীনিবাসে কত জায়গার কত লোকের সঙ্গে হৈমর আলাপ হল, কত কিছু দেখা হল। নির্বিঘ্নে রাজচন্দ্রের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হল, ব্রাহ্মণ ও দবিদ্রকে সাধ্যমত দানও করা হল। সব কিছু মিলিয়ে হৈম এতটাই অভিভূত হলেন যে তাব আর দেশেব কথা মনেও রইল না। তাছাড়া আশ্চর্যেব ব্যাপাব যে নবদুর্গাও অপরিচিত পরিবেশে এসে কোনরকম গোলমাল বাধিয়ে তুলছে না। বরং বাড়ীর চেয়ে সে এখানে আনন্দেই আছে। অবশ্য তাব পিছনে কারণও আছে একটা। উল্লাস তার দাবী আবদার সব মিটিয়ে যাচ্ছে। এটা সেটা খাবার . নানান খেলনা, যখন যা নব চাইছে , উল্লাস তাই কিনে দিচ্ছে ফলে নবরও আনন্দের সীমা নেই। মা মেয়ে দু'জনেই আনন্দে মাতোয়ারা। গয়ার কাজ সম্পন্ন করে উল্লাস শাশুড়ী-শ্যালিকাকে নিয়ে ত্রিবেনী -সঙ্গমে রওনা হল। উল্লাস বাড়ী থেকেই শাশুড়ীব সঙ্গে আলোচনা কবে ভ্রমণের ছক কেটে এসেছে। এতবড় সংসার ফেলে শাশুড়ীমার পক্ষেতো আর বেশী ঘোরাঘুরি সম্ভব নয়।গয়ার পরে তারা যাবে ত্রিবেনী সঙ্গমে তারপর কাশী ও কালীঘাট। সবশেষে কামরূপ কামাখ্যা

দর্শন করবে। এই পঞ্চতীর্থ সেরেই তারা দেশে ফিরবে। এই ছক অনুযায়ী উল্লাস সবাইকে নিয়ে ত্রিবেনীতীর্থে পৌঁছল এবং এখানেও তারা যাত্রীনিবাসেই আশ্রয় নিল। ত্রিবেনীতে মাথা মুড়িয়ে হৈম গঙ্গা-যমুনা-সরাবতীর সঙ্গমে পুণ্যস্নান করলেন। ত্রিবেনীতে মাথা মুড়িয়ে সঙ্গমে স্নান করলে সব পাপ দূরে যায়। হৈম নিজের বাবার মুখে বহুবাব শুনেছেন একথা। বাবা প্রায় সময়েই বলতেন, "প্রযাগে মুড়াইয়া মাথা, যারে পাপী যথা তথা।" হৈমর বাবাও ভাগ্যগুণে অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন। বাবার মুখে সেই সব তীর্থের বর্ননা তিনি বহুবার শুনেছেন। তৎকালীন যুগে পুরুষরা মাঝে মধ্যে ধর্মকর্ম করার জন্য তীর্থে যেতেন বটে, তবে মেয়েদের ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটত না। কিন্তু হৈম ভাগ্যবতী। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলেই প্রয়াগে মাথা মুড়িয়ে তিনি সর্বপাপমুক্ত হতে পেরেছেন। জামাই উল্লাসের জন্যই তার জীবনে এই পণ্যসঞ্চয় করা সম্ভব হল। তাই তার মন উল্লাসের প্রতি বড়ই প্রসন্ন।

প্রয়াগে দিন তিনেক থেকে যা কিছু দেখার ছিল সব দেখেশুনে তারা বিশ্বনাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে কাশী রওনা হলেন। কাশীতে উল্লাস থাকার ব্যাপারে আরও সুবন্দোবস্ত করল। এখানে তারা যাত্রীনিবাসে আশ্রয় না নিয়ে একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করল। কাশী প্রাচীন হিন্দুতীর্থ। এখানে অনেককিছু দেখার আছে। তাছাড়া কাশীবাসে অনেক পুণ্য হয়। কাশীবাস আর স্বর্গবাস প্রায় সমান কথা। তাই উল্লাস স্থির করেছে যে শাশুড়ীমাকে কিছুদিন কাশীতে বাস করিয়ে ধীরে সুস্থে সব কিছু দেখিয়ে শুনিয়ে নেবে। কারণ এতদূর থেকে আরেকবার আসাতো আর সম্ভব হবে না। উল্লাসের সব ব্যবস্থাই পাকা। তার বিবেচনা ও ব্যবস্থাপনা দেখে হৈমবতী একেবারে মুগ্ধ।

উল্লাসের উপর হৈমর আস্থা দিন দিন বাড়ছে। অথচ এমন কর্তব্যশীল ও করিতকর্মা উল্লাসের প্রতি ঈশানের কত সন্দেহ, গঙ্গার কত অবিশ্বাস। শুধু ঈশান বা গঙ্গা কেন? বেশ কিছুদিন আগে তিনি নিজেই কি উল্লাসকে ভালচোখে দেখেছেন? আসলে মানুষের সঙ্গে নৈকট্য সৃষ্টি না হলে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। উল্লাসকে এতদিন তিনি নিজেই ভুল বুঝে এসেছেন।

কাশীতে এসে প্রথমেই দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নান করে বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে বিশ্বনাথ দর্শন করা হল এবং যথাবিধি পূজা দেওযা হল। বিশ্বনাথের মন্দির সংলগ্ন আরও যত মন্দির ছিল সে সবও দর্শন হল। হৈম মন্দিরের ব্রাহ্মণদের

যথাসাধ্য দক্ষিণা দিলেন, ভিখারীদের পয়সা দিলেন। দানে হৈম মুক্ত হস্ত।

কাশীতে হৈমদের জীবনযাত্রা মন্থর গতিতে চলছে। কিছুদিন থাকা হবে বলে কোন তাড়াহুড়ো নেই। রোজ ভোরে গঙ্গাস্নান সেরে বিশ্বনাথ দর্শন করে তারা টাঙ্গা ভাড়া করে কাশীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখার জন্য বেরিয়ে পড়েন। তারপর বাসাবাড়ীতে ফিরে রান্নাখাওয়া সেরে সবাই বিশ্রাম করেন। রোজসন্ধ্যায় পাঠককীর্তন শোনার জন্য নবসহ শাশুড়ীকে নিয়ে উল্লাস দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে বসে। হৈম জীবনে এমন পাঠকীর্তন শোনেননি। তার হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত হয়। পুন্যতোয়া গঙ্গার বিশাল বিস্তার তাকে অবাক করে। গঙ্গার বুকে নেমে আসা আকাশের চাঁদের খেলা, তারার মেলা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। বাসাবাড়ীতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। নব ঘুমিয়ে পড়ে। উল্লাস খুব যত্নের সঙ্গে ঘুমন্ত নবকে কোলে করে, শাশুড়ীকে নিয়ে বাসাবাড়ীতে ফিরে আসে। কাশীব জীবনযাত্রার এই হল দৈনন্দিন রুটিন।

এভাবেই কাশীতে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। পবর্বর্তী গন্তব্য সম্বন্ধে উল্লাসের যেন কোন গরজ দেখা যাচ্ছে না। হৈমর আর ভালো লাগছে না। পুণ্যের ঘোর কাটিয়ে তার মন বাস্তবের ঘাটিতে নেমে এসেছে। আর কোথাও যাওয়ার ইচ্ছেও তার চলে গেছে। বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার জন্য তার মন খুব উতলা হয়ে উঠেছে। তার অনুপস্থিতিতে বাড়ীঘরের কি হাল হয়েছে, গঙ্গা-গুণই বা কেমন আছে? বিশেষ করে অভয়ের শারীরিক অবস্থাই বা এখন কেমন? ইত্যাদি চিন্তায় হৈমর মন বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠছে। তাছাড়া আর এক মুস্কিল হয়েছে যে কাশীতে এসে নবর মেজাজ বড়ই বিগড়ে গেছে। কোন খাবাব জিনিষ, খেলার জিনিষ দিয়ে তাকে শান্ত করা যাচ্ছে না। সব কিছুই সে ছুড়ে ফেলে দেয়। সবসময় কান্নাকাটি আর বাড়ী যাওয়ার বায়না। তাই আর অন্য কোথাও না যেয়ে হৈম উল্লাসকে বাড়ী ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বললেন। কিন্তু উল্লাস হৈমর কথায় কোন পাত্তা দিল না। এতে হৈম মনে মনে অসম্ভব বিরক্ত হলেন।

এটা ওটা অজুহাত দিয়ে তিনচারদিন ধরে উল্লাস হৈমকে নিয়ে পাঠকীর্তন শুনাতে দশাশ্বমেধঘাটেও নিয়ে যায় না। শাশুড়ী-শ্যালিকার দেখভাল করাটা কমে গেছে। হরিচরণ কানাইয়েরও একটা ছাড়াছাড়া ভাব। আর তিনজন মিলে প্রায়সময়েই কি যেন একটা শলা-পরামর্শ করে। ব্যাপারটা হৈমর কাছে খুব ভাল ঠেকে না। দেবর ঈশানের সাবধানবানী মনে পড়ে যায়, মনে কেমন একটা সন্দেহ

জাগে। এখন ভালয় ভালয় ফিরতে পারলে হয়। আর একদিনও এদের উপর নির্ভর করে বিদেশে পড়ে থাকা উচিত নয়। বাড়ী ফেরার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং উল্লাসকে ডেকে বললেন,"এখানে আর থাকারতো কোন দরকার নেই। শুধু শুধু সময় নষ্ট আর টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে। আর কোথাও আমি যাব না। তুমি কালই বাড়ী ফেরার সব ব্যবস্থা করে ফেল। বাড়ীর জন্য আমার খুব চিন্তা হচ্ছে।" উল্লাস ভাবল তার দুরভিসন্ধি প্রকাশ করার সুযোগ এবার এসেছে। তাই কোনরূপ ভূমিকা না করে সে বলল," বাড়ী যাওয়ার দরকারতো ঠিকই মা। তবে বাড়ী যাওয়ার আগে আপনাকে একটা কাজ করে যেতে হবে। নবকে আমি বিয়ে করতে চাই এবং এই বিয়েটা আপনাকে এই কাশীতেই সেরে যেতে হবে।"

উল্লাসের প্রস্তাব শুনে হৈমর মাথায় যেন বাজ পড়ল,তার পায়ের তলার মাটি সরে গেল। কি ভীষণ কুমতলব মনে পোষণ করে সে এতদিন ধরে ভাল মানুষের অভিনয় করে চলেছে। সেদিন যদি তিনি ঈশানের কথা শুনতেন, তবে আজ এই ঘোর ষড়যন্ত্রের জালে বন্দী হতেন না,ঈশান যতবড় শত্রুই হউক না কেন তবু আত্মজন। ক্রোধে দুঃখে হৈমর ভেতরটা চৌচির হয়ে যাচ্ছে, তবু যথাসম্ভব কণ্ঠ সংযত করে বললেন, " কি সব পাগলের মত কথাবার্তা বলছ তুমি। নব তোমার মেয়ের বয়সী, তাছাড়া নব যে বাগ্‌দত্তা তাও তোমার অজানা নেই। বয়সতো তোমার প্রায় চল্লিশের কোঠায় পৌঁছেছে। এই বয়সে অমন একটা বাজে প্রস্তাব করতে তোমার মুখে যে আটকালোনা তাতে আমি ভীষণ অবাক হচ্ছি। আর দ্বিতীয়বার এমন কথা উচ্চারণ করনা। আর কালই বাড়ী ফেরার ব্যবস্থা কর। এই আমার শেষ কথা। আর আমার খেয়ে পরে আমার এমন অনিষ্টচিন্তা করলে তা বাবা বিশ্বনাথের গায়ে যে সইবে না তাও জেনে রাখ।" উল্লাস কুটিল হাসি হেসে বলল, "আপনার শেষ কথাতো আমার শেষ কথা নয়। আমি যা বলছি বা যা করতে চাইছি সেটা আমারও শেষ কথা। আমার সঙ্গে নবর বিয়ে আপনাকে দিতেই হবে। আপনি যে বাগ্‌দানের কথা বললেন সেটাতো একদম বাজে অজুহাত বিয়ের পিঁড়িতে বসলেও বিয়ে ভেঙ্গে যায়। অমন বাগ্‌দানতো কোনছার ? । আর বয়সের কথা যা বলেছেন তারও কোন যুক্তি নেই। পুরুষরা যে কোন বয়সে যে কোন বয়সের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। পাত্রী হিসাবে আপনার নব যে আমার খুব পছন্দের তা ভাববেন না। আসল কথা আপনাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করবেন বলেই আপনারা আমাকে ঘরজামাই করে ঘরে তুলেছিলেন।

কিন্তু ভাগ্যদোষে আপনার মেয়ে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল। ফলে আমি আমার ন্যায্যপ্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হলাম। কিন্তু এই বঞ্চনা আমি মেনে নেব না। সম্পত্তির উওরাধিকারী মূলতঃ জ্যেষ্ঠ কন্যার সন্তান তারপরে কনিষ্ঠকন্যার সন্তান। নীলের পরে তাই এ সম্পত্তিতে নবর সন্তানেরই অধিকার। তাই নবকে বিয়ে করে আমি আমার অধিকার বজায় রাখতে চাই। উড়ে এসে জুড়ে বসে গঙ্গার ছেলে শ্বশুরের সম্পত্তির মালিক হবে, তা আমি কিছুতেই হতে দেব না। নবকে বিয়ে করলেই আমার অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। আপনি ন্যায্য প্রাপ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে চাইছেন বটে, তবে সে সুযোগ আমি আপনাকে দেব না। তাই নবর সঙ্গে আমার বিয়ে অবশ্য দিতে হবে। দেশে কোনক্রমেই আমার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাবে না বলেই যে নবসহ আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি এখন তা ভালই বুঝতে পারছেন। আর জেনে রাখুন বিশ্বনাথের ভয় দেখিয়ে আমাকে নিরস্ত করতে পারবেন না। আমি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবই।"

হৈমবতী নিজের বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন। বিদেশবিভূঁয়ে তিনি শয়তান উল্লাসের কব্জায়। আত্মরক্ষার শেষচেষ্টায় তিনি কৌশল অবলম্বন করে, খুব শান্তভাবে বললেন," তোমার কথা আমি মেনে নিলাম ,তোমার সঙ্গেই নবর বিয়ে দেব। তবে এখানে নয়। বাড়ীতে ফিরে চল। বাড়ী পৌছেঁই আমি বিয়ের ব্যবস্থা করব। এখানে বিয়ে দেওয়ার মত টাকাপয়সা কোথায়? নবতো আর ভিখারীর মেয়ে নয় যে যেমন তেমন করে ওর বিয়ে হবে। আর সম্পত্তির কথা যা বলছ, তা ন্যায্য কথাই। দেশে ফিরে আমি তোমার সব কথামতই কাজ করব। কথা দিচ্ছি।"

উল্লাস তার স্বভাবসিদ্ধ কুটিল হাসিটি আবার মুখে ফুটিয়ে তুলে বলল। "আপনি আমাকে বোকা ঠাওরালেও আমি মোটেই বোকা নই। দেশে ফিরে গিয়ে আপনি বিয়েতো দেবেনই না। আরও কি কি করবেন তা আমি ভালই বুঝি। এ শুধু আপনার কোনরকমে দেশে ফিরে যাওয়ার ফন্দী। তবে আমিও স্পষ্ট করেই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে বিয়ে না দিয়ে আপনি দেশে ফিরতে পারবেন না। আপনি হয়ত ভাবছেন হরিচবণ কানাইকে নিয়ে আপনি কোনরকমে ফিরে যাবেন। কিন্তু তাও হবার নয়। হরিচরণ কানাই আপনার বেতনভুক্ কর্মচারী বটে। তবে আমার লোক। আপনার কথায় ওরা একপাও নড়বে না। জেনে রাখুন উল্লাস কখনও কাঁচা কাজ করে না। তাই বলছি ভালয় ভালয় এখানেই বিয়েটা দিয়ে

দিন। নইলে পরিণতি কি হতে পারে তাও জানিয়ে রাখছি। আপনি অবশ্য জানেন না, এই কাশীতে কত কিছুই হয়। এখানে পুণ্য এবং পাপ হাত ধরাধরি করে চলে। তাই দেখবেন আপনার সুন্দরী মেয়ে হঠাৎ চড়াদামে বিকিয়ে গেছে। আপনি টেরও পাবেন না আর আপনাকেও কোন ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। আপনার আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকবে না। দেশে ফিরে গিয়ে বলব,কলেরায় আপনারা মা, মেয়ে মারা গেছেন। তীর্থে এমন হয়েই থাকে। কেউ অবিশ্বাস করবে না। ভেবে দেখুন, কে এখানে সত্য -মিথ্যা যাচাই করতে আসবে? ক্যাবলা কোটিশ্বর না যক্ষারোগী অভয়? আর জ্ঞাতিদের সঙ্গে আপনার যে সম্পর্ক তাতে আপনি তাদের কাছে কি আশা করতে পারেন? আর বুড়ো দীনু চক্কত্তিকেতো আমি মানুষ বলেই গণ্য করি না। কথামত কাজ করলে সারাজীবন আমি আপনার দাসানুদাস হয়ে থাকব। আমার যা বলার সব সাফ সাফ বলে দিলাম। এখন আপনি কি করবেন ঠিক করে ফেলুন।" একথা বলে উল্লাস আর তিষ্ঠাল না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ষড়যন্ত্রের সীমা কতদূর পর্যন্ত তা বুঝতে পেরে হৈমর অন্তরাত্মা থরথর করে কাঁপতে লাগল। তার নিজের যা হবার হবে। নিজের হঠকারিতার ফলতো তাকে পেতেই হবে। কিন্তু নব? সেতো কোন দোষ করেনি। সে কেন এই ঘোর চক্রান্তের শিকার হতে চলেছে? হায় বিশ্বনাথ ! এই ছিল তোমার মনে? হৈম বালিকা নবর প্রাণ মান বাঁচানোর কোন উপায় দেখছেন না। উল্লাসের লোভ ও কুটিলতাতো তার একেবারে অজানা ছিল না। তবু কেন তিনি এতবড় ভুল করে বসলেন? ঈশানের দীননাথের বাধা নিষেধ কেন মানলেন না? সামান্য স্ত্রীলোক হয়ে দু'জন বিচক্ষণ পুরুষের বুদ্ধিবিবেচনাকে তিনি পায়ে ঠেলেছেন বলেই আজ তাকে এই ভীষণ পরিস্থিতির সন্মুখীন হতে হয়েছে। হৈমর চোখ দিয়ে দরদর ধারায় জল পড়তে লাগল। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি প্রাণপণে ঠাকুরদেবতাকে ডাকতে লাগলেন।

কিন্তু কোন দেবতার কানেই হৈমর ডাক পৌছল না। ভাগ্য বিরূপ হলে হাজার ডাকলেও সে ডাক দেবতার দরবারে পৌছায় না। নবর প্রাণমান বাঁচানোর কথা চিন্তা করে হৈম উল্লাসের সঙ্গে নবর বিয়ে দিতে বাধ্য হলেন মায়ের অবিমৃশ্যকারিতার ফলে নবর ভবিষ্যৎ যে চিরঅন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল, অবোধ বালিকা তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারল না।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরে কালবিলম্ব না করে উল্লাস নববিবাহিতা পত্নী, শাশুড়ী ঠাকুরুন আর কানাই ,হরিচরণ এই দুই কর্মচারীসহ দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। রাস্তায় সারাক্ষণ হৈমবতী নীরব-নিথর হয়ে বসে রইলেন এবং এই বিয়ের পর থেকে এ পর্যন্ত তিনি জলটুকুও গ্রহণ করেন নি। উল্লাসও তাকে তোষামোদ করার তেমন সাহস পেল না। যতটা উৎসাহ উদ্যম নিয়ে সে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেছে,কার্যসিদ্ধির পরে সে উৎসাহ উদ্যম যেন খানিকটা দমে গেছে। দেশে ফেরার পর কি জানি কি হয়, এই একটা ভয় তাকে পেয়ে বসেছে। আর একটা অনুশোচনার জ্বালাও তার মনকে পীড়ত করছে। একটা নিস্পাপ বালিকার জীবন সে নষ্ট করে দিল শুধু সম্পত্তির লোভে । এখন তার মনে হচ্ছে ,ঘটনাটা না ঘটালেই ভাল হত। আর দেশে গেলে পরিস্থিতিটা যে খুব সুখকর হবে না, ঝোঁকের বশে সেটা তেমন করে তার মাথায় আসেনি। তাই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেও সে স্বস্তিতে নেই।

হরিচরণ কানাই এর মনেও শান্তি নেই। কাশীতে যিনি এক অসহায় স্ত্রীলোক ,দেশের বাড়ীতে তিনিই কর্ত্রীঠাকুরুণ। আর তারা তাঁরই বেতনভুক ভৃত্য। কিছু টাকার লোভে তারা যে একটু আড়ালে থেকে উল্লাস ঠাকুরকে মদত দিয়েছে, তাকি আর ঠাকুরুণ টের পাননি ! দেশে গিয়ে যদি তাদের ছাড়িয়ে দেন, তবে অমন সুখের চাকুরীটা যাবে। সামান্য কয়টা টাকার লোভে এই অন্যায় কাজে উল্লাস ঠাকুরকে এতটা মদত দেওয়া তাদের উচিত হয়নি। এসব চিন্তায় তাদেরও মন ভারী হয়ে আছে। দেশে ফিরে কপালে কি শাস্তি মিলবে কে জানে! কর্ত্রীঠাকুরুণ কি এমনিতেই ছেড়ে দেবেন ?

যাত্রীদলের মধ্যে একমাত্র নবদুর্গাই খুশীতে ঝলমঝ করছে। হাতে শাঁখা, মাথায় কপালে সিঁদূর পরণে লাল চেলী-এই সাজ নবর খুবই পছন্দ হয়েছে। হৈম আসার সময় লাল চেলি বাদ দিয়ে অন্য কাপড় পরাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঐ বিয়ের চেলি ছাড়া নব অন্য শাড়ী কিছুতেই পরবে না। হৈ চৈ চীৎকার চেঁচামেচি করে রীতিমত কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে। অগত্যা তাকে ঐ চেলিই পরিয়ে দিতে হয়েছে। নবর ইচ্ছা বাড়ী গিয়েই সখীদের ঐ সাজ দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে। কাজেই নব খুব আনন্দেই আছে।

উল্লাসের চিত্তদৌর্বল্য বড়ই তাৎক্ষণিক। কিছুক্ষণ পরেই তার মন যথাস্থানে ফিরে গেল। সে অন্যায় কিছু করেনি। প্রাপ্য আদায়ের জন্য এটা করা ছাড়া তার অন্য উপায় ছিল না। আর এ ব্যাপারে মনে কোন শংকা রাখারও কোন কারণ

নেই। হিন্দুর মেয়ের একবার বিয়ে হয়ে গেলে তা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন গত্যান্তর থাকে না। কাজেই সে যা করেছে তার জন্যএকটু আধটু ঝামেলার সন্মুখীন হলেও চিন্তার কোন কারণ নেই। আর শাশুড়ী ঠাকুরুনের এই রাগ গোঁসায় ও পাত্তা দেওয়া প্রয়োজন নেই। মেয়ের স্বার্থে ভবিষ্যতে শাশুড়ীই তাকে তোয়াজ করে চলবেন। কিন্তু জগতে ব্যতিক্রমী-ঘটনাও যে মাঝে মাঝে ঘটে যায়, সে বোধ উল্লাসের নেই। সে ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি।

বাড়ীতে কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ একদিন তীর্থযাত্রী দলটি স্বগ্রামে পৌঁছে গেল। সীমন্তিনী নবকে দেখে গ্রামের লোকেরা একেবারে অবাক। নবতো দীনু চক্কোত্তির ছেলে বিষ্ণুর বাগ্‌দত্তা। বিয়ের বয়স হলেই ওদের বিয়ে হবে। বাগ্‌দত্তা মেয়েকে বিদেশে কার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন হৈমবতী?

নবদুর্গার বিয়ের খবরটা ঈশানের কানে যেতে মোটেই দেরী হল না। অঘটন একটা হয়েছে বুঝতে পেরে সব শত্রুতা ভুলে ঈশান ও তার পরিবারের সবাই একে একে জুটে গিয়েছিল হৈমবতীর ঘরে। স্তব্ধ বিষণ্ণ হৈম বসে আছেন ঘরের মেঝেতে। আর মালপত্র গোছগাছ করছে উল্লাস, হরিচরণ ও কানাই। এটুকু সময়ের মধ্যে গ্রামের আরও অনেকেই এসে পড়েছে। সবাই উদগ্রীব নবর বিয়ের খবর শোনার জন্য। ঈশানই প্রথম এই খবর শোনার জন্য হৈমর মুখামুখি হলেন। কঠোর কঠিন কণ্ঠে ভ্রাতৃবধূকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "কারোর মতামত না নিয়ে বিদেশ বিভূঁয়ে কার সঙ্গে তুমি নবর বিয়ে দিলে?" হৈম নিরুত্তর । হৈমকে নিরুত্তর দেখে ঈশান আরও রেগে গেলেন। বললেন "ভড়ং ধরে চুপ করে না থেকে আসল ঘটনা খুলে বল। তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা মিত্রতা যাই থাক না কেন, কিন্তু নব আমার ভাইঝি। তার জীবন নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলবে তা আমি সহ্য করব না। কাজেই ঘটনা কি তাড়াতাড়ি বলে ফেল। দাদার অবর্তমানে তোমার স্পর্ধা যে এতটা বেড়ে যাবে তা-ভাবতেই পারিনি।"

এবার আর হৈম চুপ করে থাকতে পারলেন না। ঈশানের হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন," আমাকে তুমি মেরে ফেল ঠাকুরপো, তোমার কথা না শুনে আমি তীর্থে গিয়ে নবর সর্বনাশ করে এসেছি। আমাকে মেরে ফেললেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।" ভ্রাতৃবধূর কান্না দেখে ঈশানের মোটেই মায়া হল না বরং রাগ সপ্তমে চড়ে গেল। ধমকে উঠে ঈশান বললেন," তোমার নাকী কান্না শুনতে চাই না আমি। ঘটনা কি তাই বল। ধমক খেয়ে কিছুটা ধাতস্থ

হয়ে হৈমবতী আনুপূর্বিক ঘটনা বলে গেলেন। সব শুনে রাগে দুঃখে অপমানে ঈশান ও তার যুবক ছেলেদের পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেল। উপস্থিত লোকেদের ধিক্কারে ছি ছি তে ঘরে একটা হট্টগোল অবস্থার সৃষ্টি হল। কিন্তু যাকে নিয়ে এত গোলমাল সে কিন্তু কিছুই বুঝল না। কতক্ষণে সে তার সাথীদের সঙ্গে দেখা করে তার এই নূতন সাজ দেখাবে তার জন্য সে ছটফট করতে লাগল। কিন্তু কাকী তাকে কোলে চেপে রাখায় সে কিছুতেই বেরোতে পারছিল না। বড়মানুষগুলো খামকা এত গণ্ডগোল বাধায় কেন এটা সে ভেবে পাচ্ছিল না। মনে মনে সে বড়ই বিরক্ত বোধ করছিল।

পরিস্থিতি দেখে কানাই হরিচরণের কণ্ঠতালুর জল শুকিয়ে গেছে। উল্লাসও একেবারে চুপসে গেছে। পরিস্থিতি যে এতটা প্রতিকূল হতে পারে তা তাদের মাথায় আসেনি। শত্রু ঈশান যে সপরিবারে মিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, তা কল্পনার অতীত ছিল। ঈশানের মদতে গ্রামের অন্যলোকেরাও পরিস্থিতি ঘোরালো করে তুলেছে। এখন পর্যন্ত যা হবার তাতো হয়েছে, আবও কি হতে পারে কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। কাজেই এই পরিস্থিতিতে আপাততঃ সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু সরে পড়ার কোন উপায় যে নেই। ঈশানের দশাসই চেহারাব মেজছেলে গজা অর্থাৎ গজেন্দ্রকুমার দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এই গজাকে সবাই ভয় করে। তার আবার ভজা নামে এক নমশূদ্র আর লতিফ নামে এক মুসলমান চেলা আছে। তারা না করতে পারে হেন কাজ নেই। তাই ভয়ে ভাবনায় তিন অপরাধীবই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হয়েছে।

গজা সম্পর্কে তাদের ধাবণা অমূলক নয়। একটু পরেই গজার হুঁংকার শোনা গেল। "এই ভজা ,এ তিনটেকে ধরে পিছনের জামতলায় নিয়ে যা। উত্তম মধ্যম কাকে বলে শিখিয়ে দেব।"আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই ভজা কর্তব্যপালনে তৎপর হয়ে উঠল হরিচরণ কানাই উল্লাস এই তিনজনকেই টেনে হিঁচড়ে জামতলায় নিয়ে গেল। কার্যকারণে আজ লতিফ অনুপস্থিত, তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না। কুচকুচে কাল লোহার মত শক্তপোক্ত চেহারার ভজা একাই একশ। গজাবাবুর নির্দেশে উল্লাসকে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে কানাই হরিচরণকে জাম গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। আর মূর্তিমান যমের মত উল্লাসের সামনে দাঁড়িযে রইল স্বয়ং গজাবাবু। তারপর গজাবাবুর নির্দেশেই শুরু হল উত্তম মধ্যম দেওয়ার পালা , কানাই হরিচরণ আর্তস্বরে বলতে লাগল, "আমাদের দয়া করে ছেড়ে দিন বাবু!

আমরা কোন দোষ করিনি, সব অনাসৃষ্টির মূলে আছে ঐ বিটলে বামুনটা। ওর জন্যই আজ আমাদের এই দুর্গতি। আপনার পায়ে পড়ি বাবু, আমাদের ছেড়ে দিন। ''কিন্তু এসব কান্নাকাটিতে কোন ফল হল না মারের চোটে যখন অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার অবস্থা তখন মার বন্ধ করে দড়ির বাঁধন খুলে দেওয়া হল। তারপর তারা একটু সুস্থ বোধ করার পর নাপিত ডেকে গজা তাদের মাথা কামিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ীর বার করে দিল। উল্লাস চোখের সামনে কানাই হরিচরণের এই দুর্দশা দেখল এবং তার ভাগ্যে কি ঘটবে ভেবে তার ভিতরটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। তবে তার ভাগ্য ভাল। নেহাৎ বাড়ীর জামাই বলে গজা তার উপর হাত তুলল না। কিন্তু তারও মাথা মুড়িয়ে দিল এবং বলল, ''দেখলেতো ওদের পাওনাগণ্ডা নগদে মিটিয়ে দিলাম। আর তুমিতো ঘরজামাই , ঘরেই থাকবে, তাই ধীরে সুস্থে তোমার পাওনা মিটিয়ে দেওয়া যাবে। আর আমার কথার যদি একচুল এদিক ওদিক কর তবে তোমার রক্ষে নেই।''

গজার নির্দেশে কানাই হরিচরণের চাকরী গেল। উল্লাস বর্হিবাটীর একটি কুড়েঘরে নির্বাসিত হল। ভিতরবাড়ীতে প্রবেশের ও নবর সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের তার কোন অধিকার রইল না। সে যাতে পালাতে না পারে সেজন্য নজরদারীর জন্য ভজাকে নিয়োগ করা হল। যেহেতু নবর সঙ্গে তার গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে তাই তাকে কোন মতেই হাতছাড়া করা যায় না। এভাবেই গজেন্দ্র অপরাধীদের বিচারপর্ব সমাধা করল। এসব ব্যাপারে হৈমবতীর কোন কথা বলার এক্তিয়ার রইল না।

মায়ের আগমন বার্তা ও সমস্ত কীর্তিকলাপের খবর যথাসময়ে পৌছে গেল গঙ্গা-গুণর কাছে, খবর পেয়েই ছুটে এল গঙ্গা কোটিশ্বর , এল গুণমণি। অসুস্থ অভয় আসতে পারল না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে হায় হায় করা ছাড়া তার আর কিছুই করার ছিল না।

গঙ্গা বরাবরই কথা কম বলে, উল্লাস সম্বন্ধে সে কোন মন্তব্য করল না। শুধু মাকে বলল,''কাউকে না বলে কয়ে তীর্থে গিয়ে অনেক পুণ্যি সঞ্চয় করে এলে মা। যদিও তোমাকে কিছু বলার প্রবৃত্তি নেই আমার তবু বলছি, এভাবে নবর জীবনটা নষ্ট না করে যদি গঙ্গার জলে ওকে ভাসিয়ে দিতে, তবে তোমার পূণ্য আরও অনেক বেশী হত। তোমার মত মা পাওয়া সত্যিই খুব ভাগ্য'' মেয়ের এই শ্লেষবাক্যে হৈমর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। এমনিতেই তার পরিতাপের অন্ত

নেই। তারপর ধিক্কারে ধিক্কারে তার ভিতরটা চৌচির হয়ে যাচ্ছে। নীরবে চোখের জল ফেলা ছাড়া তার বলার মত কিছুই নেই। গুণ কিন্তু গঙ্গার মত নয়। মাকে বেকায়দায় ফেলে যে এই সর্বনাশ করেছে সে তাকে নিয়ে পড়ল। উল্লাসকে যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল করল, নীলমণিকে সেই বাণ মেরেছে এরকম সন্দেহও প্রকাশ করল।গুণর কথার প্রতিবাদ করার মত সাহস বা সুযোগ কোনটাই উল্লাসের ছিল না। সে নতমস্তকে গুণর বাক্যবান সহ্য করতে লাগল। অনর্গল গালাগাল করে ক্রুদ্ধ গুণ শেষ পর্যন্ত উল্লাসের উদ্দশ্যে থু থু ছিটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

কোটিশ্বর বড়ই নরম মনের মানুষ। গালমন্দ সে মোটেই করতে পারে না। তাই নীরবে নবকে নিজের কোলে নিয়ে স্ত্রীলোকের ন্যায় রোদন করল। দিদিদের বকাঝকা আর জামাইবাবু ও মায়ের কান্নাকাটি দেখে নব বড়ই হতভম্ব হয়ে গেল। কি যে হয়েছে কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছে না। সমস্ত গোলমালের হেতু যে সে নিজে তা তার বোঝার কথা নয়। কিন্তু পরিস্থিতি দেখে সে খুব ঘাবড়ে গিয়ে একসময় জামাইবাবুর কোলেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সময়ে সবকিছুই থিতিয়ে যায়। নবদুর্গার বিয়ের ব্যাপারটাও ধীরে ধীরে মেনে নেওয়া হল। হৈমর সংসারযাত্রাও স্বাভাবিক ভাবেই চলতে লাগল। শুধু উল্লাসের অবস্থানের কোন পরিবর্তন হল না। তেমনি বর্হিবাটীর চালাঘরে সে নির্বাসিত। ভজার নজরদারী এখন যদিও অনেকটা শিথিল তবু উল্লাস পালাতে বা ভিতরবাড়ীতে আসার চেষ্টা করে না। তবে নবকে দেখতে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সে ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যায়। দৈবাৎ কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে এলেও সে আমল দেয় না। একা চুপচাপ দিন কাটায়,শ্বশুরেব সম্পত্তির প্রতি এখন তার বিন্দুমাত্র মোহ নেই। নিজের কৃতকর্মের জন্য সে বড়ই অনুতপ্ত। কিন্তু যা করে ফেলেছে তাতো আর ফিরানো যায় না। নিজের জন্য সে এখন আর কিছুই ভাবে না। কিন্তু নবর জন্য তার বড় দুঃখ হয়। তার প্রচণ্ড বিত্তলালসা চরির্তাথ করার জন্য সে দুটি জীবনই নষ্ট করে দিল। বিষ্ণুর সঙ্গে নবর বিয়ে হলে ওরা কত সুখী হত। কিন্তু সে তা হতে দিল না। এজন্য আত্মধিক্কারে তার মন ক্ষতবিক্ষত। তার এই মনোভাব বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। কারণ মানুষের বিশ্বাস সে চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে। বিয়ে করলেও নবাকে আজ পর্যন্ত একবারও তার স্ত্রী বলে মনে হয়নি। নব আজও তার অন্তরে একান্ত স্নেহের শ্যালিকারূপেই

প্রতিষ্ঠিত, নীলই তার স্ত্রী। নীলের জন্য তার মন নিরন্তর হাহাকার করে। মন চায় নীলের কাছে চলে যেতে। কিছুই তার ভাল লাগে না। মৃত্যুই এখন তার সবচেয়ে কাম্য বলে মনে হয়। তবে যাবার আগে বড় ইচ্ছে হয় একবার হৈমবতীর পায়ের ধূলো মাথায় মেখে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে। কিন্তু সে জানে তার এ ইচ্ছে পূরণ হবার নয়। কারণ হৈমবতীর চরণস্পর্শ করার সুযোগ এ জীবনে আসবে না। এসব ভাবনা চিন্তা নিয়ে উদাস উল্লাস দিনের পর দিন কাটায়। তার মানসিক এই পরিবর্তনের খবর কেউ রাখে না।

নবদূর্গা আছে খুবই আনন্দে। সারাদিন সে খেলাধূলায় মেতে থাকে। বিশেষ করে পুতুল খেলাটা তার বড়ই প্রিয়। রকমারী পুতুল তার পুতুলের বাক্সে। তবুও একটা পুতুলের জন্য তাব বড় দুঃখ। কাশী থেকে হৈম ধাতুনির্মিত একটি শ্যামসুন্দরের মূর্তি এনেছেন। আসনে বসিয়ে ঐ মূর্তির পূজা করেন তিনি। ঐমূর্তিটি পুতুল হিসাবে নবর বড় পছন্দ। কিন্তু অনেকবার বায়না ধরেও পুতুলটি সে মায়ের কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি। চরি করে নিতে খুবই ইচ্ছে হয়, কিন্তু সাহস হয় না। পুতুলটির লোভে নব প্রায়ই আসনের কাছে চুপটি করে বসে থাকে। এই পুতুলটি না পাওয়ার দুঃখ ছাড়া নবর অন্য কোন দুঃখ নেই। সাথীদের সঙ্গে খেলাধূলার আনন্দ , দিদিরা এলে আনন্দ, আমজাম কুড়ানোর আনন্দ, ইত্যাদি বিভিন্ন আনন্দে নবদুর্গা ভরপু র।

হৈমবতী সংসারের হাল ধরে আছেন ঠিকই। কিন্তু মনে তার এতটুকু শান্তি নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে একটার পর একটা দুর্ঘটনার আঘাতে তিনি জর্জরিত। ইতিমধ্যে অভয় মারা গেছে। গুণমণি নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হল। অমন ভাল পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল গুণর। কিন্তু ভাগ্যে সইল না। যদি একটা সন্তানও থাকত তার তবু জীবনে একটা অবলম্বন হত। নবর ভাগ্য তো তিনি নিজের হাতেই পুড়িয়ে দিয়েছেন। একমাত্র গঙ্গাকে নিয়ে এ পর্যন্ত কোন দুঃখের কারণ ঘটেনি। রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর গঙ্গার আরও দুটি মেয়ে হয়েছে। ওদের নাম রাখা হয়েছে লবঙ্গসুন্দরী ও ক্ষীরোদাসুন্দরী। গঙ্গার মেয়েগুলি বেশ সুন্দরী হয়েছে। তবে এরমধ্যে লবঙ্গই বেশী সুন্দরী। নাতি নাতিনীদের নিয়ে গঙ্গা এলে হৈম দুঃখকষ্ট কিছুটা ভুলে থাকতে পারেন। গুণ এলেও হৈম খুশী হন বটে, কিন্তু তার বৈধব্যের বেশ চোখে সহ্য হয় না। হৈমর ইচ্ছে ছিল বিধবা মেয়েকে নিজের কাছে রাখার। কিন্তু তা হয়নি। কারণ শ্বশুর-শাশুড়ী গুণকে বড়ই স্নেহ করেন। পুত্রবধূকে কাছে

পেলে তারা পুত্রশোক খানিকটা ভুলে থাকতে পারেন। তাই বিধবা গুণ বেশীর ভাগ সময়ই শ্বশুরবাড়ীতে থাকে। মায়ের কাছেও মাঝে মাঝে আসে।

এমনি করেই দিন কেটে যায়। এরমধ্যে হঠাৎ করে হার্টের অসুখে ঈশান মারা গেলন। শত্রুতা যতই থাক তবু দেবরের মৃত্যুতে হৈম বড়ই দুঃখিত হলেন। সুখেদুঃখে দীর্ঘদিন তাঁরা কাটিয়েছেন একসঙ্গে। স্বার্থের সংঘাত থাকলেও দেবরের উপর কিঞ্চিৎ নির্ভরতাও ছিল। ঈশানের মৃত্যুর পর তাদের পারিবারিক সম্পর্কে আরও দুরত্ব সৃষ্টি হল। ঈশানের পরিবার ইদানীং হৈমর সঙ্গে কোন শত্রুতা করছে না বটে, তবে ে জ-খবরও বড় একটা করে না। একটা ছোট মেয়েকে নিয়ে হৈম এখন বড়ই একা।

তবে দীননাথ অবশ্য আসেন মাঝে মাঝে। প্রয়োজনে সাহায্য সহায়তাও করেন। কিন্তু হৈমর দোষে বিষ্ণুর সঙ্গে নবর বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙ্গে যাওয়ায় হৈমবতী দীননাথের সামনে সংকুচিত থাকেন। নিজেকে বড়ই অপরাধী মনে হয়। কিন্তু দীননাথের আচরণে কোনদিন কোন অনুযোগ অভিযোগ প্রকাশ পায় না। দীননাথ ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষ। তাই তিনি সবকিছুই বিধিনির্দ্দিষ্ট বলে মনে করেন। মানুষের তাতে কোন হাত নেই। তাই তার মনে কোন অনুযোগ অভিযোগ স্থান পায় না। সহজ স্বাভাবিক ভাবেই তিনি হৈমর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

ইতিমধ্যে আবার গঙ্গার যমজ দুটি মেয়ে জন্ম গ্রহণ করল। বোনদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে তাদের নাম রাখা হল সারদাসুন্দরী ও বরদাসুন্দরী। বরদা লবঙ্গের চেয়েও সুন্দরী হয়েছে। খবরটা শুনে হৈম তত খুশী হলেন না। কারণ মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে তিনি খুশী হতেন। কারণ পাঁচ পাঁচটি মেয়ের বিয়ে দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

বেশ কিছুদিন ধরে গঙ্গা মায়ের কাছে আসতে পারছে না। এক ছেলে ও পাঁচ মেয়েকে নিয়ে এমনিতেই তার হিমসিম খাওয়ার যোগাড়, তার উপর শ্বশুরবাড়ীতেও বিপদ আপদের অন্ত নেই, গঙ্গার বড় ভাশুর পাগল, ঈশ্বর হঠাৎ মারা গেছেন। ঈশ্বরের মৃত্যুর মাসখানেকের মধ্যেই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ছোট ভাশুর সর্বেশ্বরের স্ত্রীও চলে গেলেন পরপারে, ঈশ্বরের স্ত্রী আগেই গত হয়েছেন। পাশাপাশি দুইটি মৃত্যুতে সর্বেশ্বর দেহেমনে ভেঙ্গে পড়েছেন, সংসারের হাল ধরে রাখা তার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই সংসারের অবস্থা বড়ই বেহাল হয়ে পড়েছে। সাংসারিক দায় দায়িত্ব নিতে কোটিশ্বর অভ্যস্ত নয়। তবু গঙ্গা ও

কোটিশ্বরকেই সংসারের হাল ধরতে হয়েছে।

সর্বেশ্বরের ছেলে নেই, তিন মেয়ে। বড়টির আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। ভাশুরের দুই মেয়ে. নিজের ছয় ছেলেমেয়ের দায়িত্ব, ঘরগেরস্থালীর কাজ সামলানোই গঙ্গার পক্ষে কঠিন। এরমধ্যে বৈষয়িক ব্যাপারেও অনেক সময় নাক গলাতে হয়। অনভিজ্ঞ কোটিশ্বর সবসময় সব কাজ পেরে উঠে না। তাই গঙ্গার পক্ষে এখন মায়ের খোঁজখবর নেওয়া হয়ে উঠে না। তবে চিন্তা ঠিকই হয়। অনেক সময গঙ্গার মনে হয় যদি তার একটি ভাই থাকত তবে বাপেব বাড়ী নিয়ে তার এত ভাবতে হত না। গুণটারওতো তেমন বুদ্ধি বিবেচনা নেই। নইলে সেও অনেকটা দেখাশুনা করতে পারত। মায়েরতো বয়স হয়েছে। এদিকেও এ অবস্থা। গঙ্গা যে কোনদিক সামলাবে ভেবে পায় না। সবসময় একটা দুশ্চিন্তা তাকে ঘিরে রাখে।

গুণমণির শ্বশুর শাশুড়ী মারা গেছেন। তাই শ্বশুর বাড়ীতে পিছুটান না থাকাতে সে এখন বেশীর ভাগ সময়ই মায়ের কাছে থাকে এবং মাকে নানা কাজে সাহায্য করে। হৈম এতে বড়ই স্বস্তি বোধ করেন। এখন তার বয়স হয়েছে। সবকিছু সামলে চলতে বড়ই কষ্ট হয়। তাই সাহায্য বড় দরকার। গঙ্গার উপরই তার নির্ভর বেশী। কিন্তু সেতো নিজের ঘরই সামাল দিতে পারছে না। যা বিপদ আপদ যাচ্ছে গঙ্গার উপর দিয়ে তাতে হৈমবতী কষ্টবোধ করেন। আর গুণর কষ্ট ও কিছু কম নয়। অভয়ের মৃত্যুর পরে গুণর সে হাসিখুশী ভাবটা আর নেই। আর থাকবেই বা কেমন করে ? স্বামীকে হারিয়ে গুণ যে কি কষ্ট পাচ্ছে তা হৈম ভালই বুঝেন। স্বামী নেই। সন্তান নেই। গুণর জীবনতো অন্ধকার। তবু গুণ বলেই ভেঙ্গে পড়েনি। শ্বশুর বাড়ী বাপের বাড়ী দু'দিকেই করে যাচ্ছে। হৈমর কোনদিকেই শান্তি সুখের লেশমাত্রও নেই।

প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেল নবদুর্গার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু এই পাঁচ বছরের মধ্যেও কারোরই উল্লাসের প্রতি মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। সবার ঘৃণা অবজ্ঞা মাথায় নিয়ে শুধুমাত্র অন্নবস্ত্র. আশ্রয়ের জন্য সে শ্বশুরবাড়ীর এক ভাঙ্গা চালাঘরে পড়ে আছে। কাশী থেকে ফিরে এসে শাশুড়ী কোনদিন তার মুখদর্শন করেননি। গঙ্গা, গুণ. নব কারোর সঙ্গেই তার দেখা হয় না। সেও অবশ্য কাউকে মুখ দেখাতে চায় না। তার এখন উদাস মন ভগ্ন শরীর। তার স্বাস্থ্য বরাবর খুবই ভাল ছিল। কিন্তু ইদানীং শরীরে যে একটা কঠিন রোগ বাসা বাঁধতে চলেছে তা সে বেশ টের পাচ্ছে। তার গায়ে সব সময় একটা ঘুষঘুষে জ্বর থাকে এবং সঙ্গে

আছে খুশখুশে কাশী। এরকম কিছুদিন চলার পর একদিল সে দেখল কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে এসেছে। সে বুঝতে পারল লক্ষন ভাল নয়। নিশ্চয় সে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ব্যর্থ বঞ্চিত জীবনের হাত থেকে তার মুক্তি আসন্ন। রোগটা সে প্রাণপনে গোপন করে রাখল, যাতে রোগের খবরটা হৈমর কানে না যায়। কারণ হৈম তার রোগের কথা জানতে পারলে নিজের মেয়ের কথা ভেবে অবশ্য চিকিৎসা করাবেন। সে বেঁচে থাকলে তার মেয়ে নবদূর্গা অন্ততঃ মাছেভাতেতো থাকতে পারবে। কিন্তু উল্লাসের নিজের বেঁচে থাকার এতটুকু সাধ নেই। নিজের ভাগ্যের উপর ,কৃতকর্মের উপর, জীবনের উপর তার চরম বিতৃষ্ণা এসে গেছে। নবর জন্য অবশ্য তার খুবই দুঃখ হয়। কিন্তু করার কিছু নেই। অসুস্থ শরীরে নীলমণির কথা তার খুবই মনে পড়ে। এই তাপিত জীবন শেষ হলে সে হয়ত নীলমনির সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। শারীরিক কষ্ট থাকলেও ওসব ভাবনা ভেবে মনটা তার অনাবিল এক শান্তিতে ভরে যায়। পরপারে তার মন কল্পানায় সুখের নীড় বাঁধে।

বিনা চিকিৎসায় রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। উল্লাস যখন একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল, তখন রোগ আর গোপন থাকলো না। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে হৈম চিকিৎসা ও সেবাযত্নের সবরকম সুবন্দোবস্ত করলেন, কিন্তু কোন লাভ হল না। কারণ তখন উল্লাসেব অন্তিমকাল উপস্থিত। মানুষের অবজ্ঞা, অবহেলা ঘৃণা সম্বল করে লোভী, কুচক্রী উল্লাস হৈমর পায়ে মাথা রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল।

দশ বছর বয়সে নবদুর্গা বিধবা হল। নবর এই অকালবৈধব্যের জন্য মা ও দিদিরা শোকে অধীর হল। তাদের আর্তবিলাপ আকাশ বিদীর্ণ করল। প্রতিবেশীরা হায় হায় করতে লাগল। নব সব দেখল, শুনল। কিন্তু বুঝল না কিছুই। শুধু অবাক বিস্ময়ে বৈধব্যের বেশ ধারণ করল। দশ বছর বয়সেই নবর জীবনের সবকিছু ফুরিয়ে গেল।

নবদুর্গা বিধবা হওয়ার কিছুদিন পরেই গঙ্গার বড়মেয়ে তরঙ্গিনী ও ভাশুরঝি জয়কালীর বিয়ে হয়ে গেল। এদের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় গঙ্গা খানিকটা দায়মুক্ত হল। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেও যথেষ্ট দায়দায়িত্ব রয়েছে গঙ্গার। ছেলে মহেশও বড় হয়েছে। গ্রামের স্কুলে পড়ছে সে। পড়াশোনায় সে খুবই ভাল। ভবিষ্যতে তার শিক্ষাদীক্ষা নিয়েও চিন্তা ভাবনা আছে। তাছাড়া আছে আরও চারটি মেয়ে।

ওদেরও পাত্রস্থ করতে হবে। তবে ছেলেমেয়েগুলো একটু বড় হয়ে যাওয়ায় সাংসারিক কাজের চাপটা একটু কম। তাই সব ব্যাপারে এখন চিন্তাভাবনা করার সময় হয় মা বোনদের জন্য গঙ্গার মনে বড় কষ্ট। তার বাবা যখন জীবিত ছিলেন, তখন মা কত সুখী ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করেছেন। আর বাবার অবর্তমানে মা'র উপর দিয়ে কি ঝড়ই না বয়ে যাচ্ছে। আর বোনগুলির কথাতো ভাবাই যায় না। বড় দুর্ভাগ্য নিয়ে ওরা জন্মেছে। দিদি নীলমণির কথাও মনে পড়ে। সুখের সবরকম আয়োজন সামনে রেখে সে অকালে চলে গেল। বাপের বিশাল সম্পত্তি এখন গঙ্গার ভাগ্যেই ঝুলে আছে। কিন্তু গঙ্গাতো কোনদিন তা পেতে চায়নি। সংসারের নানা কাজের ফাঁকে এসব কথা যেদিন বেশী করে মনে পড়ে সেদিন রাতে গঙ্গার ঘুম আসেনা।

দুই বিধবা মেয়ে আর নায়েব গোমস্তা চাকর বাকর নিয়ে হৈমবতীর সংসার। দীননাথ ছাড়া এখন তেমন ঘনিষ্ঠ আর কেউ নেই। তিনি আগের মতই আসা যাওয়া করেন এবং সব ব্যাপারেই সাধ্যমত সাহায্য সহায়তাও করেন। তারও সংসারে শান্তি নেই। স্ত্রী মারা গেছেন। এখন বাপছেলের সংসার। দীননাথকে দেখলেই হৈমর বিষ্ণুর কথা মনে পড়ে যায় এবং একটা বেদনার অনুভূতি হৃদয়ে আলোড়ন জাগায়। নবর ভাগ্যেতো যা হবার ছিল তা হয়েছে। এখন একটি ভাল মেয়ের সঙ্গে যদি বিষ্ণুর বিয়েটা হয়ে যায়, তবে হৈম বড়ই স্বস্তিবোধ করবেন। দীননাথ বিষ্ণুর বিয়ের ব্যাপারে কোনদিন কোন কথা বলেন না। বিষ্ণুর মাওতো চলে গেলেন। ঘর একেবারে শূন্য। এখন ঘরে একটি বউ আনা খুব দরকার। দীননাথ এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছেন কিনা হৈম জানেন না জিজ্ঞেস করতেও সংকোচ হয়। তবু একদিন সংকোচ ঝেড়ে ফেলে তিনি দীননাথকে বললেন, "ঠাকুরপো যদি কিছু মনে না করেন, তবে আপনাকে একটা কথা বলি, বিষ্ণুর মাতো চলে গেলেন, আপনারও বয়স হয়েছে, তাই আর দেরী না করে একটি ভাল মেয়ে দেখে বিষ্ণুর বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ নিয়ে আসুন। নবর কপালেতো সুখ শান্তি লেখা নেই। তবু বিষ্ণু যদি বিয়ে করে সুখেশান্তিতে ঘর করে তবে আমি খুবই শান্তি পাব।" দীননাথ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, " সে চেষ্টা কি আর করছি না বউঠান! কিন্তু বিষ্ণু যে কিছুতেই রাজী হয় না। পড়াশুনায় তার খুবই ঝোঁক। বি. এ পাশ না করে কিছুই করবেনা।" হৈম বললেন," বিয়ের পরেওতো বি. এ পাশ করা যায় এবং অনেকে তাই করে। একথা ওকে ভাল করে

বুঝিয়ে বলুন। বুঝিয়ে বললে সে আর অমত করতে পারবেনা, বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলা দরকার।" দীননাথ ম্লান হেসে বললেন, "সেকি আর বলতে বাকী রেখেছি বউঠান! কিন্তু সে এক গোঁ ধরে বসে আছে। জানি না শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্যেই বা কি ঘটবে।"দীননাথ মুখে যাই বলুন না কেন, বিয়ের ব্যাপারে তাকে তেমন আগ্রহী বলে হৈমর মনে হল না।

হৈমর বয়স হয়েছে। বয়সের ভারে তার শরীর শীর্ণ, ভাগ্য বিপর্যয়ে হৃদয়ভগ্ন। যাদের নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন তাদের অনেকেই চলে গেছেন পরপারে। স্বামী গেছেন, দেবর গেছেন, গেছেন দেবরের স্ত্রী ও দীননাথের স্ত্রী। হৈমর মনে হয় তারও দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাই এই বেলায়ই বিষয় আশয় গুছিয়ে ফেলা একান্ত দরকার। রাজচন্দ্রের প্রতি দেবী দুর্গার দৈবনির্দেশ ছিল যে নয়টি মেয়ের মধ্যে একটি মাত্র মেয়ের দ্বারা রাজের বংশরক্ষা হবে। এখন দেখা যাচ্ছে সেই মেয়ে গঙ্গা। তাই তিনি গঙ্গাকে পাকাপাকিভাবে নীলগঞ্জে নিয়ে আসতে মনস্থ করলেন। তিনি থাকাকালীন গঙ্গা যদি স্থায়ীভাবে এখানে এসে পড়ে তবে বিষয় আশয় বুঝে নেওয়া তার পক্ষে সহজ হবে। আর তিনিও স্বামীর সম্পত্তি যথার্থ উত্তরাধিকারীর হাতে তুলে দিয়ে ভারমুক্ত হবেন।

মনস্থির করে হৈম মেয়ে জামাইয়ের কাছে তার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন। গঙ্গা কোটিশ্বরের কাছেও হৈমর প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত মনে হল। তবে এ ব্যাপারে দাদা সর্বেশ্বরের অনুমতি প্রয়োজন। বিষয়টা সর্বেশ্বরকে জানালে সর্বেশ্বর হৈমর প্রস্তাবটা গ্রহণযোগ্য মনে করে যাওয়ার জন্য ভাইকে প্রস্তুতি নিতে বললেন। ভাশুরঠাকুর যাওয়ার ব্যাপারে অনুমতি দিলেও গঙ্গার মন দ্বিধাগ্রস্ত। সে চলে গেলে ভাশুর ঠাকুরের সেবাযত্ন কে করবে আর অবিবাহিতা ভাশুর ঝিটার দেখাশোনাই বা কে করবে? এ সমস্যার সমাধানও সর্বেশ্বরই করলেন। কুমু নামে তাদের এক বালবিধবা ভাগ্নী আছে। শ্বশুরবাড়ী বাপের বাড়ী কোথাও তার সঠিক ঠাঁই হয় না। তাকে বললে সে বোধ হয় সর্বেশ্বরের ওখানে থাকতে রাজী হয়ে যাবে। কুমুকে এ প্রস্তাব করামাত্রই সে আনন্দের সঙ্গে সর্বেশ্বরের সংসারের দায়িত্ব নিতে রাজী হয়ে গেল। নিশ্চিন্তমনে গঙ্গা শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে স্বামী সন্তান সহ বরাবরের জন্য বাপের বাড়ীতে বসবাস করার জন্য চলে এল এবং সেদিন থেকেই রাজচন্দ্রের দৌহিত্র বংশ এই রায় পরিবার নীলগঞ্জ গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল।

গঙ্গা নীলগঞ্জগ্রামে স্থায়ীভাবে আসার পর রাজচন্দ্রের সংসারের এক বিশেষ পট পরিবর্তন ঘটল। রাজের ন্যায্য উত্তরাধিকারীর হাতে হৈমবতী সংসারের হাল তলে দিয়ে মুক্ত হলেন। রাজের সংসারে এখন নয়া জমানা।

গঙ্গা খুবই বুদ্ধিমতী। উত্তরাধিকারসূত্রে বাপের বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের অনেকটাই সে পেয়েছে। তাই বিষয় আশয় বুঝে নিতে তার বড় একটা সময় লাগল না। হৈমর আমলে নায়েব গোমস্তারা খুবই ঢিলে চালে চলত। হৈমকে যেমন তেমন করে একটা হিসেব দিয়ে নিজেরা দু'পয়সা কামাই করত। গঙ্গার আমলে সে সুযোগ আর রইল না। শক্তহাতে গঙ্গা রাশ টেনে ধরল। কাজেই কর্ত্রীর এই মেয়েটিকে তারা খুব একটাসুনজরে দেখল না। তবে গঙ্গা মোটেই তাদের পাত্তা দিল না। তাদের সঙ্গে কোনরকম খারাপ ব্যবহারও করল না। কৌশলে তাদের কাছ থেকে হিসেবপত্র কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে কসুর করল না, কোটিশ্বরেরও আগের মত দায়ছাড়া স্বভাবটা আর নেই। তাই সাধ্যমত সেও বিষয় সম্পত্তির তদ্বির -তদারক করে। ফলে আগের চেয়ে সংসারের আয় বেড়েছে সংসার সুশৃংখল হয়েছে।

গঙ্গার হাতে বিষয়সম্পত্তি সমর্পণ করে হৈমবতী বড়ই হাল্কা বোধ করলেন। ঘরকন্নার কাজেও এখন তার বড় একটা হাত লাগাতে হয় না। গঙ্গা-গুণ-নব তিনবোনে মিলে সবকিছু করে নেয়। হৈমর এখন অনন্ত অবসর। নাতি নাতিনীদের নিয়ে গল্প-গুজব করেই তিনি বেশীর ভাগ সময় কাটান, গঙ্গা আসার পর নাতি নাতিনীদের টানে দীননাথের আসাযাওয়াও বেড়ে গেছে। তার সঙ্গেও নানা ধরনের গল্প হয়। দু'চারজন প্রতিবেশিনী আসেন মাঝে মধ্যে তাদের সঙ্গেও কথাবার্তা হয়। আবার হৈমও নাতনীদের হাত ধরে পাড়ায় বেড়াতে যান। নিশ্চিন্ত বিশ্রামে এখন হৈমর দিন কাটে। স্বামীর মৃত্যুর পর এমন নিশ্চিন্ত বিশ্রাম তিনি আর পাননি।

ঈশ্বরের এমনি একটা বিধান আছে যে মানুষ সবদিক থেকে ভাল থাকতে পারে না। গঙ্গা আসার পর হৈমর সবদিক দিয়েই সুবিধা হয়েছেবটে, তবে একদিকে বেশ একটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। নবর বিয়ের পর ঈশানের পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্কে খুবই ভাল চলছিল। কিন্তু গঙ্গা আসার পর সম্পর্কটা আবার তিক্ততায় পর্যবসিত হতে চলেছে। গঙ্গার ছেলেই যে রাজচন্দ্রের উত্তরাধিকারী, একথা সবারই জানা। কিন্তু জানা আর কাজে পরিণত হওয়া দুই জিনিষ, তাই লিখিতভাবে গঙ্গার নামে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়ায় ওদের পুরানো ঈর্ষাটা আবার

মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যদিও বর্তমানে তাদের আর্থিক অবস্থা আগের মত মন্দ নয়। তবু গঙ্গাকে ওরা সহ্য করতে পারছে না। তাই কারণে অকারণে ওরা অশান্তি সৃষ্টি করে এবং দিন দিন এটা বেড়ে চলেছে। ফলে হৈমর পরিবারের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।

গঙ্গার যমজ মেয়ে দুটি বেশ বড় হয়ে গেছে। তাই ওর আর ছেলেমেয়ে হবে বলে কেউ ভাবেনি। কিন্তু নীলগঞ্জে আসার পরে গঙ্গার পর পর আরও দুটি ছেলে হল। রাজচন্দ্রের দৌহিত্রের সংখ্যা তিন হল, হৈম নাতিদের নাম রাখলেন, দেবেন্দ্র ও শচীন্দ্র, গঙ্গার তিনটি পুত্রসন্তান হওয়াতে হৈমবতী বড়ই খুশী। আর খুশী হল নবদুর্গা। নব শিশু বড় ভালবাসে। তাই দিদির ছেলে দুটোকে নিয়ে সে সব সময় মেতে থাকে। ওদের নাওয়ানো খাওয়ানো ঘুমপাড়ানো সব তার কাজ। হৈম মনে মনে ভাবেন, শিশুদের পরিচর্যায় ব্যাপৃত থেকে নব হয়ত তার বঞ্চিত জীবনের কথা খানিকটা ভুলে থাকতে পারে। ঈশ্বর মানুষকে বঞ্চনা যেমন দেন, তেমনি অবলম্বন ও দেন। গঙ্গার ছোটছেলে দুটিই যেন হতভাগ্য নবর জীবনের অবলম্বন হয়। হৈম ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করেন।

বিষ্ণুপদ বি.এ পাশ করে গ্রামে ফিরে এসেছে এবং গ্রামের মাইনর স্কুলে একটা শিক্ষকের কাজও নিয়েছে। বিষ্ণু সবদিক থেকেই খুব ভাল ছেলে হয়েছে। যেমন সুন্দর চেহারা তার তেমনি লেখাপড়ায়ও খুব ভাল। স্বভাবটিও মধুর। আবার খুব ভাল গান বাজনাও পারে। তার গানের গলা যেমন ভাল তেমনি চমৎকার বাঁশী বাজায়। এবার দীননাথের উচিত একটা ভালমেয়ে দেখে ওর বিয়েটা দিয়ে দেওয়া। কারণ দীননাথেরও বয়স হয়েছে, তাই ওর বিয়েটা হয়ে গেলে তিনি বউয়ের হাতের একটু সেবাযত্ন পেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু ছেলেরবিয়ের ব্যাপারে যেন তার তেমন উদ্যোগ দেখা যায় না। গঙ্গাদের বাড়ীতেও ওর বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা হয়। কিন্তু দীননাথ এ নিয়ে বড় একেটা আলোচনা করেন না এতে হৈমর পরিবারের সবাই অবাক হয়। তাই গঙ্গাই একদিন আগ বাড়িয়ে দীননাথের কাছে বিষ্ণুর বিয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করল , বলল, "কাকা, বিষ্ণুতো বি. এ পাশ করেছে, স্কুলে চাকুরীও করছে। এখনও আপনি ওর বিয়ে দিচ্ছেন না কেন ? আপনার ওতো বয়স হয়েছে। ভগবান না করুন যদি আপনার একটা ভালমন্দ কিছু হয়ে যায়, তবে ওতো একা হয়ে যাবে।" দীননাথ সেই ম্লান হাসিটি হেসে বললেন,"সে চিন্তা যে একেবারে করিনা তা নয়। তবে কি জানিস

মা! কারো জন্য কারোর কিছু আটকায় না। একভাবে না একভাবে দিন চলে যায়। তবে বিয়েতে ওর একেবারে মত নেই। বিয়েতো আর জোরজবরদস্তির ব্যাপার নয়। ওর মত হলেই বিয়ে হবে। এতে আমার কি করার আছে? তাছাড়া তোর সঙ্গে মন খুলে কথা বলতেতো আমার কোন আপত্তি নেই। আমি অন্য একটা কথাও ভাবি। এই যে তোর বাবা আর আমি পরস্পর বাগ্‌দান করেছিলাম, তারওতো একটা মূল্য আছে। তোর বাবাতো আর নিজে কথার খেলাপ করেনি। আমিইবা তবে আমার বাক্যের খেলাপ করি কেন? আমার মৃত্যুর পর তুই যদি পারিস ওর মত করিয়ে বিয়েটা দিয়ে দিস! এ ভার আমি তোকেই দিয়ে গেলাম। এতে ওরও ভবিষ্যৎ হবে আব আমাকেও মিথ্যাচারী হতে হবে না। কথাটা অনেকদিন ধরেই তোকে বলব বলব ভাবছিলাম। আজ তুই নিজে থেকে এ ব্যাপারে উল্লেখ করায় আমার কথাটা বলা হয়ে গেল। ''এটুকু বলেই দীননাথ চুপ করলেন। গঙ্গাও চুপ করেই বইল। একথার উত্তরে গঙ্গার বলার মত কীই বা আছে। কিন্তু একটা গভীর বেদনাবোধ তার মনকে মোচড় দিতে লাগল। এই নীরবতার মধ্যেই আবির্ভূত হল গুণ। দু'জনকে অমন গম্ভীরভাবে চুপ করে থাকতে দেখে সে বলল,''কি হল কাকা? আপনারা দু'জনেই এত চুপচাপ কেন?'' দীননাথ একটু হেসে বললেন, ''হয়নি কিছুই। বিষ্ণু যে বিয়েতে মত দিচ্ছেনা গঙ্গার সঙ্গে সে কথাই হচ্ছিল। ''গুণ কোনদিনই কোনকিছু তলিয়ে ভাবে না। তাই সে হৈ হৈ করে বলে উঠল, ''বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না সে আবার কেমন কথা? আপনি ভাববেন না কাকা। আমি বিষ্ণুর সঙ্গে কথা বলে তাকে রাজী করিয়ে ছাড়ব। আপনি নিশ্চিন্তে বিয়ের সম্বন্ধ দেখুন।'' দীননাথ বললেন, ''সে যদি তুমি পার মা, তবেতো ভালই হয়। কিন্তু যেমন ভাবছ ,কাজটা তেমন সহজ হবে না। ওর মনে যে কি আছে বাপ হয়ে আমিই বুঝি না। বড় চাপা স্বভাবের ছেলে। ''

দীননাথের এসব কথায় গুণ বিশেষ আমল দিল না। একদিন সুযোগমত বিষ্ণুকে সে ধরে বসল। গুণতো রাখঢাক করে কথা বলতে জানে না। তাই বিনা ভূমিকায় সে বিষ্ণুকে বলল,''কাকার মুখে শুনলাম তুই নাকি বিয়ে করতে রাজী হচ্ছিস না? কিন্তু কেন? এখনও যদি বিয়ে না করিস, তবে আর কবে করবি? কাকার ওতো বয়স হয়েছে। আজ আছেন কাল নেই,তার সাধ আহ্লাদের কথাটাওতো ভাবতে হয়। তাই আমি বলছি ওসব ধানাই পানাই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেল। ''একশ্বাসে গুণ কথাগুলো বলে গেল আর

বিষ্ণু নীরবে শুনল। তার এই নীরবতায় অধৈর্য্য হয়ে গুণ আবার বলল,"চুপ করে রইলি কেন? কেমন মেয়ে পছন্দ তাড়াতাড়ি বলে ফেল। আমি কাকাকে কথা দিয়ে এসেছি যে বিয়েতে তোকে রাজী করাব। তোর মত হলে কাকা তোর পছন্দের মেয়ের সঙ্গে এই ফাল্গুনেই তোর বিয়ে দিয়ে দেবেন।"এতসব কথার পর আর চুপ করে থাকা যায় না বলে খুব মৃদুকণ্ঠে বিষ্ণু বলল,"বিয়েই যখন কোনদিন করব না তখন পছন্দ অপছন্দের কোন প্রশ্নই উঠে না।" একথা বলামাত্র গুণ তাকে চেপে ধরল, বলল,"বিয়ে করবি না অমনি বললেই হল? কেন করবি না তার কারণটা বলবিতো।" বিষ্ণু বলল, "সে আমি কাউকেই বলব না, তাছাড়া তোমারতো কারণ জানার কোন দরকার নেই তুমি মত জানতে চেয়েছে, আমি তা জানিয়েছি। এখন আমার মতটা তোমার যাকে যাকে জানানো দরকার জানিয়ে দাওগে। অযথা বকবক করে লাভ কি হচ্ছে তোমার?"কিন্তু গুণ নাছোড়বান্দা। কারণটা তাকে বলতেই হবে।

গুণর সঙ্গে বিষ্ণুর একটা বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক আছে। গুণকে সে সেজদিদি বলে ডাকে। আর গুণও তাকে নিজের ছোট ভাইয়ের মত দেখে। দু'জনের মধ্যে অনেক সুখদুঃখের কথা হয়। তাদের মধ্যে সম্পর্কটা এমন যে কেউ কাউকে এড়িয়ে চলতে পারে না। তবু বিষ্ণু এ ব্যাপারে গুণর কাছে তার মনের কপাট খুলে ধরতে চায় না। গোপন বেদনা গোপনে থাকলেই যথার্থ শান্তি। কিন্তু গুণ তো ছাড়বার পাত্রী নয়। তাই শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু বলল," না শুনে যখন ছাড়বেই না তখন বলতে পারি। তবে একটি শর্তে। একথা তুমি কাউকে বলতে পারবে না।" আগুপিছু ভাবনা গুণর নেই। তাই এক কথায় সে শর্ত মেনে নিল। তখন খুব ধীর স্বরে বিষ্ণু বলল,' শোন সেজদিদি, ছোটবেলায় বড়দের মুখে অনেকবার শুনেছি যে তোমার বোন নবর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির কবে তোমার বাবা ও আমার বাবা আনুষ্ঠানিকভাবে বাগ্দান করেছিলেন, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে সে বিয়ে হল না। কিন্তু আমি সেই বাগ্দানের বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি। তোমরা উল্লাসদাদাকে দোষারূপ কর। কিন্তু আমি করি না। উল্লাসদাদা নিমিত্তমাত্র। ওটা আসলে আমার ও নবর ললাটলিখন। তোমার বোন সারা জীবন বৈধব্যব্রত পালন করবে আর আমি করব চিরকৌমার্যব্রত পালন। আমার মনে হয় এটাই ঈশ্বরনির্দিষ্ট ব্যবস্থা। তাছাড়া আমার বাবা যে বাক্যদান করেছিলেন, ছেলে হয়ে তার মূল্য দেওয়াতো আমার কর্তব্য। তাই বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি হয়ত ভাবতে পার তোমার

সুন্দরী বোনের প্রতি আমার মনে এখনও মোহ আছে। কিন্তু সত্যি করে বলছি যে আমার ওরকম কোন মোহ নেই। তোমার বোনকে সেই কোন শৈশবে দেখেছি, আজ তা স্পষ্ট করে মনেও করতে পারিনা, এখন সে কত বড় হয়েছে, কতটা সুন্দরী সে, আমি জানি না। জানার বিন্দুতম আগ্রহও নেই। আমি শুধু বাগ্দানের বন্ধনেবাঁধা থাকব। আর কিছু নয়। এসব কথা বলার আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তুমি নেহাৎ ধরে বসলে বলেই বলে ফেললাম।"

বিষ্ণুর এসব কথা শুনে গুণর মত ব্যক্তিরও বাক্যস্ফূর্তি হল না। ভগবান কোন প্রাণে যে অমন সুন্দর দুটো জীবন ছারখার করে দিলেন. গুণ ভেবে পেল না। তার চোখে জল এসে গেল। একটু সময় চুপ করে বসে থেকে গুণ বলল."তোর কথাটা পুরোপুরি রাখতে পারবো না ভাই, মেজদিদিকে না বলে আমি কিছুতেই হালকা হতে পারব না। আর কাউকে অবশ্য বলব না।" একথা বলে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এতটুকু অপেক্ষা না করে গুণ চলে এল। উদাস মনে বিষ্ণু হাতে তুলে নিল বাঁশী। বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজতে লাগল হৃদয়স্পর্শী এক করুণ সুরের মূর্ছনা। এ সুর গুণকে আরও ভারাক্রান্ত করে। গুণ দ্রুত পথ চলে সুরের নাগালের বাইরে চলে যায়।

কালের গতি অপ্রতিরোধ্য । কালের নিয়মে মানুষ আসে,থাকে, হাসে কাঁদে আবার কালের নিয়মে হারিয়ে যায়। এই কালের নিয়মেই হঠাৎ একদিন দীননাথ চলে গেলেন। সদাচারী মানুষ. রোগভোগ কিছুই হল না। রাত্রে খেয়ে দেয়ে ভালমানুষ ঘুমিয়েছিলেন। সে ঘুম আব তার. ভাঙ্গল না। ঘুমের মধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন।

দীননাথের মৃত্যুর পব বিষ্ণু একেবাবে একা হয়ে গেল। গুটিকয়েকচাকর বাকর ছাড়া বাড়ীতে তার আপনজন বলতে কেউ নেই। বাপ মা ভাই বোন কেউ নেই, বিয়ে থাও করল না। এজন্য গ্রামের লোক তার জন্য বড়ই দুঃখ করে। কিন্তু সে নিজে সদাপ্রসন্ন। নিজে রেঁধে বেড়ে খায়, স্কুলে যায়. যত্ন নিয়ে ছাত্র পড়ায়। সন্ধ্যার পর দু'একজন সমবয়সী বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে গল্প জমায়, গান গায় বাঁশী বাজায়। তার বাঁশীর সুর যে শোনে তার প্রাণেই একটা সাড়া জাগায়। বাঁশীর সুর শুনে গুণমণি বিষ্ণুর উচ্ছসিত প্রশংসা করে। বাঁশীর করুণ রাগিনী গঙ্গার অন্তরেবেদনা জাগায়, মুখে একটা উদাসভাব ফুটে উঠে। আর নবর কি প্রতিক্রিয়া হয় তা নব নিজেই হয়ত জানে না, জানতে চায়ও না।

ইতিমধ্যে লবঙ্গ ও ক্ষীরোদার পাশাপাশি বিয়ে হয়ে গেল। পাঁচ মেয়ের মধ্যে তিনটিরই বিয়ে হয়ে যাওয়ায় কন্যাদায় গ্রস্ত কোটিশ্বর বেশ খানিকটা হালকা বোধ করছেন, আর রয়েছে যমজ দুটি মেয়ে। এ দুটিকে কোনমতে পার করতে পারলেই কোটিশ্বর কন্যাদায় থেকে মুক্ত হবেন। পাঁচ পাঁচটি মেয়েকে পাত্রস্থ করাতো নেহাৎ সহজ কথা নয়, তবে মেয়েগুলি সুন্দরী হওয়ায় এ পর্যন্ত এদের বিয়ের ব্যাপারে কোটিশ্বরকে তেমন বেগ পেতে হয়নি। তবে ছোট দু'টির সময় কি হবে ঈশ্বরই জানেন। ছেলেদের মানুষ করা নিয়ে তিনি ততটা ভাবেন না। বড় ছেলে মহেশ এ বছর খুব ভাল নম্বর পেয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। সে খুবই মেধাবী ছাত্র। কোটিশ্বর তার সম্বন্ধে মনে উচ্চাশা পোষণ করেন। দেবেন্দ্র শচীন্দ্র সবে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে । এদের পড়াশুনা নিয়ে কোটিশ্বরের মনে কোন ভাবনা চিন্তা নেই। কারণ ইতিমধ্যে বড় ছেলে মহেশ নিশ্চয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ছোটভাইদের সেই মানুষ করে তুলতে পারবে। অবশ্য ছোট দুটি ছেলে পড়াশুনায় তেমন মেধাবী হবে কিনা এখনও ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। ছেলে দুটো দেখতে বড়ই সুন্দর হয়েছে। এরমধ্যে দেবেন্দ্র অধিক রূপবান। বাপের চেহারাই পেয়েছে দেবেন্দ্র। কিন্তু বাপের চেয়েও তার চেহারা যেন বেশী শ্রীমন্ত। এমন রূপবান ছেলে সচরাচর দেখা যায় না। তবে ছেলেদের রূপটা কোন ব্যাপার নয়। আসল হল মানুষ হয়ে উঠা। কোটিশ্বর নিজেওতো রূপবান। কিন্তু লেখাপড়া শিখে তিনিতো মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠতে পারেননি। অথচ তার দাদারা কত বিদ্বান। নিজে খামখেয়ালী করে লেখাপড়ায় আবহেলা করেছেন বলে তার মনে খুবই দুঃখ। তাই ছেলেদের পড়াশুনার ব্যাপারে তিনি খুবই যত্নশীল।

হৈমবতীর পারিবারিক পরিস্থিতিএখন বেশ স্থিতাবস্থায় আছে। কিন্তু তার দেহভাব বড়ই মন্দ যাচ্ছে। বার্ধক্যজনিত নানান রোগে তিনি এখন প্রায় শয্যাশায়ী। কোন ওষুধেই তেমন কাজ দিচ্ছে না। তার শারীরিক অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকেই যাচ্ছে, কবিরাজও তেমন ভরসা দিতে পারছেন না। মৃত্যু যে আসন্ন তা হৈম নিজেও অনুমান করতে পারছেন। তার রোগযন্ত্রণা যেমন অসহনীয়, মানসিক যন্ত্রনাও ঠিক তেমনি। দুই দুইটি বিধবা মেয়ের শূন্য জীবনের কথা ভেবে তার মন বড়ই উথাল -পাথাল করে। বিশেষ করে নবকে নিয়েই তার কষ্টটা বেশী। তারই ভুলের জন্য অমন রূপের ডালি মেয়ের জীবনযৌবন ব্যর্থ হয়ে গেল। নিজেকে কোনক্রমেই ক্ষমা করতে পারেন না হৈম। এছাড়া মনে আরও কত কি যে চিন্তা

আসে তার ঠিক নেই। বিষ্ণুটাও যে নবর জন্যই বিবাগী হয়ে গেল তাও তিনি বুঝেন। আর নবর মনেও ওর প্রতি একটা টান আছে বলেই ধরে নেওয়া যায়। এই টানে কোন এক সময়, ভেসে যায়, যদি নব? তাই হৈম নবকে সবসময় চোখে চোখে রাখেন। বিষ্ণুর সঙ্গে যাতে ওর দেখা না হয় এজন্য সতর্ক থাকেন। একই গ্রামে দু'জনের বাস। কিন্তু তাব মৃত্যুর পরে যদি কোন অসতর্ক মূহুর্তে আশৈশব প্রেমের টানে যৌবনের অন্ধ আবেগে ওরা যদি ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়, তবেতো কলংক রটে যাবে। এধরনের কোন ঘটনা না ঘটাই সম্ভব। কারণ ওরা দুজনেই বড় সংযত চরিত্রের। তবু এসব ভাবনায় হৈমর মন পীড়িত হয়। গুণ ও যুবতী মেয়ে। কিন্তু তার জন্য এসব ভাবনা মনে আসে না। কারণ বেশ বুঝা যায় স্বামীর প্রেমের স্মৃতির বন্ধনে গুণ নিজেকে বেঁধে রেখেছে। তাই তার বিপথে পা বাড়াবার কোন সম্ভাবনার কথা মনে আসে না। কারণ অল্পদিন হলেও সে স্বামীর সঙ্গ পেয়েছে। কিন্তু নব সম্বন্ধে হৈমবতী এসব ভাবনা থেকে কিছুতেই রেহাই পাচ্ছেন না বলে একদিন গঙ্গাকে একান্তে কাছে ডেকে বললেন, "মা গঙ্গা, বেশ বুঝতে পারছি আমার যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। যাবার বেলায় নবকে আমি তোর হাতে দিয়ে গেলাম। ওর মন এবং মান এ দুটোর দিকে লক্ষ্য রাখিস মা। নব আমার রূপের ডালি, বালবিধবা। বয়সদোষে যদি কখনও কোন ভুল করে বসে সেটা ভেবে আমি শান্তিতে যেতে পারছিনা।" গঙ্গা বলল, "তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা। আমি বেঁচে থাকতে নবর গায়ে আচড়টিও লাগতে দেব না। মনে রেখো, সে আমার বোন হলেও সন্তান তুল্য।" একটু সময় চুপ করে থেকে হৈম আবার বললেন, " উল্লাস হাড়িকাঠ পুঁতে দিল, আর আমি সেই হাড়িকাঠে ফেলে নবকে বলি দিলাম। তাই না গঙ্গা?" একথা বলে হৈম ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলেন। একথার কি আর উত্তর দেবে গঙ্গা? নীরবে মায়ের সঙ্গে সেও চোখের জল ফেলতে লাগল।

হৈমর জীবনের শেষদিন যে ঘনিয়ে এসেছে তা তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন। নবর ভার গঙ্গার হাতে সমর্পণ করার দু'দিন পরেই হৈমবতী মারা গেলেন। নব তখন অষ্টাদশী যুবতী। সাদাথানে মোড়া তার শরীর থেকে রূপের আভা যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। নবর সর্ব অঙ্গে রূপের আলো,ভাগ্য তার কয়লা কালো। তার একমাত্র অবলম্বন মাও আজ তাকে ছেড়ে চলে গেলেন। মায়ের জন্য নবর কান্না আর থামে না। জীবনে সে আর এমন করে কাঁদেনি। এই কান্না শুধুকি মায়ের জন্য না কি নিজের জন্য? নিজের জন্য যে কান্না তার মনে এতদিন জমাট বেঁধেছিল

তাই হয়ত মায়ের মৃত্যুকে উপলক্ষ করে বিগলিত হয়ে অবিরল ধারায় ঝরে পড়ছে। গঙ্গা ভাবে নব কাঁদুক, আরও কাঁদুক। কেউ যেন তাকে বাঁধা না দেয়। কাঁদার জন্যইতো জন্ম হয়েছে তার।

মায়ের শেষ কথা স্মরণ করে গঙ্গা নব সম্বন্ধে সতত সজাগ। গঙ্গার মনে স্বামী-সন্তান বিষয় আশয় একদিকে আর একদিকে নব। গঙ্গার সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে নবদুর্গা। দিদির একান্ত স্নেহে যত্নে মায়ের শোকটা নব একটু সামলে নিল। দিদির ব্যবহারে দিদিকে তার মায়ের চেয়েও বড় আশ্রয় বলে মনে হল। শুধু দিদি নয়,জামাইবাবু কোটিশ্বরও সন্তানের মতই নবকে স্নেহ করেন, বোন এবং ভগ্নীপতির স্নেহে যত্নে অল্পসময়ের মধ্যেই নবদুর্গা মায়ের অভাবটা ভুলে গেল।

গুণকে নিয়ে গঙ্গার মনে অতশত ভাবনা চিন্তা নেই। কারণ অল্পদিন হলেও সে স্বামী সুখ পেয়েছে। সেই সুখের স্মৃতি মেয়ে জীবনের একটা বড় অবলম্বন। তাছাড়া গুণ নবর মত চাপা স্বভাবেরও নয়। হাসি খুশী, মিশুকে স্বভাব তার। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে গল্পগুজবে সে বেশ দিন কাটিয়ে দিতে পারে। বিশেষ ভাবনা চিন্তার ধার সে ধারে না। তাই গুণকে নিয়ে গঙ্গা মোটেই ভাবে না। তার ভাবনা চিন্তা সব নবকে ঘিরে। দুই দুইটি যুবতী বিধবা বোনকে সামলে রাখা নেহাৎ সহজ কথা নয়। তাই গঙ্গার মন সর্বক্ষণ বোনদের উপর পড়ে থাকে। বোনদের ভাবনাটাই গঙ্গার কাছে মুখ্য। নিজের স্বামী- সন্তানের ভাবনা গৌণ।

স্ত্রীলোক বলে বিষয়বুদ্ধির দিক দিয়ে গঙ্গাকে মোটেই হেলাফেলা করা যায় না। তার যেমন তীক্ষ্ম বুদ্ধি তেমনি প্রখর ব্যক্তিত্ব। খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে চুলচেরা হিসেব কবে গঙ্গা নিজের অংশ বুঝে নিতে জানে। এজমালি সম্পত্তির খাজনাপত্তরে হিসাবের কোন কারচুপি থাকলে গঙ্গা তা ধরে ফেলে। তাই হৈমর আমলের মত কোন গোঁজামিল দিয়ে গঙ্গাকে ঠকানো যায় না। এতে গঙ্গার উপর তারা খুবই চটে আছে। একেতো গঙ্গা উড়ে এসে জুড়ে বসে জ্যাঠার সম্পত্তির মালিক হয়েছে , আবার স্ত্রীলোকের এত বুদ্ধিও সহ্য করা যায় না। তাই তারা সব সময় গঙ্গাকে নাজেহাল করার তালে থাকে। তাছাড়া ঘরোয়া ব্যাপারে ও দুই পরিবারের মধ্যে একটা ঠোকাঠুকি লেগেই থাকে। গুণ নবকেও গঙ্গার বিরুদ্ধে উস্কানী দেওয়ার চেষ্টা চলে। সবকিছু মিলিয়ে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ওরা একটা অশান্তির সৃষ্টি করে। তবে চেষ্টা করেও তিনবোনের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির

ব্যাপারে সফল হয় না।বরং তাদের কাছে উপহাসের পাত্র হয়। এভাবেই দিন গড়িয়ে চলে।

শুধু বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে নয়, পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রেও গঙ্গার বিশেষ বুদ্ধি বিবেচনাব পরিচয় পাওয়া যায়। নব যাতে তার বঞ্চিত জীবনের কথা ভাবার অবকাশ না পায় সেজন্য গঙ্গা নবকে সবসময় কাজে ব্যাপৃত রাখে। গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী নবদুর্গা। দেবেন্দ্র শচীন্দ্রের দায়দায়িত্ব ও নবর। কাজ যে মানুষের দুঃখ ভুলিয়ে রাখে, এবোধ গঙ্গার আছে। গঙ্গা গুণকেও সব সময় পাড়ায় পাড়ায় টহল দেওয়ার সুযোগ দেয় না। কারণ বিধবা যুবতী। সব সময় ঘুরে বেড়ালে কখন কোন নিন্দা মন্দ রটে যাবে বলাতো যায় না। তাই কাজের অছিলায় গঙ্গা তার পাড়া বেড়ানোর সময় সুযোগটা সংক্ষিপ্ত করে। ঘরকন্নার কাজে গুণর একেবারে মন নেই তাই গুণর কাজ হল ঝি চাকরদের তদারক করা। গরুর যত্ন হল কিনা দেখা।ফসল মেপে ঘরে তোলার ব্যবস্থা করা ইতাদি। এমন কি সারদা বরদা এই ছোট মেয়ে দুটোর ও সবসময় খেলায় মেতে থাকার সুযোগ নেই। রান্নার কাজে সাধ্যমত তাদের নবকে সাহায্য করতে হয়। তবে স্বামী কোটিশ্বরের সবরকম কাজ গঙ্গা নিজেই করে। সে দায়িত্ব সে কারো উপর ছেড়ে দেয় না।

বিষ্ণুপদ একাই আছে। বন্ধুরা অবশ্য সঙ্গ দেয়। ওরা তার বিয়ের চেষ্টাও করে। কিন্তু বিষ্ণুকে রাজী করাতে পারে না। পাড়া প্রতিবেশীরাও বেশ দেখাশুনা করে। একা হলেও সে আছে ভালই। গুণমণির ও বিষ্ণুর মধ্যে ভাইবোনের সম্পর্ক। তাই গুণও প্রায়ই যায় বিষ্ণুর বাড়ীতে। সেজদিদি এলে বিষ্ণু বড়ই খুশী হয়। দু'জনে অনেক গল্পগুজব করে। কিন্তু তাদের গল্পের মধ্যে কখনও বিষ্ণুর বিয়ের প্রসঙ্গ উঠে না। বাড়ীতে এসে গুণ গঙ্গার কাছে বিষ্ণুর জন্য খুবই দুঃখ করে। কিন্তু নবর সামনে কখনও বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করে না কারণ এতে নবর মনে কোন প্রতিক্রিয়া হতে পারে। অন্য চিন্তা না থাকলেও গুণর এটুকু বাস্তববোধ আছে।

বিষ্ণুর একক জীবন হলেও কাজকর্ম নেহাৎ কম নয়। বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবের সেবাপূজা,নিজের রান্নাবান্না, স্কুলের কাজ এবং জমিজমার তদারক সবই তাকে একা কবতে হয়। একক মানুষের জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই এক হাতে করতে হয়। কিন্তু লোকচক্ষে একক মানুষের অনন্ত অবসর। একক মানুষের জীবন যাত্রার সমস্যা পরিজন পরিবৃত লোকেরা বুঝতেই পারে না।

বিষ্ণু শীত গ্রীষ্ম বারমাসই খুব ভোরে স্নান করে আগে রাধামাধবের পূজোটা সেরে নেয়। তারপর শুরু করে দিনের কাজ। এতসব কাজের মধ্যে আবার গান বাজনার নেশাটাও তার অনেকটা সময় কেড়ে নেয়। এজন্য অনেক সময় তার খাওয়া দাওয়া হয়ে উঠে না। তাছাড়া শরীর সম্বন্ধে সে বড়ই উদাসীন।অযত্নে অবহেলায় ভিতরে ভিতরে তার শরীরে ভাঙ্গন ধরেছিল। এ ব্যাপারে তার কোন লক্ষ্যই ছিল না। এক মাঘের শীতে ভোর বেলায় পুকুরে ডুব দেওয়ার পরই তার ভীষণ ঠান্ডা লেগে জ্বর হল। সেই জ্বরই ধীরে ধীরে কঠিন নিউমোনিয়ায় পর্যবসিত হল। এমনিতে সেরে যাবে ভেবে সে কোন চিকিৎসাও করল না। রোগের যখন খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেল ,তখন বন্ধুবান্ধব পাড়াপ্রতিবেশী চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু তখন বড় বেশী দেরী হয়ে গেছে। তাই লাভ কিছু হল না। মাঘের শেষদিনে, দিনরাত্রির সন্ধিক্ষণে বিষ্ণুর প্রাণ তার যৌবনশ্রীমণ্ডিত শরীরখানি ছেড়ে উড়ে গেল অজানার দেশে। বিষ্ণুকে বেশীদিন আর একা থাকতে হল না। ঈশ্বরই তার একাকীত্ব ঘুচিয়ে দিলেন।

বিষ্ণুর জন্য কাঁদবার মত আপনজন কেউ ছিল না। তবু তার মৃত্যুতে কান্নার রোল উঠল। বিষ্ণুর ছাত্ররা কাঁদল, সহকর্মীরা কাঁদল বন্ধুবান্ধব ও প্রতিটি গ্রামবাসী কাঁদল। বিলাপ করল গুণমণি,গঙ্গামণির দুই চোখে অঝোরে জলের ধারা নামল, কোটিশ্বরের চোখও শুষ্ক রইল না। কাঁদল না শুধু একজন। সে নবদুর্গা।

খবরটা শুনে নব যথারীতি বসে গেল তার পূজার আসনে, শ্যামসুন্দরের মূর্তির সামনে। এই সেই অষ্টধাতুর শ্যামসুন্দরের মূর্তি যা তার মা কাশী থেকে এনে পূজার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এবং শৈশবে এই মূর্তিটিকেই পুতুল হিসাবে পাওয়ার জন্য নবর মনে ব্যাকুলতাব অন্ত ছিল না। আর আজ এই মুর্তিই নবর ধ্যানজ্ঞান, ব্যর্থ জীবনের একমাত্র অবলম্বন। এই মুর্তি যেন নবর সঙ্গে কথা বলে। এই মুর্তির সামনে বসলে নব সব দুঃখ ভুলে যায়। তার যে অসাধারণ স্থৈর্য তারও যোগান দিচ্ছেন এই শ্যামসুন্দর। কিন্তু আজ? আজ তো সে কিছুতেই ঠিক থাকতে পারছে না। শ্যামসুন্দর আজ আর তাকে সেই স্থৈর্যের যোগান দিচ্ছেন না। নবর মনের প্রতিজ্ঞা, সে কখনও স্থৈর্য্য হারাবে না, নিজের মনের রুদ্ধ কপাট কখনও খুলে ধরবে না, নিজের মনে সে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এই অগ্নিজ্বালা কখনও প্রকাশ করবে না। এ যাবত নব তার এই প্রতিজ্ঞা

রক্ষা করেই চলেছিল, সংসারের কাজের চাকায় নিজেকে বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু আজ আর পারছেনা। তার সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু তা নব হতে দিতে চায় না। ভাঙ্গা বাঁধ জুড়ে দেওয়ার শক্তি যিনি দেবার তিনি নবর জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের দিনে বিমুখ হয়ে আছেন। নবর নিজেকে আড়াল করা এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। তাই জীবনে যা করেনি তাই করল নব। কাউকে খাবারদাবার না দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। ঘরের থমথমে ভাব দেখে বাচ্চারা না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে গুণও ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে ছিলেন কোটিশ্বর ও গঙ্গা। নবকে অসময়ে শুয়ে পড়তে দেখে গঙ্গা কোটিশ্বরও কিছু না বলে ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। এই অন্ধকারটা নবদুর্গার বড়ই কাম্য ছিল। এই অন্ধকারেই নিজের আঁধার জীবনের মুখোমুখি হল সে। অতি শৈশবে পিতা তাকে বিষ্ণুর হাতে সমর্পণ করবেন বলে বাগ্‌দান করেছিলেন। বড় হয়ে একথা বহুবার শুনেছে সে। কিন্তু মৃত পিতার বাক্যকে অগ্রাহ্য করে বিত্তলোভী বড় ভগ্নীপতি উল্লাস তার সঙ্গে বিয়ের একটা প্রহসন করে তার জীবনটা তছনছ করে দিল। নেহাৎ বালিকা বয়সের সেই বিয়ের স্মৃতি এবং উল্লাসের স্মৃতি দুইই এখন তার কাছে অস্পষ্ট। যখন সবকিছু সঠিক ভাবে বুঝবার বয়স হয়েছে, তখন কোনদিনই সেই ভগ্নীপতিকে সে স্বামী বলে ভাবতে পারেনি। শুধু সেই মানুষটাকে কেন্দ্র করে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে। পিতৃনির্বাচিত সেই বিষ্ণুপদকেই স্বামী বলে মনে হয়েছে। এতে পাপভাগী হয়েছে কিনা সে জানে না। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও মন থেকে বিষ্ণুকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। ভাগ্যদোষে যদিও তাদের বিয়ে হয়নি, তবু নবদুর্গা তাকেই অন্তরের অন্তস্থলে পতির আসনে বসিয়ে শ্যামসুন্দরের মাধ্যমে এতদিন পূজা করেছে। হৃদয়ের প্রেমভক্তি নিবেদন করেছে। এ শুধু মনেরই ব্যাপার। মেজদিদির সতর্কতায় বিষ্ণুর সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ হত না। অবশ্য তার নিজের দিক থেকেও দেখাসাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল না। অন্তরে বিষ্ণুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে কামনাহীন প্রেমে সে, তার শূন্য জীবনকে পূর্ণ বলে ভেবে নিয়েছে। তাই রূপবতী, যৌবনবতী নবদুর্গা আশ্চর্যরকম স্থির, অচঞ্চল। তাছাড়া বিষ্ণুর অন্তরেও সে যে প্রেমের আসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত তাও সে অনুভব করতে পেরেছে। কোন এক অলৌকিক শক্তিবলে দু'টি মন যেন পরস্পরকে ছুঁয়ে ছিল, বাইরে তাদের মিলন হয়নি বটে, তবে অন্তরে অন্তরে তাদের অভূত পূর্ব এক মিলন সংঘটিত হয়েছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে দুটি হৃদয়

কামগন্ধহীন এক প্রেমের স্বর্গ রচনা করেছিল। তাই বিষ্ণুও ছিল নবর মতই স্থির সদাপ্রসন্ন।

অন্তরের অন্তস্থলে যাকে অবলম্বন করে নবদুর্গা দুস্তর জীবনপথ এযাবত পরিক্রমা করছিল, সে আজ নেই। চলে গেছে বহুদূরে, পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে। এই দুর্বহ বিচ্ছেদ বেদনা নব সইবে কি করে ? অথচ এই দুঃসহ যন্ত্রণার না আছে প্রকাশের সুযোগ. না আছে সইবার শক্তি। এখন কি করবে নবদুর্গা ? উপায় একটিই আছে। শ্যামসুন্দরের কৃপায় ভোর হবার আগেই যদি তার হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়, তবেই নব বেঁচে যায়। শ্যামসুন্দরের চরণ উদ্দেশ্য করে মাথা কুটে নব। "তাই কর ঠাকুর, তাই কর, জন্মদুঃখিনী নবর জন্য অন্ততঃ এটুকু করে দাও।" এরকম উথলপাথল করতে করতে একসময় নব কেমন আচ্ছন্নের মত হয়ে গেল। সেই আচ্ছন্নতার মধ্যে সে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। ব্যাপারটা স্বপ্ন না দৃশ্য তা তার ঠিক বোধগম্য হল না। হাসি হাসি মুখ নিয়ে বিষ্ণু তার সামনে এসে বলল, "শুধু শুধু এত ভেঙ্গে পড়েছ কেন নব ? আমিতো আছি। তোমাকে ছেড়ে কি কোথাও যেতে পারি ? শারীরিক ভাবে আমরাতো কোনদিনই কাছাকাছি ছিলাম না। আমরা ছিলাম একে অপরেব অন্তরে। এখনও তাই আছি। বিশ্বাস না হলে আমাকে ছুয়ে দেখ"এই বলে বিষ্ণু নবর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। স্পর্শ বাঁচাতে নব যেই একটু পিছিয়ে গেল, অমনি উচ্চহাসিতে বিষ্ণু নবকে সচকিত করে দিয়ে শ্যামসুন্দরের মূর্তির মধ্যে মিলিয়ে গেল।

নবদুর্গার আচ্ছন্নভাব কেটে গেল। শয্যা ছেড়ে এক দৌড়ে সে চলে গেল পূজার ঘরে ,বসে পড়ল শ্যামসুন্দরের মূর্তির সামনে। কিন্তু কোথায় শ্যামসুন্দর ? এযে স্বপ্নে দেখা বিষ্ণুর মূর্তি। হতচৈতন্য নব মূর্তির সামনে লুটিয়ে পড়ল। কতক্ষণ এভাবে পড়েছিল সে মনে নেই। যখন চেতনা ফিরল তখন কোন মন্ত্রবলে তার মনের তীব্রযন্ত্রণা ধুয়েমুছে একেবারে সাফ হয়ে গেছে। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মন একেবারে শান্ত। সমাহিত । তাদের সম্পর্কতো বরাবরই ছিল অন্তরে অন্তরে। এখনও তাই আছে। সাময়িকভাবে এটা সে ভুলে গিয়েছিল,বিষ্ণু স্বপ্নে দেখা দিয়ে সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছে। আর বিষ্ণুর সত্ত্বা যে শ্যামসুন্দরের মধ্যে মিশে আছে। সেটাও তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে বিষ্ণু। নব উপলব্ধি করতে পারছে যে শ্যামসুন্দরের সেবাপূজার মধ্যেই বিষ্ণুকে আরও নিবিড় ভাবে খুঁজে পাবে সে। বিষ্ণুতো মরে যায়নি। বেঁচে আছে শ্যামসুন্দরের মধ্যে। নবর আর এখন কোন দুঃখ বোধ হচ্ছে

না। সবই শ্যামসুন্দরের কৃপা।

রাত আর নেই। দরজা জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরে ভোরের আলো প্রবেশ করেছে। নবদুর্গা শ্যামসুন্দরের চরণে প্রণতি জানিয়ে শান্তভাবে প্রতিদিনের মত গৃহকর্মে ব্যাপৃত হল। সারারাত একটা মানসিক ধকল যাওয়ায় গঙ্গা -গুণর ঘুম দেরীতে ভাঙ্গল। ঘুম থেকে উঠে নবকে যথারীতি কাজ করতে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। কারণ বিষ্ণুর মৃত্যু নবর মধ্যে একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে অশংকায় দু'বোনই চিন্তিত ছিল। কিন্তু নবকে স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করতে দেখে তারা নিশ্চিন্তবোধ করল। তারপর প্রত্যেকে নীরবে যে যার কাজকর্ম করতে লাগল। বিষ্ণুর মৃত্যু রাজচন্দ্রের মেয়েদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় প্রত্যক্ষভাবে আর কোনরকম ছায়াপাত করল না।

একই পৈত্রিক বাড়ীতে রাজচন্দ্রের মেয়েরা এবং ঈশানচন্দ্রের ছেলেরা আলাদাভাবে বসবাস করছে। মস্ত দালানকোঠার বাড়ী,জোড়াপুকুর বাঁধানো ঘাট,বাড়ীর আগে পিছে ফুলফলের বাগান। এমন বাড়ী নীলগঞ্জগ্রামে আর দ্বিতীয় নেই। এতবড় বাড়ীতে দুই পরিবার কেন,তিনচারটি পরিবার অনায়াসে আলাদাভাবে থাকতে পারে। বাড়ীটা রাজচন্দ্রই তৈরী করিয়েছিলেন এবং ছোটভাইকে নিয়েই তিনি এ বাড়ীতে বসবাস করতেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই দুইভায়ের ছেলেমেয়েরাও এই বাড়ীতেই বসবাস করে আসছে। তবে এতদিন এরকম চলছিল। কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবত একই বাড়ীতে দুই পরিবারের বসবাস ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠছে। তালুকের খাজনা, ক্ষেতের ফসল ইত্যাদি আয়ব্যয় সংক্রান্ত বিবাদতো লেগেই আছে' তাছাড়া নিত্যনৈমিত্তিক চলার ক্ষেত্রেও তুচ্ছকারণে মেয়েলী রেষারেষি দিনদিন উৎকটভাবে বেড়ে চলেছে। অবস্থা এমন হয়েছে যে টিকে থাকাই দায়। স্নানের ঘাট নিয়ে ঝগড়া, পূজার ফুল নিযে ঝগড়া, বাচ্চাদের নিয়ে ঝগড়া বিরামহীনভাবে চলছে। এসব ঝগড়া এড়ানোর জন্য গঙ্গারা তিনবোন যতই সংকুচিত হয়ে চলছে, ঝগড়া যেন ততই বেড়ে চলেছে। শান্তিপ্রিয় গঙ্গাদের তিনবোনেরই এসব নোংরা ঝগড়াঝাটি খুবই অসহ্য হয়ে উঠেছে। এত রেষারেষি করলে এক বাড়ীতে থাকা বড়ই কষ্টকর। ওদের লোকবল অর্থবল যেমন বেশী তেমনি হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থচিন্তাও সীমাহীন। আসলে রাজচন্দ্রের মেয়েদের এ বাড়ী থেকে উৎখাত কবার উদ্দেশ্যই ওরা ওদের সর্বক্ষণ উত্ত্যক্ত করে চলেছে।

বাড়ী এজমালী। তাই বাড়ীতে দুইপক্ষেরই সমান অধিকার। কিন্তু অধিকারের অস্বস্তির চেয়ে অধিকার ত্যাগের স্বস্তি অনেক বেশী। তাই গঙ্গারা তিনবোন মিলে পরামর্শ করে ঠিক করল, এ বাড়ী ছেড়ে কিছুদূরে উত্তরদিকের যে খালি জমিটা পড়ে রয়েছে, ওখানে বাড়ী করে ওরা চলে যাবে। ভাল বাড়ীটাতে ওরাই ভালভাবে থাকুক। গঙ্গারা কষ্ট করলেও শান্তিতেতো থাকতে পারবে। নিত্য অশান্তি আর কত সহ্য করা যায়? অথচ বাড়ীটা আসলে ওদের বাবা রাজচন্দ্রেরই। তাই শ্বশুরের নিজহাতে গড়া অমন সুন্দর বাড়ী ছেড়ে দিতে কোটিশ্বরের এতটুকু ইচ্ছে নেই। কিন্তু তিনবোনের মিলিত ইচ্ছার চাপে তাকে রাজী হতেই হল।

নূতন বাড়ী তৈরীর কাজ শুরু হল। তিনবোনেরই আকাঙ্খা পৈতৃক বাড়ীর মতই সর্বপ্রকার সুব্যবস্থাযুক্ত পাকা বাড়ী তৈরী করা। কিন্তু আর্থিক কারণে প্রথমেই তা করা সম্ভব হল না। ধীরে ধীরে সব হবে এই আশা নিয়ে নূতন বাড়ীতে টিনের চাল আর কাঠের খুঁটি দিয়ে বেশ বড়সড় ঘর তৈরী হল। কিন্তু ঘরের মেঝেও পাকা করা সম্ভব হল না। বাড়ীর সামনে পিছনে বেশ বড় জোড়াপুকুর কাটানো হল বটে, কিন্তু ঘাট বাঁধানো হয়ে উঠল না। এটুকু করেই বুকভরা বেদনা নিয়ে রাজচন্দ্রের নির্বিবাদী মেয়েরা শুধুমাত্র নিত্যকলহ এড়াবার জন্য নায্য অধিকার ছেড়ে দিয়ে নূতন বাড়ীতে উঠে এল।

সুখে বসবাসে অভ্যস্ত পরিবারটি নূতন বাড়ীর নানা অব্যবস্থার জন্য খুবই অসুবিধা বোধ করতে লাগল। কিন্তু বাড়ীর জন্য আপততঃ আর খরচ করা সম্ভব নয় বলে অসুবিধাগুলো মেনে নিতেই হল। কারণ সামনে খরচ অনেক। যমজ মেয়ে দুটি বেশ বড় হয়ে উঠেছে। ওদের বিয়ের খরচ আছে। বড়ছেলে মহেশ কোলকাতা থেকে বি. এ. পড়েছে। তার পড়ার খরচও কম নয়। ছোটদুটি ছেলেও স্কুলের উঁচুক্লাসে পড়ছে। তাদের পড়াশুনার জন্য ও কমহলেও কিছুটা খরচতো আছেই। কোটিশ্বরের কাছে পড়াশুনার খরচ আগে, পরে অন্যকিছু। তিনি নিজে খামখেয়ালীপনার জন্য লেখাপড়া তেমন করেননি। পরিণত বয়সে এজন্য তার মনে খুবই দুঃখ. তাই ছেলেদের লেখাপড়ার ব্যাপারে তার কোন্ কার্পণ্য নেই। ছেলেদের উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি খুবই আগ্রহী এবং যত্নশীল। বড় ছেলে মহেশ যে উচ্চশিক্ষা লাভ করে তার মুখ উজ্জ্বল করতে চলছে. তাতে তিনি খুবই আনন্দিত। ছোট ছেলে শচীন্দ্র মনে হয়, মহেশের চেয়েও মেধাবী হবে। মেজছেলে

দেবেন্দ্র শচীন্দ্রের মত মেধাবী না হলেও লেখাপড়ায় ভালই। কোটিশ্বর নিজে যা পারেননি, সবকয়টি ছেলেই যে তা পারবে , এব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত। তাই বাড়ীর জন্য এই মুহুর্তে তেমন খরচ করা সমীচীন মনে করেন না। তাই নূতন বাড়ীতে নানা অব্যবস্থার মধ্য দিয়েই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হচ্ছে।

তবে মনে হয় বাড়ীটার পয় আছে। এবাড়ীতে আসার কিছুদিন পরই আচমকা বরদার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। বরদা পরমাসুন্দরী। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে মস্ত এক জমিদার কোনরূপ দানসামগ্রী ছাড়াই তাঁর একমাত্র পুত্রের সঙ্গে বরদার বিয়ে দিয়ে তাকে পুত্রবধূরূপে ঘরে নিয়ে যেতে খুবই আগ্রহী হলেন। কোটিশ্বরের পরিবার এমন বড়ঘরে মেয়ে দেওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারেনি। এমন সম্বন্ধতো কোনমতেই হাতছাড়া করা যায় না। কিন্তু মুস্কিল হল সারদাকে নিয়ে যমজ হলেও সারদাই বড়। বড়কে রেখে ছোটর বিয়ে দেওয়াতো সম্ভব নয়। তাই কোটিশ্বর তড়িঘড়ি সারদার জন্য পাত্রের সন্ধান শুরু করলেন। ভাগ্যগুণে মোটামুটি পছন্দের একটি পাত্র জুটেও গেল। তবে দাবীদাওয়াটা বড় বেশী। কিন্তু কি আর করা যাবে। দাবীদাওয়াটা মেনে নিতেই হল। একইরাতে দুই যমজবোনের বিয়ে হয়ে গেল ঠিক যেমন বিয়ে হয়েছিল নীলমণি ও গঙ্গার। এতদিনে কন্যাদায়মুক্ত হলেন কোটিশ্বর।

কোটিশ্বর মনে মনে স্থির করলেন যে মেয়ে বিয়ের খরচের ধাক্কাটা সামলে উঠেই তিনি বাড়ীর ব্যাপারে নজর দেবেন। আর কিছু হউক না হউক অন্ততঃ পুকুরের ঘাট বাঁধানো আর ঘরের মেঝে পাকা করার কাজটা সেরে ফেলবেন। স্বার্থান্বেষী শরীকদের উপদ্রব সহ্য করতে না পেরে শ্বশুরমশায়ের অমন চমৎকার পাকা বাড়ী ছেড়ে তার মেয়েরা যে এমন কাঁচাবাড়ীতে বাস করছেএজন্য তার মনে সবসময় যেন একটা কাঁটা খচখচ করে। বিশেষ করে নব-গুণর জন্য কষ্ট আরও বেশী হয়। মেয়ে দুটো কি পেল জীবনে? সামান্য একটু সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাও তাদের হচ্ছেনা। তিনি জানেন, শানবাঁধানো ঘাট ছাড়া স্নান করতে গুণর কষ্ট হয়। নব কাঁচা ঘরে হাঁটতে পারে না। পায়ের তলায় মাটি লাগলে তার পায়ের পাতা সিরসির করে। কিন্তু এখানে তাদের এই অসুবিধাগুলো নিত্য ভোগ করতে হচ্ছে। তাই কোটিশ্বরের ইচ্ছা ঘাট বাঁধানো আর মেঝেপাকা করার কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলবেন। দালানবাড়ী তৈরী পরের কথা।

কিন্তু ভাবামাত্রইতো কোনকিছু করা হয়ে উঠে না। কোটিশ্বর যখন এ

দুটো কাজের ব্যবস্থা প্রায় করে এনেছেন এমন সময় নেমে এল আর এক পারিবারিক দুর্যোগ।পরিকল্পিত কাজটা তাই স্থগিত রাখতে হল।

পাঁচমেয়ের মধ্যে বরদার বিয়েটা আশাতীত ভাল হয়েছে। তার ধনী শ্বশুরবাড়ীতে শুধু ভোগবিলাসের প্রাচুর্য্যই নয়, স্নেহযত্নও সীমাহীন। শ্বশুরশাশুড়ী তাকে মাথার মণি করে রাখেন। বরদা যখন বাপের বাড়ীতে আসে, তখন তার সুখী চেহারাও অলংকারের বহর দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। বরদা বড়ই ভাগ্যবতী। অবশ্য সৌভাগ্য মাবাপেরও। মা বাবার ভাগ্যের জোরেইতো মেয়ে এত ভাগ্যবতী হয়েছে।

কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশীদিন স্থায়ী হল না। বাপের বাড়ীতে এসে প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেল বরদা। তার সুখের জীবন অকালে ঝরে গেল। সদ্যোজাত শিশুপুত্রটি সুস্থ শরীরে জীবিত রইল। বরদার শ্বশুর শাশুড়ী পুত্রবধূর জন্য শোকে আকুল হলেন এবং শোকের জ্বালা ভুলবার জন্য পুত্রবধূর চিহ্নস্বরূপ নাতিটিকে নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়ে যত্নের সঙ্গে মানুষ করতে লাগলেন। আর গঙ্গা কোটিশ্বর শোক সাগরে ভাসতে লাগলেন।গঙ্গার যমজ বোন নীল যেমন বিয়ের পর চলে গেল। বরদাও ঠিক তেমনি চলে গেল।

সময়ের ব্যবধানে স্বাভাবিকভাবে শোক কিছুটা প্রশমিত হয়। তাই কিছুদিন পরে কোটিশ্বর কিছুটা সামলে উঠলেন। তাছাড়া তিনি পুরুষ মানুষ। শোকে ধৈর্য্য ধরার শক্তি মেয়েদের চেয়ে পুরুষের বেশী। তাই কোটিশ্বর শোক খানিকটা ঝেড়েফেলতে সক্ষম হলেন। কিন্তু গঙ্গার পক্ষে এই নিদারুণ শোক ঝেড়ে ফেলা সম্ভব হল না। যতদিন যাচ্ছে গঙ্গার শোকের তীব্রতা ততই বেড়ে চলেছে। গঙ্গার অবস্থা ঠিক শোকগ্রস্ত পিতা রাজচন্দ্রের মতই। এভাবে চললে তারও জীবন সংশয় দেখা দিতে পারে। তাছাড়া এত বড় সংসারের দায়িত্ব যার উপরে সে যদি সংসারের হাল ছেড়ে দেয় তাহলে সংসার চলে কি করে? একমেয়ে গেছে বটে, তবু অন্য ছেলেমেয়েরাতো আছে। আর দুটো বিধবা বোনওতো রয়েছে। এদের মুখের দিকেওতো চাইতে হবে। কিন্তু গঙ্গাকে একথা কিছুতেই বুঝানো যায় না। সে একভাবেই অন্নজল ছেড়ে বিলাপ করে যাচ্ছে। গঙ্গার অবস্থা দেখে নব-গুণও খুবই চিন্তিত। যে গেছে, হাজার কান্নাকাটি করলেও সে আর ফিরে আসবে না। এই সত্য জেনেও গঙ্গা অবুঝ। কি করা যায় ভেবে ভেবে হঠাৎ কোটিশ্বরের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। গঙ্গাকে যদি রামায়ণ মহাভাব তের কাহিনী পাঠ করে শোনানো

যায়, তবে সেসব শুনে সে খানিকটা শান্ত হলেও হতে পারে। তাই কোটিশ্বর গঙ্গাকে জোর করে কাছে বসিয়ে নিয়ম করে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে শোনাতে লাগলেন। ফল ভালই হল। নিত্য রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শুনে গঙ্গারমধ্যে কিছুটা স্বাভাবিকতা ফিরে এল। এখন তিনি সংসারের দায়দায়িত্ব আগের মতই নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। কোন দিকেই তার কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু তাকে একটা বাতিকে পেয়ে বসেছে। রোজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শোনা চাইই, না শুনতে পেলে আবার কেমন হয়ে যান। কোনদিকে তার কোন দৃষ্টি থাকে না। বরদার নাম করে একা একা বিড় বিড় করেন। তাই কোটিশ্বরকে হাজার কাজ ফেলেও রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে শোনাতে ই হয়। গঙ্গারা তিনবোনের মধ্যে কেউই লেখাপড়া জানেনা বলে কাজটা কোটিশ্বরকেই করতে হয়। ব্যাপারটা কোটিশ্বররের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। কারণ কোটিশ্বর সংসারে একমাত্র পুরুষ মানুষ। তাই খেতখামারের তদারকি, মামলামোকদ্দমার তদ্বির সবই তাকে করতে হয়। কাজের চাপে সবদিন একসময়ে বাড়ী ফেরাই সম্ভব হয় না। নির্দ্দিষ্ট সময়েপ্রতিদিন এসব পাঠতো অসম্ভব। সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করা যায় ভেবেচিন্তে কোটিশ্বরের মনে হল দেবু শচীকে অবশ্য পাঠ করতে বলা যায়। কিন্তু এতে ওদের সময় নষ্ট হবে। পড়াশুনার ক্ষতি হবে। তাছাড়া ওরা ছেলেমানুষ এত সময় ধরে পাঠ করার ধৈর্য্যই ওদের থাকবে না। তার চেয়ে গঙ্গাকে যদি পড়তে শিখিয়ে দেওয়া যায়, তবে সে নিজেই পড়তে পারবে। কারোর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না এবং ঝামেলাও চুকে যাবে। তবে এ বয়সে গঙ্গা পড়তে শিখতে পারবে কিনা কে জানে। তবু চেষ্টা করে দেখা যাক্।

ভাবনাটা ভেবেই কোটিশ্বর কাজে নেমে পড়লেন। প্রথমে শুরু হল অক্ষর পরিচয়। কোটিশ্বরকে অবাক করে দিয়ে একদিনেব মধ্যেই গঙ্গা অক্ষরগুলো সব চিনে ফেললেন। আরও অবাককাণ্ড যে একমাসের মধ্যেই গঙ্গা ভালভাবে রামায়ণ মহাভারত পড়তে শিখে গেলেন। গঙ্গার মধ্যে অদ্ভুত এক মেধাশক্তি যে সুপ্ত ছিল তার পরিচয় পেয়ে কোটিশ্বর খুবই আশ্চর্য হলেন। মহেশ শচীন্দ্র যে এতটা মেধাবী হয়েছে সেটা গঙ্গারই গুণে। তিনি নিজেতো মেধাবীও ছিলেন না, মনোযোগীও ছিলেন না। দাদারা ঠেলেঠুলে কাজ চালানোর মত কিছু লেখাপড়া শিখি য়েছিলেন। যাক্ এবার কোটিশ্বব নিশ্চিন্ত। কারণ গঙ্গা এখন নিজেই অবসর সময়ে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করেন। নব-গুণও খুব মন দিয়ে সেই পাঠ শুনে। অনেক

প্রতিবেশিনীও এসে পাঠ শুনতে জুটে যান। বাড়ীতে রীতিমত একটা পাঠচক্রের আসর বসে। সময় কাটে ভাল। গঙ্গা যতদিন জীবিত ছিলেন . ততদিন রামায়ণ মহাভারত পাঠ ছিল তার নিত্য কর্ম।

মহেশ খুব ভালভাবে বি.এ পাশ করে কোলকাতা থেকে ফিরে এসেছে। ছেলের কৃতিত্বে কোটিশ্বর বড়ই আনন্দিত। মা মাসীরাও মহেশের পাশের খবরে খুবই খুশী। তবে তাদের ইচ্ছা এবার চাকরীবাকরী করে সে সংসারের হাল ধরুক এবং বিয়ে থা করে সংসারী হউক। কিন্তু কোটিশ্বরের ইচ্ছা ছেলে আইন পড়ে উকীল হউক। নীলগঞ্জ গ্রামে আজ পর্যন্ত কেউ উকীল হতে পারেনি। এসব ব্যাপারে অবশ্য সবসময় কোটিশ্বরের ইচ্ছাই বজায় থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। বাবার ইচ্ছানুযায়ী মহেশ আইন পড়তে আবার কোলকাতা চলে গেল। গঙ্গাদের ওবাড়ীর ভাইপো প্রসন্নও মহেশের সঙ্গে একই বছরে বি. এ পাশ করেছে। মহেশের যাওয়ার পরেই সেও আইন পড়তে চলে গেল কোলকাতা। দুইবাড়ীর মধ্যে যেমন রেষারেষি তেমনি প্রতিযোগিতা। প্রসন্ন অবশ্য লেখাপড়ায় বরাবরই ভাল। সে ঈশানের মেজছেলে গোঁয়ারগোবিন্দ সেই গজেন্দ্রের পুত্র।

চাকরীবাকরী ব্যাপারে আপত্তি থাকলেও মহেশের বিয়ের ব্যাপারে অবশ্য কোটিশ্বরের গঙ্গাদের সঙ্গে দ্বিমত ছিল না। ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে টুকটুকে বউ আনবেন, নাতিনাতনীর মুখ দেখবেন, এ সাধ তার মোটেই কম ছিল না। কিন্তু গঙ্গারা তিনিবোনের মধ্যে কেউই ছাত্রাবস্থায় বিয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু কোটিশ্বর নাছোড়বান্দা। অনেক বলে কয়ে তিনবোনের সম্মতিআদায় করে তিনি গরীবঘরের লক্ষ্মীমন্ত চেহারার এক কিশোরী মেয়ের সঙ্গে ছাত্রাবস্থায়ই মহেশের বিয়ে দিয়ে দিলেন। বিয়ের পর মহেশ পড়ার জন্য কোলকাতা চলে গেল। নববধূ বাড়ীতেই রইল।

আর্থিক অনটনের কারণে কোটিশ্বর বাড়ীর ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কিছু করে উঠতে পারলেন না। তবে মহেশের আইনপড়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পাশ করে সে ওকালতি শুরু করলে আর্থিক দিয়ে অনেকটা স্বচ্ছলতা আসবে। তখন ধীরে ধীরে বাড়ীতে ইটের কাজ শুরু করা যাবে। অবসর সময়ে কোটিশ্বর স্ত্রী ও শ্যালিকাদের সঙ্গে ভবিষ্যতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে নানান আলোচনা করেন। ভবিষ্যৎ সুখের রঙ্গীন স্বপ্ন দেখেন।

বধূমাতা রাধারানী সন্তানসম্ভবা । এজন্য কোটিশ্বরের মনে আনন্দ আর

ধরে না। কারণ পৌত্রমুখ দেখার ভাগ্য কয়জনের হয়? মনের আনন্দে তিনি নাতির কি নাম রাখবেন। অন্নপ্রাশনে কতলোক খাওয়াবেন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শ্যালিকাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁর এ ধরনের আগাম পরিকল্পনার কথা শুনে শ্যালিকারা হাসাহাসি করে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে কোটিশ্বর তা লক্ষ্য করেন না। নাতি প্রসঙ্গ ছাড়া কোটিশ্বরের মুখে অন্যকথা বড় একটা শোনা যায় না। তাই নব গুণকে ডেকে একদিন বললেন. "দেখ আমার নাতি হলে নাম রাখব 'সৌভাগ্য,' আর নাতনী হলে নাম হবে 'ভাগ্যবতী'। নামগুলো তোমাদের পছন্দ হয়েছেতো?" ভালয় ভালয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে কিনা ঠিক নেই। আর উনি নাম ধাম ঠিক করে বসে আছেন। তাই তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে নব হেসে গড়িয়ে পড়ল। আর গুণ রীতিমত মুখঝামটা দিয়ে বলে উঠল, 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।' ভালোয় ভালোয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পরেতো নামের কথা। মাথাটা দেখছি আপনার একেবারে বিগড়ে গেছে।" কিন্তু কোটিশ্বর ওদের ঠাট্টা তিরস্কার মোটেই গায়ে মাখলেন না। কারণ নাতি যে আসছে সেই আনন্দেই তিনি মশগুল।

গঙ্গাদের খুড়তুতো ভাইদের পরিবারে এখন ধনেজনে লক্ষ্মী যেন উছলে পড়েছে তবু তাদের চেয়ে সবদিক থেকে দুর্বল পরিবার গঙ্গাদের বিষয় আশয়ের প্রতি ওদের লোভের অন্ত নেই। রাজচন্দ্র দলিলপত্র করে তাঁর সম্পত্তির ছয়আনা অংশ ছোট ভাই ঈশানকে দান করেছিলেন। সেই হিসাবে ওরা সম্পত্তির ছয়আনা অংশের মালিক আর গঙ্গারা দশআনার। এইমতই এতদিন ধরে চলে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ করে অর্থ ও দাপটের জোরে ওরা দশআনার মালিক আর গঙ্গারা ছয়আনার এরকম জাল দলিল করে গঙ্গার নামে আদালতে মামলা ঠুকে দিল। এসব চাতুরী গঙ্গারা ঘুণাক্ষরেও আগে জানতে পারেনি। হঠাৎ আদালতের সমন পেয়ে ওরা যেন আকাশ থেকে পড়ল। এই মিথ্যাচারে গঙ্গারা তিনবোনেই রাগে দুঃখে ফেটে পড়ল। এরকম একটা মিথ্যা মামলা যে ওরা সাজাতে পারে তা তারা কল্পনাও করেনি। তবে মামলা যখন শুরু হয়ে গেছে তখনতো মামলা না লড়ে কোন উপায় নেই।

কোটিশ্বর বড়ই নির্বিরোধী মানুষ। এসব উটকো ঝামেলা তাঁর একেবারেই সহ্য হয় না। তবু উপদ্রব ঘাড়ে এসে পড়লে মোকাবেলা না করে তো আর থাকা যায় না। গঙ্গা যতই বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন হউক না কেন বাইরের কাজকর্মতো আর তার পক্ষে করা সম্ভব নয়। তখনকার দিনের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের পক্ষেতো

উকীল মোক্তারের বাড়ী ছুটাছুটি করা কোর্টে হাজিরা দেওয়া, সাক্ষী যোগাড় করা সম্ভব ছিল না। তাই এসব দায় কোটীশ্বরেরই। সহজসরল আমুদে স্বভাবের কোটিশ্বর এই মামলা নিয়ে বড়ই ফ্যাসাদে পড়ে গেলেন।

মামলা শুরু হল। গঙ্গারা মোটেই ঘাবড়ালেন না। কারণ আসল দলিলপত্রতো তাদের হাতেই। জাল দলিল দিয়ে মামলা জিতে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আইনের ঘরে ওদের জালিয়াতী নিশ্চয় ধরা পড়বে। আর জালিয়াতীর সাজা পেলেই ওদের উচিত শিক্ষা হবে। কিন্তু দুর্জন যে ছলেবলে কৌশলে অন্যায়কে ন্যায় ,মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে,ভালমানুষ গঙ্গাদের সে ধারণা ছিল না।

মামলা মোকদ্দমার এই টান টান উত্তেজনার মধ্যেই সংসারে আচমকা ঘটে গেল আর এক বিষম দুর্ঘটনা। সে দিনটায় মামলার তারিখ ছিল। প্রায় সন্ধ্যায় কোর্ট থেকে ফিরে এলেন কোটিশ্বর। তারপর অভ্যাসমত গায়ের চাদরটা খুলে খাটের বাজুতে রাখতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গেলেন ও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালেন। ধরাধরি করে তাকে বিছানায় শোয়ানো হল। ডাক্তার এল। যথাসাধ্য চিকিৎসা ও হল কিন্তু তাঁর আর জ্ঞান ফিরে এল না। তিন দিন তিন রাত অজ্ঞান অবস্থায় থেকে তিনি তার সাধের সংসার রেখে অকালে ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর আর পৌত্রমুখ দেখা হল না, দালান বাড়ী তৈরী করা হল না, ছেলের উকীল হওয়াটাও দেখা হল না। অনেক সাধ আহ্লাদ বুকে নিয়ে, পরিবারকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে মাত্র একান্ন বছর বয়সে তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল।

বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত কোটিশ্বরের এই আকস্মিক মৃত্যুতে গঙ্গার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পডল। একদিকে স্বামীর জন্য শোক অন্যদিকে পারিবারিক অসহায়তা। দুই নাবালক পুত্র আর তিন বিধবা বোনের সংসারে আর কোন পুরুষ অভিভাবক নেই। মহেশ যদিও বড হয়েছে, তবু তার দ্বারা সংসারের কোন উপকার হচ্ছেনা। কাবণ সে তার পডাশুনা নিয়ে আছে সংসার থেকে অনেক দূরে। একমাত্র আশ্রয় ও অভিভাবক ভগ্নীপতিব মৃত্যুতে নব-গুণও যেন বজ্রাহত।

একমাত্র পুরুষ অভিভাবকের মৃত্যুতে সমস্যা সংকুল সংসারে যে অসহায়তার সৃষ্টি হল, তা সামাল দেওয়ার জন্য গঙ্গাকেই দুঃসহ স্বামীশোক বুকে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে হল। মহেশকে অবশ্য বাড়ীতে নিয়ে আসা যেত। কিন্তু

তার আইন পরীক্ষার মাত্র অল্প কয়দিন বাকী আছে। এ সময়ে তার পড়াটা বন্ধ করে দেওয়া মোটেই উচিত হবে না। বিশেষ করে তার উকিল হওয়াটাই তার স্বামীর একান্ত ইচ্ছা ছিল। তাই গঙ্গার যত কষ্ট অসুবিধাই হউক না কেন তবু স্বামীর ইচ্ছা তিনি অপূর্ণ রাখবেন না। শুধু যে সংসারের ঝামেলা তাতো নয়। মাথার উপরে আছে এতবড় এক মামলা, সদ্যবিধবা গঙ্গা চোখে রীতিমত সর্ষেফুল দেখছেন। গ্রামেও যে কারো কাছে এতটুকু সাহায্য পাবেন, সে আশা নেই। গ্রামের লোক মোটামুটি সবাই তাঁর খুড়তুতো ভাইদের পক্ষে, কারণ ধনেজনে প্রভাবে প্রতিপত্তিতে গ্রামের মধ্যে তাদের জয়জয়কার। সবলের পক্ষ অবলম্বন করাই বেশীর ভাগ মানুষের স্বভাব। দুর্বলের পক্ষে ভগবান ছাড়া কেউ থাকে না। শুধু মিথ্যে মোকদ্দমাই নয়। সুযোগ বুঝে জোতজমির আয়ব্যয়ের ব্যাপারেও ওরা কারচুপি শুরু করেছে। সবদিক থেকেই সদ্যবিধবা গঙ্গা যেন অথৈ জলে পড়ে গিয়েছেন।

নব-গুণর সঙ্গে পরামর্শ করে লাভ কিছু হয় না। কারণ ওদের বিষয়বুদ্ধি বড়ই কম। আর বিষয় আশয়ের ব্যাপারে ওরা তেমন মাথা গলাতেও চায় না। সবকিছুতেই ওরা দিদিনির্ভর। তাছাড়া ওরা নিঃসন্তান বিধবা। পৈতৃক সম্পত্তির ভোগসত্ত্বাধিকারীমাত্র। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মূলতঃ গঙ্গা অর্থাৎ তার ছেলেরা। তাই শরীকদের মূল আক্রোশও গঙ্গার উপরেই। ছোটবোন হিসাবে নব-গুণর প্রতি তাদের একটা স্নেহের টান আছে এবং নবগুণ বোনের সঙ্গে না থেকে ওদের সঙ্গে থাকুক, এমন ইচ্ছাও ওরা মাঝে মাঝে প্রকাশ করে। আসলে একমাত্র গঙ্গাই শরীকদের প্রতিদ্বন্দ্বী।

এমন অবস্থায় নিরুপায় গঙ্গামণি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুঝে চলেছেন। গঙ্গামণির বুদ্ধি বিবেচনা যতই থাক তবু তিনি মেয়েমানুষ। বিষয় রক্ষার জন্য সর্বত্র যাওয়া আসা বা কথাবার্তা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। নায়েব গোমস্তাদের দিয়েও সবসময় ঠিকমত কাজ হয় না। তাই উপায়ান্তর না দেখে গঙ্গা কিশোর ছেলে দেবেন্দ্রের পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটিয়ে তাকে বিষয় আশয়ের কাজে জড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হলেন। অলক্ষ্যে দেবেন্দ্রের শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্র সংকুচিত হল। কারণ শতচেষ্টা করলেও বিষয়কর্ম ও বিদ্যাচর্চা দুটো একসঙ্গে হয়ে উঠে না। ব্যাপারটা গুনমণির কাছে মোটেই ভাল ঠেকল না। মহেশ যুবক ছেলে। সে তিনটি পাশ দিয়েছে। যথেষ্ট শিক্ষিত হয়েছে। তারই তো

এখন সংসার দেখা উচিত। কিন্তু তা হচ্ছে না। সংসার রসাতলে গেলেও তার আরও পড়া চাই। আর যে স্কুলের গণ্ডীও ডিঙ্গাতে পারেনি, তার কাঁধে তুলে দেওয়া হল সংসারের জোয়াল। কই শচীন্দ্রওতো আছে। সংসারের প্রয়োজনে তার পড়াশুনায় তো কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়নি। এটা দেবেন্দ্রের প্রতি মেজদিদির বড়ই অবিচার। গুণ যদি কোন কিছু অন্যায় মনে করে তবে সে প্রতিবাদ না করে পারে না। তাই সে একদিন গঙ্গাকে কথাটা স্পষ্ট করেই শুনিয়ে দিল। গুণ বলল, "এ কি করছ তুমি মেজদিদি! দেবুকে যে এভাবে সংসারের কাজে লাগিয়ে দিয়েছ তাতে ওযে স্কুলে যেতে পারছে না, পড়াশুনার সময় পাচ্ছে না, তা কি লক্ষ্য করেছ? এভাবে চললে ওর পড়াশুনার তো এখানেই ইতি হয়ে যাবে।" গঙ্গা একটু অসহায় গলায় বললেন, "লক্ষ্যতো সবই করছি। কিন্তু উপায় কি? একজন কেতো বিষয় আশয় দেখতেই হবে। সবাই যদি পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তবেতো বিষয় আশয় ভেসে যাবে। দু'জনতো পড়াশুনা করছেই। একজনের পড়াশুনা না হয় একটু কমই হল? কি আর করা যাবে।" শুনে রাগে আচ্ছন্ন হয়ে গুণ বলল, "কেন তোমার বড়ছেলেতো যথেষ্ট বিদ্বান হয়েছে। বয়সও হয়েছে, বিয়ে থা করে সংসারী হয়েছে। সন্তানের বাপ হতে চলেছে। তাঁরইতো সংসারের হাল ধরা উচিত। কিন্তু তা নয়। তার পডার আর শেষ নেই। আর যে স্কুলেব সীমানাটা পর্যন্ত ডিঙ্গোতে পাবল না তাব পড়াশুনার ব্যাপারে কোন গুরুত্ব নেই। ওদের প্রতি তোমার এত পক্ষপাতিত্ব আর দেবুর প্রতি তোমার এত অবিচার কেন বুঝি না। সবাইতো তোমার সন্তান। গুণর এই স্পষ্ট সত্য কথায় গঙ্গা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বললেন, "আমি আমার ছেলেদের ভিন্নচোখে দেখি, একথা বলতে পারলি তুই? সন্তানেব মর্ম তুই কি করে বুঝবি? মায়ের কাছে যে সব সন্তান সমান, মা না হয়ে, এটা বোঝার ক্ষমতা তোর কি করে হবে? আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার ছেলেদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার জন্যই তুই উঠে পড়ে লেগেছিস।" কথাটা বলে ফেলেই গঙ্গার সম্বিৎ ফিরল। এমন একটা রূঢ় কথা বলে নিঃসন্তান ছোটবোনকে আঘাত করা তার খুবই অনুচিত হয়েছে। এমনিতে গঙ্গা ধীর স্থির মিত ভাষী। কিন্তু কি করে যে হঠাৎ তার মুখ দিয়ে এমন একটা রূঢ় কথা বেরিযে গেল তিনি নিজেই বুঝে উঠতে পারলেন না। কিন্তু যে কথা একবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে তাতো আর ফিরানো যায় না। রাগের মাথায় ছোটবোনকে এমন একটা মর্মভেদী কথা বলে

গঙ্গা বড়ই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

স্নেহময়ী দিদির মুখ দিয়ে যে এমন একটা কঠিন সত্য কথা বের হতে পারে, গুণ তা ভাবতেই পারেনি। একটু সময় চুপ করে থেকে আঘাতটা সামলে নিয়ে সে বলল, ''তুমি যা বললে তা হাজার বার সত্যি। আমি আঁটকুড়ী মানুষ, সন্তানের মর্ম না বোঝারই কথা। তা মর্ম না বুঝলেও চর্মচক্ষে দেখতে পাই, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মাবাপের ব্যবহার বড়ই পক্ষপাতদুষ্ট। একথা ও হাজারবার সত্যি। আর তোমার মধ্যে এ দোষটা পূরামাত্রায়ই রয়েছে। তুমি মহীশচীকে মাথায় তুলে দেবুকে পায়ের তলায় নামিয়ে আনছ। এর ফলে ভবিষ্যতে দেবুকে ভাইদের অবজ্ঞা অবহেলার শিকার হতেই হবে। অবশ্য তোমার সন্তান, তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আমি বলার কে?'' গঙ্গার আর গুণর কথার উত্তর দেওয়ার সাহস হলনা। পরিস্থিতিটা সহজ করার কোন উপায় না দেখে তিনি সদ্যমৃত স্বামীর নাম করে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। দিদির কান্নায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে দুমদাম পা ফেলে গুণ ঘর ছেড়ে চলে গেল। এরপর দিন দুই দু'বোনের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ রইল। পরে নবদুর্গার মধ্যস্থতায় দু'বোনের মধ্যে একটা মিটমাট হল বটে। তবু গঙ্গার মনে একটা অপরাধ বোধের কাঁটা বিধে রইল। কিন্তু গুণর কথা যে ভবিষ্যতে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হবে সেদিন তিনি তা বুঝতে পারেননি। তাই দেবুকে অবলম্বন করেই তিনি সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করলেন। তবে গুণর কথাটাও যে তার মাথায় ছিল না, এমন নয়। তিনি ভাবলেন, মহেশ এসে পড়লেই তিনি আবার দেবুকে পড়াশুনার সুয়োগ করে দেবেন। পাশ করতে ওর একটু বয়স হয়ে যাবে ঠিকই। তবে এতে আর তেমন কি ক্ষতি হবে। সবদিকতো আর বজায় রাখা যায় না।

গঙ্গার সংসারে ঝামেলাতো আর একটা নয়, মোকদ্দমা চালাতে গিয়ে সংসারে চূড়ান্তভাবে আর্থিক সংকট দেখা দিল। সম্পত্তির যে অংশ নিয়ে মামলা তা গঙ্গার অধিকারে ছিল। কিন্তু মামলা চলাকালীন সে অংশের আয় কোন পক্ষই পাবে না, আদালত এমন নির্দেশ জারি করল। এতে গঙ্গার আয় কমে গেল। আয় কমল,ব্যয় বেড়ে গেল। তাতে ব্যয়সংকুলান বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

চূড়ান্ত আর্থিক সংকটকালে মহেশ এবং ওবাড়ীর প্রসন্ন ওকালতী পাশ করল। প্রসন্ন কোলকাতায়ই ওকালতী শুরু করে দিল। আর পারিবারিক প্রয়োজনে মহেশকে গ্রামে ফিরে আসতে হল। কিন্তু মহেশের পক্ষে জমিজমা দেখা বা মামলার

তদ্বিরতদারক করা তত সম্ভব হল না। আর্থিক সংকট মেটানোর জন্য সে মহকুমা শহরে স্কুল শিক্ষকের চাকরী নিল। কারণ ওকালতীতে পশার জমিয়ে উপার্জন সময়সাপেক্ষ।

মহেশ বাড়ী আসায় সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সংসারের ও মামলামোকদ্দমার দায়িত্ব কিছুটা তার উপর ছেড়ে দিয়ে গঙ্গা দীর্ঘদিন পরে একটু হাল্কা বোধ করলেন। মহেশ খুবই বুদ্ধিমান ও চটপটে। তাই দায়দায়িত্ব তার উপর অনায়াসে ছেড়ে দেওয়া যায়। সবচেয়েবড় কথা বিদ্বান বুদ্ধিমান যুবক ছেলেকে কাছে পেয়ে গঙ্গার মনোবল অনেকটাইবেড়ে গেছে।

কিন্তু স্বস্তি-শান্তি এ পরিবারের ভাগ্যে লেখা নেই। একটা না একটা অঘটন বিঘটন লেগেই থাকে। মহেশ ফিরে আসার অল্প কয়দিন পরেই ঘটে গেল আর এক অঘটন। মহেশের স্ত্রী রাধারানী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়ে ইহলোক থেকে বিদায় নিল। জন্মলগ্নে যে শিশু মাকে হারায় তাকে দুর্ভাগাই বলতে হবে। তাকে কোনক্রমেই ভাগ্যবান বলা চলে না। তবু শিশুটির নাম রাখা হল সৌভাগ্য। কারণ শিশুর পিতামহ কোটিশ্বর ঐ নামটিই নির্বাচন করে গিয়েছেন। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন কোটিশ্বর যখন এই নামের কথা বলেছিলেন, তখন নব-গুণ তাঁকে নিয়ে কি ঠাট্টা তামাসাই না করেছিল। আর আজ চোখের জলে ভেসে তারা নবজাতকের ঐ নামকরণই করল।

তখনকার দিনে বউয়ের মৃত্যুটা পরিবারে দাগ কাটার মত কোন ব্যাপার ছিল না। বউ মরলে আবার বিয়ে করলেই সব মিটে যেত। তাই রাধারানীর মৃত্যুটা পরিবারে একটা বিষয় বলেই গণ্য হল না। মহেশের বয়স কম। সে ছাত্রাবস্থায় রাধারানীকে বিয়ে করেছিল এবং এই কিশোরী স্ত্রীটির প্রতি সে তেমন আকর্ষণও বোধ করেনি। বয়স যোগ্যতা সবদিক থেকে তার জন্য অনেক ভাল পাত্রী পাওয়া যাবে। বরং মাতৃহীন শিশুর লালনপালনের দায়টাই একটা ভাবার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। তবে এ ব্যাপারেও বিশেষ অসুবিধা হল না। গঙ্গারা তিন বোন মিলে শিশুর লালন পালন করতে লাগলেন। পাত্র হিসাবে মহেশ খুবই লোভনীয়। সে সুদর্শন, বিদ্বান,বুদ্ধিমান, উকীল এবং এক সন্তানের জনক হলেও বয়সে নবীন। তাই রাধুর মৃত্যুর পর হু হু করে বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল। এরমধ্যে একজন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ধনী জমিদার তার একমাত্র কন্যার সঙ্গে মহেশের বিয়ে দিতে গঙ্গাকে ধরে বসলেন। এত বড় ঘরে সম্বন্ধ করতে গঙ্গার

একটু ইতস্ততঃ ছিল। কিন্তু নব-গুণর এ সম্বন্ধ খুবই পছন্দ। তারা গঙ্গাকে বুঝাল যে পারিবারিক এই পরিস্থিতিতে এমন একজন প্রভাবশালী লোক আত্মীয় হলে পরিবারের একটা সহায় হবে। আর কিছু না হউক বিপদে আপদে অন্ততঃ একটা বুদ্ধি পরামর্শতো পাওয়া যাবে। বোনেদের কথাটা গঙ্গারও মনে ধরল।তাই ওখানেই মহেশের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল। জমিদার হেরম্ব চক্রবর্ত্তী বিপুল দানসামগ্রীসহ মহেশের হাতে কন্যা সম্প্রদান করলেন।

নববধূ সরযূবালা রাধারানীর মত রোগাপাতলা নয়, তার মত এতটা ফর্সাও নয়। তার গোলগাল চেহারা, শ্যামলা রং। বয়সটাও একটু বেশীই। বড়লোকের আদরের মেয়ে সরযূ এক গ্লাস জল গড়িয়ে ও খেতে জানে না। জল গড়িয়ে খাওয়ার ইচ্ছেও তার নেই। বড়ই অলস প্রকৃতির মেয়ে সে। তবে স্বভাবটা নম্রই। মুখের উপর কথা বলে না, শাশুড়ীদের প্রতি মান্য মানতাও আছে। শ্বশুর বাড়ীতে অবশ্য সে বড় একটা থাকে না। বাপ এসে যখন তখন মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে যান, আর জামাইকেও শ্বশুরবাড়ী যেতে আমন্ত্রণ জানিয়ে যান। বলা বাহুল্য মহেশ কোনদিন সে আমন্ত্রন উপেক্ষা করে না। নববিবাহিতা স্ত্রী ও ধনী শ্বশুরবাড়ীর প্রতি তার আকর্ষণটা এত বেশী যে বাড়ীর দায়দায়িত্ব সে মোটামুটি এড়িয়েই চলে। হেরম্ববাবুরও শুধু মেয়ে-জামাইয়ের সুখসুবিধাও উন্নতির দিকেই লক্ষ্য। আত্মীয়তার সুখ সুবিধা যা গঙ্গারা আশা করেছিলেন তা পূরণ হল না। বরং নিজের ছেলেই অনেকটা হাতছাড়া হয়ে গেল।

বড়লোক শ্বশুরের পরামর্শে মহেশ কোলকাতা গিয়ে ওকালতী শুরু করল এবং সরযূকে নিয়ে গিয়ে নূতন সংসার পাতল। ফলে সংসারে তার তেমন সাহায্য পাওয়ার আর সুযোগ রইল না। নূতন সংসারের ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে বাড়ীতে টাকাপয়সা পাঠানো ও তার পক্ষে সম্ভব হল না। তবে পড়াশুনার সুবিধে হবে বলে সে শচীন্দ্রকে তার সঙ্গে কোলকাতা নিয়ে গেল। শচীন্দ্র মেধাবী ছাত্র। এজন্য তার প্রতি মহেশের একটা বিশেষ দৃষ্টি আছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে তার নিজের ছেলে সৌভাগ্যের প্রতি সে একান্তই উদাসীন। যাবার সময়ও সে সৌভাগ্যের কোন খোঁজখবর নিল না। তাই সৌভাগ্য বাড়ীতে ঠাকুরমাদের কাছে যেমন তেমনভাবে প্রতিপালিত হতে থাকল। সৌভাগ্য নামেই শুধু সৌভাগ্য! মূলতঃ তার মত মন্দ ভাগ্য খুব কমই আছে। জন্মলগ্নে সে মাতৃহীন। পিতার স্নেহ থেকে ও বঞ্চিত। মহেশের কাছে পুত্র বঞ্চিত, কনিষ্ঠ ভ্রাতা তার স্নেহধন্য আর

মধ্যম ভ্রাতা উপেক্ষিত ,বিদ্বান মহেশের দৃষ্টিভঙ্গিতে সাম্যের একান্ত অভাব।

মহেশ যতদিন বাড়ীতে ছিল তখন সবদিকেই সুবিধে ছিল। মহেশ সংসারের হাল ধরায় দেবেন্দ্রও পড়াটা চালিয়ে নেবার একটা সুযোগ করে নিয়েছিল। এবার সে এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থী, মহেশ কোলকাতা চলে গেছে, দেবেন্দ্রের পরীক্ষা. সংসার দেখার মত কেউ নেই। তাই বিষয় আশয়, ও মামলা মোকদ্দমা নিয়ে গঙ্গামণি বড়ই অসুবিধায়পড়ে গেলেন। চিঠির মারফত এসব অসুবিধাগুলো জানতে পেরে মহেশ মাকে লিখল," দেবুর এবার পরীক্ষা দেবার দরকার নেই। পরীক্ষার চেয়ে বিষয় আশয় দেখা অনেক বড় কর্তব্য। একজনকেতো বিষয় আশয় দেখতেই হবে। সবাই যদি পড়াশুনা নিয়ে থাকে, তবেতো বিষয়সম্পত্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে। তবে ওর যদি পরীক্ষা দেওয়ার একান্ত ইচ্ছে থাকে তবে সময় সুযোগমত আমিই ওকে পড়িয়ে শুনিয়ে প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। কাজেই দেবু যেন পরীক্ষার ধান্দা ছেড়ে দিয়ে সংসারের যাবতীয় বিষয় দেখাশোনা করে। তাহলে আর কোন সমস্যা থাকবে না।" মহেশের সবকথাতেই গঙ্গার গভীর আস্থা। তাই মূহুর্তে দেবুর পরীক্ষা সংক্রান্ত সব দ্বিধা তিনি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন। নব-গুণর উপস্থিতিতে দেবেন্দ্রকে ডেকে বললেন," দেখছিসতো দেবু, সংসারটাতো আর চলছেনা, তোর দাদা পরীক্ষার ধান্দা ছেড়ে দিয়ে তোকে সংসার দেখতে লিখেছে। আর আমিও বলছি পরীক্ষার চেয়ে বিষয় আশয় দেখা অনেক বড় কাজ। কাজেই এবার আর পরীক্ষা দেওয়ার দরকার নেই। ভালভাবে বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা কর। তাছাড়া তোর দাদা আরও লিখেছে যে, তোর যদি একান্ত পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছে থাকে তবে সে সময় সুযোগমত তোকে প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে। পরীক্ষা আর বিষয়আশযের তদারক দুটোতো আর একসঙ্গে করা যায় না। তাই পরীক্ষাটা এবার স্থগিতই থাক। এতে তুই মন খারাপ করিস না।" এসব কথাবার্তায় নব-গুণ কোন মন্তব্য করল না। শুধু তেড়িয়া স্বভাবের গুণ নিজের কপাল চাপড়াল। এতে গঙ্গা মনে মনে খুবই বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বললেন না। কারণ সেদিনের ঘটনার পর গঙ্গার গুণকে ঘাঁটানোর সাহস হয় না। নিঃসন্তান বিধবা ছোটবোনকে মর্মে আঘাত করার অপরাধটা গঙ্গার মনে আজও কাঁটার মত বিঁধে আছে।

দেবেন্দ্র প্রতিবাদী নয়। তাই দাদার সিদ্ধান্ত ও তাতে মায়ের সমর্থনে তার মনে বড়ই আঘাত লাগল। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করল না। দেবেন্দ্র ভাইদের মধ্যে

রূপে শ্রেষ্ঠ,স্বভাবে শান্ত,কর্মকুশল ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন, সংসারে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবকিছুই দেবেন্দ্রকে দিয়ে সুচারূপে সম্পন্ন করানো যায়। এহেন একটি ছেলে যদি আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে তবে পরিবার পরিজনের সুখ সুবিধার ব্যতয় ঘটে তাই সর্বসন্মতিক্রমে তার জীবন অন্যদের সুখসুবিধার জন্য উৎসর্গীকৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আত্মজন যাকে নীচে রাখতে চায় হাজার চেষ্টা করেও সে আর উপরে উঠতে পারে না। এটা বাস্তব সত্য। দেবেন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই হল। মনের কষ্ট মনে চেপে রেখে দেবেন্দ্র আবার সংসারের জোয়াল কাঁধে তুলে নিল।

চুপ করে থাকলেও গুণ মনে মনে এই অন্যায়টা বরদাস্ত করতে পারছিল না। তাই আড়ালে নবকে বলল," দেখলিতো নব, মেজদিদির একচোখামিটা, বড়ছেলে,ছোটছেলে হল মাথার মণি আর মেজছেলে হল গিয়ে পায়ের তলার ধূলি।" নব বলল, "এসব তুমি আমি বলে কি করব? বলতে গিয়ে সেদিন যে অপমানটা হল তাকি ভুলে গেলে নাকি? মেজদিদির ছেলেত সবাই। কাকে রাখবে ,কাকে মারবে সে মেজদিদি বুঝবে। ভগবান যখন আমাদের সন্তানের মুখ দেখতে দেননি তখন এসব ব্যাপারে আমাদের ভালমন্দ বলার কোন অধিকার নেই । তুমি শুধু শুধু সব কথাতেই কথা বলে কেন যে আঘাত অপমান কুড়িয়ে আন বুঝি না।" গুণ বলল, " সে তুই ঠিকই বলেছিস। তবে ব্যাপারটা কি জানিস অন্যায়টা অমার মোটেই সহ্য হয় না। তাই বলে ফেলি। তবে সেদিনের ঘটনায় আমার চেয়ে আসলে মেজদিদিরই অপমান হয়েছে বেশী। ছোট কথা বলে সে নিজের কাছেই ছোট হয়ে গেছে।" নব বলল, "একথা ঠিক। বেফাঁস কথাটা বলে ফেলে মেজদিদি খুবই কষ্ট পেয়েছে। তাই ওর ছেলেদের সম্বন্ধে কথা বলে আর ঝগড়াবিবাদ বাঁধিওনা। কারণ তোমার কথায় কিছুই হবে না। ওর ছেলেদের যার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। আমাদের শুধু দেখে যাওয়া ছাড়া করার কিছু নেই।"

নিদারুণ অভিমান বুকে নিয়ে দেবেন্দ্র মা ও দাদার সিদ্ধান্ত মেনে নিল। তার পরীক্ষার মাত্র দুইমাস বাকী আছে। পরীক্ষা দিলে সে অন্ততঃ দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করতই। কিন্তু মা ও দাদা তা হতে দিল না। দাদা নূতন বউঠানকে নিয়ে বেশ বিলাসবহুল জীবনই যাপন করছে আর শচীন্দ্রও খুব আরামে আয়াসে থেকে ভাল স্কুলে পড়ছে। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য দাদার যত্নের অন্ত নেই। আর

সেই দাদা দেবেন্দ্রের জন্য সংসারের ঘানি টানার ফরমান জারী করেছে এবং মাও নির্বিচারে তা মেনে নিয়েছেন। সংসারে সবারই যখন তাকে দাবিয়ে রাখার ইচ্ছে তখন তাকে দশের ইচ্ছার বোঝাটা মাথায় তুলে নিতেই হবে। এই তার ভাগ্য। আর দাদার কথায় প্রাইভেট পরীক্ষা সে কখনও দেবে না। সে ভালই বুঝেছে যে তার পড়াশোনার ক্ষেত্রে ইতির রেখা টানা হয়ে গেছে। দাদার এই প্রাইভেট পরীক্ষা ইত্যাদি স্তোকবাক্য ছাড়াআর কিছুই নয়। সবচেয়ে অবাক হয় দেবেন্দ্র মায়ের বৈষম্যমূলক আচরণে। দাদাকে সন্তুষ্ট রাখতে মায়ের চেষ্টার অন্ত নেই, শচীন্দ্রের যত্নেরও অন্ত নেই। শচী যেন গোবরে এক পদ্মফুল। এই পদ্মের পরিচর্যায় মা সদা ব্যস্ত। আর দেবেন্দ্র হল কলুর বলদ। সে সংসারের ঘানি টানবে। মা যে সন্তানকে যেভাবে গড়তে চান সে তাই হয়। মায়ের আচরণের মধ্যেইদেবেন্দ্র তার ভাগ্যে কি আছে তা পাঠ করে নিয়েছে। তবে সে যে এভাবে চিন্তা করে তা কিন্তু মা আদৌ বুঝতে পারেন না। সে কাজের ছেলে। সংসার ধরে রাখতে জানে। তাতেই মা খুশী। কিন্তু তারও যে একটা মন আছে, বিচার বিবেচনা আছে সে ব্যাপারে মা একেবারে অন্ধ। তবে এসব বুঝতে পারে একজন। সে হল সেজমাসী। ছোটমাসীও যে একেবারে বোঝেনা তা নয়। বুঝলেও ছোটমাসী এসব নিয়ে কখনও কোন কথা বলে না। কিন্তু স্পষ্টভাষী সেজমাসী দেবুর প্রতি মায়ের অবিচারগুলোর জন্য মাঝে মধ্যে প্রতিবাদ করে। কিন্তু মায়ের মনের পরিবর্তন হয় না। দু'বোনের মধ্যে ঝগড়াবিবাদই সার হয়। মায়ের মনে তার স্থান না থাকলেও মাসীদের মনে যে তার জন্য একটা বিরাট স্নেহের ভাণ্ডার জমে আছে এটাই তার এক পরম পাওয়া। ঈশ্বর একদিকে বঞ্চিত করলেও অন্যদিকে কিছু দেন। নইলে মানুষ টিঁকে থাকতে পারত না।

মাত্র ষোল বছর বয়সে দেবেন্দ্র পাকাপাকিভাবে একটা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ বিরাট সংসারের দায়ভার মাথায় তুলে নিল। বয়স কম হলেও বিষয়বুদ্ধি তার খুবই পাকা এই অল্প বয়সেই সে পরিণত বয়স্ক প্রভাবশালী মামা ও মামাতো ভাইদের সঙ্গে বিষয় আশয়ের ব্যাপারে, মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে সমান তালে পাল্লা দিতে পারে। পরম রূপবান বিনয় নম্র এই কিশোর ছেলেটির বিষয়বুদ্ধি দেখে মামারা আশ্চর্য হন। তাদের অন্তরে তার প্রতি স্নেহ জাগে। অনেক সময় তাকে কাছে ডেকে কথাও বলেন। আসলে তাদের মূল আক্রোশ গঙ্গা ও মহেশের উপর। অন্য কারোপ্রতি তাদের কোন আক্রোশ নেই। বরং স্নেহই আছে।

সম্পত্তির আয়ের পাইপয়সা যাতে এদিক ওদিক না হয়, এজন্য দেবেন্দ্রের চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু যথেষ্ট হিসাব নিকাশ করে চললেও আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয় না। কারণ মোকদ্দমার খরচ অঢেল। সম্বলতো শুধু সম্পত্তির আয়। দাদাতো এখন বাড়ীতে টাকাপয়সা দিতেই পারে না। খরচ চালাতে দেবেন্দ্র হিমসিম খায়। এ নিয়ে মা ছেলেতে পরামর্শ হয়। অনেক সময় মাসীরাও আর্থিক সমস্যার সুরাহা নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু সুরাহা হয় না। শেষ পর্যন্ত দৈনন্দিন খরচে টান পড়ে।

দৈনন্দিন খরচে টান পড়লেও খুব কষে টান দেওয়া সম্ভব হয় না। পৈতৃক আমলের ঠাটবাট কিছুটা বজায় রাখতেই হয়। নইলে মান থাকেনা। তাছাড়া আত্মীয়স্বজনদের আসাযাওয়া ও থাকার বিরাম নেই। এতেও যথেষ্ট খরচ হয়। বিশেষ করে গঙ্গার বড় মেয়ে তরঙ্গিনী ও তৃতীয় মেয়ে ক্ষীরোদাকে আংশিক প্রতিপালন করতে হয়। তরঙ্গিনী যেমন অলস তার স্বামীও তদ্রপ । তরুর স্বামী কাজকর্ম ও করে না জমিজিরেতও নেই। তাই তিনমেয়েও স্বামীসহ তরঙ্গিনী দিব্যি আরামে আয়াসে বাপের বাড়ীতে প্রায়ই আস্থানা গেঁড়ে বসে। আর ক্ষীরোদার স্বামীটা অমানুষ,উচ্ছৃঙ্খল। পৈতৃক সম্পত্তি তার বড় কম নয়। কিন্তু সে স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণ করেনা। সে সুরাপায়ী, অন্য নারীতে আসক্ত। পৈত্রি ক সম্পত্তি একটু একটু করে বিক্রী করে সে তার নেশার যোগান দিয়ে চলেছে। ক্ষীরোদা প্রতিবাদ করলে তাকে নিগৃহীত হতে হয়। তবু ক্ষীরোদা স্বামীর মতিগতি ফেরানোর চেষ্টায় শ্বশুর বাড়ীতেই পড়ে আছে। বটে, কিন্তু সেখানে তার অন্নবস্ত্রের সংস্থান নেই। তাই ক্ষীরোদাকে নিয়মিত কিছু টাকা পাঠাতেই হয়। এসব উটকো ঝামেলার জন্য সংসার খরচটা কমানোর বিশেষ সুবিধে হয়না। তাই গঙ্গামণি শেষ পর্যন্ত ঋনগ্রহণের চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন।

নবদুর্গার এখন বয়স হয়েছে। সেই কৈশোর বয়স থেকেই তিনি এতবড় সংসারের হাঁড়ি ঠেলে যাচ্ছেন। একদিনের জন্যও বিরাম নেই। তার নিজের বলতে তো কেউ নেই। এই জগদ্দল সংসার মূলতঃ মেজদিদির। অথচ ঠেলতে হচ্ছে নবদুর্গার। সেজদিদিতো কখনও হেঁশেলের ছায়া মাড়ায় না। খাবার সময় ভালমন্দটা চেয়ে চিন্তে খেয়ে দেয়ে চলে যায়। এতে কেউ কিছু মনে করে না। কারণ এটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। মেজদিদিও কোনদিন রান্না করেন না। অবশ্য তার সময়ই বা কোথায় ? তার মাথার উপরে সংসারের সবরকম দায়দায়িত্ব। তবু সময় পেলে

মেজদিদি যে রান্নাঘরে আসেন না তা নয়। আনাজ তরকারী কুটে,এবং প্রয়োজন মত এটা সেটা করে নবকে সাহায্য করেন। তার পক্ষে অবশ্য এটুকুই যথেষ্ট। এরবেশী করার সময় তার নেই।

আর মহেশের বউতো নড়েমাছি মারতে পারে না। কোলকাতার সংসারও চালাতে হয় বাপের বাড়ীর পোষ্য মাসীপিসীর। আর মেজদিদির বড়মেয়ে তরঙ্গিনীতো কুটোগাছিটিও দু'ভাগ করে না। দিব্যি স্বামী সন্তান নিয়ে তৈরী ভাত খেয়ে যাচ্ছে। হায়ালজ্জা বলতে তার কিছু নেই। আবার নিরামিষে খুব অরুচি। এজন্য মায়ের কাছে প্রায়ই ঘ্যানর ঘ্যানর করে। তার নির্লজ্জ আলসেমিটা গঙ্গার মোটেই সহ্য হয় না। কিন্তু কেঁদে কেটে একশা করবে বলে কিছু বলতেও পারেন না। তাই তার মাছের ঘ্যানরঘ্যানর শুনে তিনি একটা সুযোগ পেলেন। বললেন,"তা নিরামিষ খাচ্ছিস কেন? আমার আমিষ হেঁশেলতো পড়েই রয়েছে। এখনই ঘরদোর পরিস্কার করিয়ে দিচ্ছি। বাজার থেকে মাছ আনিয়ে দিচ্ছি। তুই মাছটা রান্না করলে তোদের যেমন খাওয়াটা ভাল হবে তেমনি বাড়ীর কাজের লোকগুলোও একটু মাছ খেতে পাবে। আর নবর রান্নার চাপটাও একটু কমবে। একজনের পক্ষে রোজ এতগুলো লোকের রান্না বান্না করাতো চাট্টিখানি কথা নয়। ওরতো বয়সও হয়েছে। এখন থেকে নব শুধু আমাদের তিন বোনের জন্য রান্না করবে। আর আমিষ হেঁশেলে তুই অন্য সবার রান্নাটা করবি।" কথাগুলো বলে গঙ্গা এতটুকু দেরী না করে আমিষ হেঁশেলে রান্নার সবরকম ব্যবস্থা করে ফেললেন। অগত্যা তরঙ্গকে আমিষ হেঁশেলে ঢুকতেই হল। দিন সাতেক সে কোনমতে চালিয়ে নিল বটে,কিন্তু বড়ই হাঁপিয়ে উঠল। তারপর লজ্জার মাথা খেয়ে বলল,"ছোটমাসী আমি আর পেরে উঠছি না। আর আমার রান্নাও ভাল না। আমার মাছ রান্নার চেয়ে তোমার নিরামিষ রান্না অনেক ভাল। তাই মাকে বলে দিও আর যেন মাছ না আনায়। আমরা আগের মত নিরামিষই খাব।"যথারীত এতগুলো লোকের অন্ন যোগাবার দায় আগের মতই নবদুর্গার ঘাড়েই রইল। কিন্তু নবর শরীর আর বইছে না। তবু তাকে করে যেতেই হবে। পিছুটানহীন বিধবা যে জীবনভোর সংসারের ঘানি টানবে এটাই স্বাভাবিক। সংসারের কাজের চাকায় তাকে পিষে ফেলাই বোধ হয় সংসারের নিয়ম। নবর বেলায়ও তাই হচ্ছে। অবশ্য মাঝে মধ্যে এর ব্যতিক্রমও যে হয় না তা নয়। যেমন সেজদিদি। সেও নিঃসন্তান বিধবা। কিন্তু সংসারের কাজের চাকাটা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

দিব্যি ঘুরেফিরে দিন কাটায় সেজদিদি। নবর ভাগ্যই খারাপ। কিন্তু তার শরীর চলে না আর। এতগুলো লোকের অন্নজল যোগানোতো সহজ কথা নয়। দেহমনে নবদুর্গা হাঁপিয়ে উঠেছেন।

নবদুর্গার কাজের চাপটা গঙ্গামণির ও নজর এড়ায়না। কিন্তু হেঁশেল থেকে নবকে সরিয়ে আনার কোন ব্যবস্থা করতে পারছেন না। বালবিধবা নবকে তিনি কাজে ব্যাপৃত করেছিলেন, ঠিক কাজের জন্য নয়, তার ব্যর্থ জীবনকে খানিকটা ভুলে থাকার জন্য। কিন্তু এখনতো আর তার দরকার নেই। নবদুর্গার এখন বয়স হয়েছে। ব্যর্থতার সঙ্গে সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। এখন বিশ্রাম তার বড়ই দরকার। কিন্তু সংসারের লোকগুলো এমন যে কেউই হেঁশেলে ঢুকতে চায় না। আশ্চর্য, নব কি এ সংসারের রাঁধুনী? গঙ্গার খুব রাগ হয়। রাগটা বেশীর ভাগই বড়মেয়ে তরঙ্গিনীর উপর। পাঁচপাঁচটা লোক বসে বসে তিনবেলা খাচ্ছিস হেঁশেল সামলালেওতো তার কিছুটা উসুল হয়। চক্ষুলজ্জা বলতেও একটা জিনিষ আছে। যেমন মেয়ে তেমনি জামাই। হায়ালজ্জার লেশমাত্র নেই। আবার একটা কিছু বললেই কেঁদে কেটে তরঙ্গ তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে দেয়। ওদের নিয়ে যে কি ব্যবস্থা করা যায় সেটাও একটা ভাবনার বিষয়। গঙ্গার সবচেয়ে রাগ হয় নবকে নিয়ে। নব কেন ওদের রেঁধেবেড়ে খাওয়াবে। নবকে গঙ্গা তরঙ্গিনীর চেয়ে অনেক বেশী স্নেহ করেন। তাই নবর এত খাটাখাটুনী তার সহ্য হয় না। অথচ প্রতিকারও কিছু করতে পারছেন না। নব-গুণ দুজনেই অনেক সময় তাকে ভুল বুঝে মনে অভিমান পোষণ করে। গঙ্গা তা বুঝতে পারলেও মনে কিছু করেন না। ওদের দুঃখের জীবন। তিনি ছাড়া ওরা রাগ অভিমানই কার সঙ্গে করবে? গঙ্গা মনে মনে ছোট দু'টি বোনকে বড়ই স্নেহ করেন। বিশেষ করে নবদুর্গা তার হৃদয় জুড়ে রয়েছে।

সংসারের ভিতরে বাইরে যখন এমনি বিশংখলা, তখন গঙ্গার দ্বিতীয় মেয়ে লবঙ্গ এল বাপের বাড়ীতে। লবঙ্গ সুন্দরী সুখী এবং স্বচ্ছল পরিবারের বউ। কিন্তু খুবই করিতকর্মা। তবে সে বড়ই মেজাজী। নিজের মতামতের প্রাধান্য না পেলে খুবই রেগে যায়। ছোটমাসীর কাজের চাপ এবং বড়দিদি তরঙ্গের কুঁড়েমি দেখে তার দুঃখরাগ দুইই হল। লবঙ্গ খুবই চটপটে। যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সে মোটেই দেরী করে না। তাই মাকে পরামর্শ দিয়ে বলল, "এভাবে বড়দিদির সংসার তুমি কতদিন টানবে মা! এর চেয়ে এককালীন কিছু দিয়ে থুয়ে ওদের

আলাদা করে দাও। নিজেদের সংসার যেমন পারে নিজেরা দেখুক। এখানে কুঁড়ের বাদশা হয়ে বসে থাকবে আর ছোটমাসী সারাজীবন ওদের ভাত রাঁধবে তা কি করে হয়। একটু দূরে ওদের একটা বাড়ী করে দিয়ে ওদের সরিয়ে দাও। বাড়ী করতে এককালীন তোমার কিছু বেশী খরচ হলেও আখেরে তোমার লাভই হবে। এখন ছোটমাসী করে যাচ্ছে। পরে যখন বউরা আসবে তখন দেখবে কুরুক্ষেত্র বেঁধে গেছে। তাই বলছি আগে থেকেই ব্যবস্থাটা করে ফেল।'' লবঙ্গ কথাটা মন্দ বলেনি। গঙ্গাও এরকমই ভাবছিলেন। গঙ্গাদের পৈতৃক বাড়ীর একটু দূরে গঙ্গাদের মা হৈমবতীর নামে পাঁচকাঠা জমি ছিল। গঙ্গা ঐ জমিতে ঘর করে তরঙ্গিনীকে লিখে পড়ে দিয়ে দিলেন। বাড়ী পেয়ে ওরা আনন্দের সঙ্গেই নূতন বাড়ীতে চলে গেল। তবে এটা ওটা সাহায্য সবসময়ই ওদের করতে হত। তবু ওরা যে ওদের মত করে থাকছে তাতেই স্বস্তি। নূতন বাড়ীতেও তরঙ্গ তার কুঁড়েমি বজায় রেখেছে। নয় বছরের বড়মেয়ে সুশীলাকে সে সংসারের কাজের চাকায় জুড়ে দিয়েছে। ছোট অমলা কমলাকে দিয়েও যথাসম্ভব ফাইফরমাস খাটায়। তরঙ্গ গতর বাঁচাতে জানে।

তরঙ্গিনীরা চলে গেলেও ঘরকন্নার কাজের সমস্যার পূরোপূরি সমাধান হল না। লবঙ্গ সমস্যা জীইয়ে রাখতে পছন্দ করে না। একটা না একটা সমাধান সে খুঁজে বার করবেই। ভাবতে ভাবতে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। দেবেন্দ্রতো এখন সংসার দেখাশোনা করছে। তার পড়াশুনারতো ইতি হয়ে গেছে। সংসার দেখাশোনার জন্য সে বাড়ীতেই আছে এবং থাকবে। একটু বড়সড় মেয়ে দেখে ওর যদি একটা বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায়, তবে ছোটমাসী ঘরকন্নার কাজ থেকে অনেকটা রেহাই পেতে পারেন।

শ্বশুর বাড়ী ও বাপের বাড়ী এই উভয় সংসারেই খরতর স্বভাবের লবঙ্গের যথেষ্ট প্রভাব। তার কথা কেউই ঠেলতে পারে না। তাই লবঙ্গ যখন মা মাসীদের কাছে তার পরিকল্পনা পেশ করল, তখন কেউই তার প্রস্তাব নাকচ করে দিতে পারলেন না। কারণ লবঙ্গ বলে কথা। বুদ্ধি বিবেচনায় গঙ্গামণির পরেই লবঙ্গের স্থান। এটা সর্বজন স্বীকৃত। তবে লবঙ্গের মতে সায় দিতে গিয়ে একটাই সমস্যা দেখা দিল যে দেবেন্দ্রের বয়স বড়ই কম। সে এখন মোটে সতেরো বছরে পা দিয়েছে। এই বয়সে বিয়ে দিতে হলে বালিকা বয়সের মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দিতে, হবে। তাতে ঘরকন্নার কাজের কোন সুরাহা হবে না। উল্টে ঐ কচি বউটাকে

লালন পালন করে বড় করে তুলতে হবে। অল্পবয়সী ছেলের সঙ্গেতো আর কাজকর্ম করতে পারে এমন বড়সড় মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় না। সমস্যা সমাধানে লবঙ্গ যেমন তৎপর তেমনি স্পষ্ট ভাষী। সে বলল, "আসলে ওরতো বিয়ের বয়স বা সংসারের দায়িত্ব নেওয়ার বয়স কোনটাই হয়নি। পরীক্ষাটা দেওয়ার সুযোগ পেলে দেবুতো এখন কলেজে ভর্তি হতে পারত। কিন্তু তাতো হয়নি। পড়াশুনো ছাড়িয়ে ওর কাঁধে সংসারের জোয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে। সত্যি বলতে কি দাদা ও শচীর বেলায় হলে তুমি এটা করতে না মা। বাবার মৃত্যুর পর এত বিপদ আপদের মধ্যেও তুমি দাদার আইন পড়া বন্ধ করে দাওনি। দেবু নেহাৎ বাধ্য ছেলে বলে ওর জীবনের উন্নতির পথ বন্ধ করে দিয়ে তুমি তাকে সংসারের হালে জুড়ে দিয়েছ। দাদা বা শচীর বেলায় তুমি তা পারতেও না করতেও না। আর এখন ওর বিয়ের যে কথাটা হচ্ছে তাও সংসারেরই প্রয়োজনে। তাই বেশী বয়সের মেয়ে ওর সঙ্গে মানাবে কি মানাবে না এ প্রশ্ন অবান্তর। আসলে এমন কতগুলো মানুষ জন্মায় যাদের ভাগ্যে নিজের বলতে কিছু লেখা থাকে না। পরের চাহিদা পূরণের জন্যই ওরা পৃথিবীতে আসে। আমাদের পরিবারে ছোটমাসী ও দেবু এমনি ভাগ্য করে এসেছে। আমি কথাটা স্পষ্ট করে বলে ফেললাম বলে তুমি যদি কিছু মনে কর মা, তবে আমার কিছু করার নেই। পড়াশুনাই যার সংসারের জন্য বন্ধ হয়ে গেল তার আবার বিয়ের পাত্রী নিয়ে ভাবনা। এসব আদিখ্যেতা আমার মোটেই পছন্দ হয় না।"

দেবু সম্পর্কে এ ধরনের কথা গুণও বলেছিল বটে, আর তিনি তাতে কোমর বেঁধে গুণর সঙ্গে ঝগড়া করেছেন। কিন্তু গুণর সঙ্গে যা করা যায়, লবঙ্গর সঙ্গে তা পারা যায় না। লবঙ্গর কথাবার্তা এত স্পষ্ট আর জোরালো যার প্রতিবাদ করা যায় না। তাছাড়া লবঙ্গর ব্যক্তিত্ব ও ভাগ্যের জোরও নেহাৎ ফেলনা নয়। কাজেই গুণ আর লবঙ্গের কথায় তফাৎ আছে। তাই গঙ্গার চোখে জল এসে গেল। বললেন, "মনে করব কেন? মিথ্যেতো আর কিছু বলিসনি। তবে আমি নিরুপায় হয়েই পড়াছাড়িয়ে দেবুকে সম্পত্তি রক্ষার কাজে লাগিয়েছি। নইলে বিষয় আশয় বিনষ্ট হয়ে যাবে। দেবী দুর্গার দৈবনির্দেশে ওরা তিন ভাই আমার বাবার সম্পত্তির মালিক। কাজেই এ সম্পত্তিতো ওদের রক্ষা করতেই হবে।" লবঙ্গ রীতিমত মুখঝামটা দিয়ে বলে উঠল।" তিন ভাই যখন মালিক তখন দেবু একা সম্পত্তির দেখভাল করবে কেন? ওদেরওতো করা উচিত। বিশেষ করে

দাদারই করা উচিত। কারণ তোমার বড়ছেলের মুখ দেখেই তোমার বাবা শান্তিতে স্বর্গে গেছেন।" মা মেয়ের এই বাদবিতন্ডায় নব গুণ দু'বোনই মনে মনে খুব খুশী হলেন, খুব উচিত কথা স্পষ্ট করে দিদিকে শুনিয়ে দিয়েছে লবঙ্গ।

একটু সময় চুপ করে থেকে লবঙ্গই আবার কথা বলল, "এসব ধানাই পানাই কথা ছেড়ে দিয়ে আসল কথাটা বলে ফেল মা। বিয়েটা তোমরা দেবে কিনা। যদি মত সাব্যস্ত কর, তবে আমার হাতে ভাল মেয়ে আছে। এতক্ষণে গুণমণিও নবদুর্গা মুখ খুললেন। বললেন, ভাল মেয়ে আছে এ কেমন কথা হল? কার মেয়ে কেমন মেয়েসব কিছু খুলে বলবিতো। তার পরতো মতামতের কথা।" উত্তপ্ত পরিবেশ নিমেষে ঠান্ডা হয়ে গেল। লবঙ্গ খুঁটিয়ে পাত্রীর বর্ণনা শুরু করল। বলল, "মেয়ে বেশী দূরের নয়। ঐ তালতলা গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় কাব্যতীর্থের মেয়ে। যেমন সুন্দরী তেমনি গৃহকর্মে নিপণা। আবার লেখাপড়াও জানে। তবে বয়সটা বেশ একটু বেশীই হয়ে গেছে। ওর মা বলেন বছর চৌদ্দ। কিন্তু মনে হয় পনেরো ষোলই হবে। তা তোমাদের সংসারেতো এমন বড়সড় মেয়েই দরকার। সংসারের কাজকর্ম চালাতে পারবে।" লবঙ্গর কথার মাঝখানেই গুণমণি বলে উঠলেন, "এত বয়স পর্যন্ততো কেউমেয়ে ঘরে রাখেনা। গোলমাল আছে নাকি মেয়ের মধ্যে কিছু?" লবঙ্গ আবার উষ্ণ হল। বলল, "তোমার বড় সন্দেহ বাতিকগো সেজমাসী। কেন বয়স হল সেকথাতো বলছি।" মৃত্যুঞ্জয় কাব্যতীর্থতো এখন বেঁচে নেই। তিনি স্কুলের পন্ডিত ছিলেন এবং একটু অন্যধাঁচের মানুষ ছিলেন। মেয়েকে সামান্যতম লেখাপড়া না শিখিয়ে কচি বয়সে বিয়ে দেওয়া তার মোটেই পছন্দ ছিল না। তাই তিনি মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং বিয়ে দিচ্ছি দেব করে মেয়ের বয়সটা বাড়িয়ে ফেললেন। এরপর হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। আর্থিক অবস্থা তার কোনকালে ভাল ছিল না। জমিজিরেত তেমন নেই। তাঁর উপার্জনেই সংসার চলত। কিন্তু তিনি হঠাৎ মারা যাওয়াতে তার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে আর্থিক বড়ই দুরবস্থায় পড়লেন। সহায়সম্বল কিছুই নেই। তাই বিধবা মা মেয়ের বিয়ের কোন উপায় করতে পারছেন না। মেয়েটিই বড় ছেলে তিনটি ছোট। এই মেয়েকে ঘরে আনলে তোমাদের সংসারের ও সুবিধা হবে, আর গরীব বিধবাকেও কন্যাদায় থেকে মুক্ত করা হবে। তবে বয়সে দেবুর চেয়ে এক আধ বছরের ছোট হবে। এতে আর এমন কি ক্ষতি। মেয়েটি রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। এ মেয়েকে বিয়ে করলে দেবু সুখীই হবে। তোমরা যদি বল, তবে আমি আলাপ করতে

পারি। আমি বললেই মেয়ের মা রাজী হয়ে যাবেন। লোকের কাছে মেয়ের বয়সটা একটু কমিয়ে বললেই হবে''

প্রস্তাবটা সবারই পছন্দ হল। গঙ্গা বললেন, ''শুধু আমাদের মত হলেতো হবেনা। মহীর মতামতটাতো জানা দরকার।''গুণমণির আর সহ্য হল না। তিনি বললেন, ''বিয়েটা যখন ছেলের প্রয়োজনে নয়, নেহাৎ সংসারের প্রয়োজনে তখন তোমার মহী মত দেবেই। এই যেমন আমরা সবাই মত দিচ্ছি। তাই মহীর মত আছে ধরে নিয়েই তুই মেয়ের মায়ের সঙ্গে কথা বল লবঙ্গ । এটা মাঘের শেষ, ফাল্গুনেইতো বিয়ে হয়ে যেতে পারে।'' গুণর কথায় যে তির্যক ছিল, তা গঙ্গা নব বুঝতে পারলেও লবঙ্গ বুঝতে পারেনি। কারণ লবঙ্গ গঙ্গাগুণর আগের ঝগড়া বিবাদের কথা কিছুই জানে না। তাই সে খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল,'' সেজমাসী ঠিকই বলেছ। আমাদের সবার যখন মত হয়েছে তখন দাদা আর অমত করবে কেন? তাহলে আমি আলাপ করে কথা পাকা করে ফেলি।'' তখন নবদুর্গা খুব মৃদুস্বরে বললেন, আলাপের আগে দেবুর মতামতটাতো অন্ততঃ নেওয়া দরকার। নবদুর্গার কথার উত্তরে লবঙ্গ বলল,'' কি যে বল ছোটমাসী দেবুর আবার মত নিতে হবে কেন? দেবু খুব বাধ্য ছেলে। আমরা যা বলব সে ঠিক তাই করবে। এত জনে জনে মত নিতে গেলে আসল কাজ পন্ড হয়ে যাবে।'' তারপর মাকে উদ্দেশ্য করে বলল। ''কি বল মা, কথাটা ঠিক বলিনি?'' গঙ্গা বললেন, ''সে তো ঠিকই বেশী গড়িমসি করলে অনেক সময় ভাল সম্বন্ধ হাতছাড়া হয়ে যায়। কথা যখন উঠেছে তখন অগ্রসর হওয়াই ভাল। ঠিকঠাক হয়ে গেলে দেবুকে বলা যাবে''

লবঙ্গের তৎপরতায় ঐ বড়সড় মেয়ের সঙ্গেই দেবেন্দ্রের বিয়ে তার অজান্তেই ঠিক হয়ে গেল এবং আশীর্বাদ পর্যন্ত হয়ে গেল। খবর অবশ্য ছোটমাসী এবং সেজমাসী গোপনে তাকে বলেছেন। কিন্তু যেহেতু প্রকাশ্যে তাকে কিছুই বলা হয়নি। এজন্য দুঃখে বিস্ময়ে দেবেন্দ্র হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারলনা। তার লেখাপড়ার ইতিরেখা টানা হয়েছে পারিবারিক প্রয়োজনে, বিয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে একই প্রয়োজনে। অবশ্য একেতো আর ঠিক বিয়ে বলেনা। এটা হল তার মাধ্যমে বাড়ীতে স্থায়ী একটা কাজের লোক আনা। পরিবারে তার অবস্থানটা এখন যেখানে সেখানে তার ইচ্ছে অনিচ্ছের বিন্দুমাত্র মূল্য নেই।

মেয়ের আশীর্বাদের পর খুব খুশী খুশী মেজাজে লবঙ্গ দেবেন্দ্রের কাছে গিয়ে বিনা ভূমিকায় বলল, ''দেবু, আমরা তোর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি,

আশির্বাদও হয়ে গেছে। তোর মত নিতে এসেছি। অবশ্য জানি আমরা যা করব তাতে তোর অমত হবেনা।" ঘটনার আদ্যোপান্ত মাসীদের মারফত দেবেন্দ্রের আগে থেকে জানাই ছিল। কিন্তু লবঙ্গর কথা ও ভাবভঙ্গীতে রাগে দেবেন্দ্রের শরীর জ্বলে গেল। কিন্তু বাইরে খুব শান্ত গলায় বলল, "এতটা এগিয়ে গিয়ে তুমি যখন মত নিতে এসেছ। তখনতো মত একটা দিতেই হয়, এ বিয়ে আমি করবনা। এই আমার মত।" একথা শুনে লবঙ্গ যেন একেবারে সাতহাত জলের নীচে ডুবে গেল। বলল একি সর্বনাশের কথা বলছিস দেবু! আর্শিবাদ হয়ে গেছে। এখন বিয়ে ভেঙ্গে গেলে মায়ের মানসম্মান যে ডুববে, সেটা ভেবে দেখেছিস! তুই যে এমন কথা বলতে পারবি, তা আগে বুঝলে বিয়ের সম্বন্ধই করতাম না। অমত করার বুদ্ধিটা তোকে কে দিল ? সেজমাসী ?" দেবেন্দ্র ধীর স্থির ভাবে বলল, "আমার মনে হয় আমি নিজের বুদ্ধিতেই কথাটা বলেছি। তোমরা আমাকে যতটা বোকা ভাবছ আসলে আমি তা নই। বিনা প্রতিবাদে সব কিছু মেনে নেই বলে তোমরা সবাই আমার জীবন নিয়ে এতটা ছিনিমিনি খেলতে সাহস পাচ্ছে। যাক এত কথার দরকার নেই। তুমি মত চাইতে এলে বলেই আমার মতামত জানালাম।" একথা বলেই দেবেন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লবঙ্গের মুখে দেবুর অমতের কথাটা শুনে গঙ্গা বেশ একটু বিপাকে পড়ে গেলেন। দেবুর মত - অমত, ইচ্ছা অনিচ্ছা নিয়ে কোনদিন ভাবার মত কোন কিছু এ যাবত ঘটেনি। সে বরাবর বাধ্য ছেলে। তাকে ইচ্ছেমতই চালান যায়। তাই বিয়ের ব্যাপারে গঙ্গা তার মত নেওয়ার কোন প্রয়োজনবোধ করেননি। তবে কোন কারণে সে যদি জেদ ধরে বসে তবে তাকে বাগে আনা যে বড়ই কঠিন তাও তিনি জানেন। কাজটা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেল আগে একটু জিজ্ঞেস করে নিলেই হত। যা হবার তাতো হয়েছেই। এখনতো আর বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া যায় না। তাই তিনি ছেলেকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করানোর জন্য দেবুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে গঙ্গা বললেন, "আমার খুব ভুল হয়ে গেছে দেবু। আগেই তোর মতটা নেওয়া উচিত ছিল আমার। এখন যদি বিয়ে ভেঙ্গে যায় তবে আমার মানসম্মান যে ধূলোয় লুটাবে একথাতো বুঝিস। তাই মায়ের ভুলটা ক্ষমা করে দে। যথাসময়ে শুভকাজ সম্পন্ন হয়ে যাক।" দেবু হাসল। সে হাসিতে যে বিদ্রূপ বেদনা দুইই ছিল তা গঙ্গার চোখ এড়াল না। দেবু বলল, শুভকাজ বলছ কেন মা কাজের লোক আনাকে কি শুভ কাজ বলে ? আর

আগে থাকতে মত নেবে কেন? আমার কি কোন মতামত বা ইচ্ছে অনিচ্ছে থাকতে পারে? আমিতো তোমার ক্ষেতখামারের সামিল। আমাকে নিয়ে যা খুশী করা যায় এবং করছ। মতামত,ইচ্ছে অনিচ্ছে,শুভ কাজ ওগুলোতো দাদা ও শচীর ব্যাপার। আমার নয়। তবে তোমার মানসম্মানের কোন হানি হবে না। যথাসময়ে তোমার কাজের লোক এসে যাওয়ার ব্যবস্থা আমি করব। কিন্তু বিয়ে হবে না। বাজনাবাদ্যতো দূরে থাক, উলুধ্বনি দেওয়াও চলবেনা,শাঁখ বাজবে না, মঙ্গলঘট বসবে না, লোকখাওয়ানো হবে না। আর তাতে তোমার সাধআহ্লাদেরও কোন ব্যতয় ঘটবে না। কারণ ওসব দাদার বিয়েতে যথেষ্ট করেছ আর শচীর বিয়েতেও করবে। আমার একথার সামান্যতম ব্যতিক্রম ঘটালে আমাকে পাবে না। আমারও যে সহ্যধৈর্যের একটা সীমা আছে তা যদি একটু মনে রাখতে চেষ্টা কর তবে তোমার কোন অসুবিধে হবে না। বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলায় গঙ্গাকে ছেলের আঁতে ঘাঁ লাগা কথাগুলো সহ্য করতে হল এবং ছেলের লোকলজ্জাজনক শর্তগুলোও মেনে নিতে হল।

গঙ্গা দেবেন্দ্রের কথায় এতটুকু রাগ করলেন না। দেবু যে কতদুঃখে কথাগুলো বলেছে তা অনুভব করে তার মন জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হতে লাগল। আসলে সাংসারিক প্রয়োজনে তিনি দেবেন্দ্রের প্রতি একটু বেশীই অবিচার করে ফেলেছেন। আর তুলনামূলকভাবে মহীশচীকে অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা যে দিচ্ছেন তাও মিথ্যে নয়। তার এই বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য গুণ তাকে সাবধান করতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি সাবধান হওয়াতো দূরের কথা গুণর উপর মহাবিরক্ত হয়েছিলেন। আজ তিনি বুঝতে পারছেন যে মেজছেলের মন তার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। ছেলের মনের নাগাল তিনি আর কোনদিন পাবেন না। অবশ্য এসব চিন্তা করার সময় এখন নেই। সামনে বিয়ের কর্তব্য। সবচেয়ে বড় মুস্কিল হল দেবু বিয়ের উৎসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে যা বলেছে তা কোনমতেই মেনে নেওয়া যায়না। দেবুর কথামত কোন উৎসব অনুষ্ঠান না করলে সমাজে তার খুব নিন্দে হবে,আর নিজের মনেও খুবই কষ্ট হবে। ছেলের বিয়ে দেবেন অথচ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করবেন না। বাড়ীতে লোকের পাত পড়বে না তা কি করে হয়। আবার দেবুর অমতে ওগুলো করতে গেলে সে নিশ্চয় একটা অঘটন ঘটিয়ে বসবে। সে এমনিতে খুবই শান্ত। কিন্তু অশান্ত হলে যে চূড়ান্ত হয় একথা গঙ্গার ভালরকমেই জানা আছে। এখন অগতির গতি মহী। মহী যদি দেবুকে বুঝিয়ে সুজিয়ে উৎসব

অনুষ্ঠানে রাজী করাতে পারে। নিরুপায় গঙ্গা এই আশাই করছেন।

সরযূর একটি পুত্রসন্তান জন্মেছে। শিশুসন্তান ও স্ত্রীর পরিচর্যা নিয়ে মহেশ বড়ই ব্যস্ত আছে। তাছাড়া ওকালতীতেও তার পশার বেড়েছে। ভাল উপার্জন হচ্ছে। দু'বেলা মক্কেল আসা যাওয়া করছে। এদিক দিয়ে মহেশকে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়। মহেশের কোলকাতার সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপচে পড়ছে। বাড়ীর কথা সে খুব একটা ভাবে না। যেমন তেমন চললেই হল। আর শচীরতো বাড়ীঘর খেতখামার এসব তুচ্ছ ব্যাপারে ভাবাভাবির প্রশ্নই আসে না। বাস্তব জগত থেকে সে অনেক দূরে। বিদ্যা ও বিলাসের জগতে তার বাস। শচীন্দ্রের প্রতি দাদা মহেশের স্নেহদৃষ্টি সজাগ। মহেশের আশ্রয়ে শচীন্দ্র বড়ই ভাল আছে। এই পরিস্থিতিতেই দেবেন্দ্রের বিয়ের খবরটা তারা পেল। বিয়ের খবর পেয়ে দুই ভাই এবং মহেশের স্ত্রী তিনজনেই বড় খুশী হল। বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য তারা তড়িঘড়ি বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল এবং বিয়ের বেশ কয়দিন আগেই তারা বাড়ীতে পৌছে গেল। কারণ মহেশের ইচ্ছা দেবুর বিয়ের অনুষ্ঠানটা সে বেশ জাঁকজমক করেই করবে। কারণ সে এতবড় একজন উকীল। তার ভাইয়ের বিয়েতে জাঁকজমক না করলে তার মান মর্যাদার হানি হবে। নিজেকে জাহির করার ব্যাপারে মহেশ বড়ই তৎপর।

বাড়ী এসে সব বৃত্তান্ত শুনল মহেশ। শুনে খুবই অবাক হল। কিন্তু বিশেষ চিন্তিত হল না। কারণ মহেশ জানে দেবু অন্ততঃ দাদার কথার অবাধ্য হবে না। কিন্তু দেবু সম্বন্ধে মহেশের এই ধারণা মিথ্যে হয়ে গেল। দেবেন্দ্র অনমনীয়। তার শর্ত্ত থেকে তাকে একচুলও এদিক ওদিক করা গেল না। তাই অভিভাবকদের জাঁকজামকপূর্ণ অনুষ্ঠানের ইচ্ছে থাকলেও দেবুর ইচ্ছামতই কাজ করতে হল। নেহাৎ অনাড়ম্বরভাবে বিয়ে সম্পন্ন হল। সমাজে নববধূর স্বীকৃতির জন্য মাত্র পাঁচজন ব্রহ্মনভোজন করানো হল। অনেকটা যেন গরীবের পিতামাতার শ্রাদ্ধের মতন। মহেশ ও গঙ্গা সমাজে নিন্দিত হলেন,অন্তরে আঘাত পেলেন। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। এই প্রথম চিরদিনের নির্ব্বিবাদী দেবেন্দ্র কঠোর প্রতিবাদী হল। গঙ্গা ও মহেশ দেবেন্দ্রের আচরণে চরম মানসিক শাস্তি পেলেন। এমন কি যে শচীন্দ্র নিজেকে এবং বড়দাদাকে ছাড়া অন্য কাউকে মানুষ বলে মনে করে না,সেও এখন মেজদাদাও যে একটা সত্ত্বা তা হৃদয়ঙ্গম করল। আর গুণমণি ও নবদুর্গা মনে মনে ভাবলেন এমনটাই হওয়া উচিত ছিল। একজন মানুষ চিরদিন অন্যায়

অবিচার সহ্য করবে কেন? যা করছে ঠিকই করেছে দেবু।

নববধূ শৈলবালা যথার্থ সুন্দরী। হাতে পায়ে গড়ন পিটনে কোথাও কোন খুঁত নেই। বিশেষ করে তার দীর্ঘচুলের রাশি এমন যে দেখলে রূপকথার রাজকন্যার মেঘবরণ চুলের কথা মনে পড়ে যায়। তবে সে যুগ অনুপাতে বয়সটা তার বেশীই। দেবেন্দ্রের বয়স সতের আর শৈলর ষোল। দু'জনে প্রায় সমবয়সী। সে যুগের তুলনায় শৈল লেখাপড়াও ভালই জানে। তার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাবা দরিদ্র হলেও প্রগতিশীল মনের অধিকারী ছিলেন। তিনি তৎকালীন যুগে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং মেয়েদের বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই মেয়েকে তিনি যত্ন করে লেখাপড়া শিখিয়ে ছিলেন। মেয়ের মেধাশক্তি দেখে তাকে তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেও তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর প্রতিবন্ধকতায় সেটা কার্যকরী করতে পারেননি। কারণ শৈলর মা বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন। মেয়েদের সংসার জীবনে লেখাপড়া শেখা আর না শেখা যে সমান সেটা তিনি ভালই বুঝতেন। তাই মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্য তিনি স্বামীর উপর চাপ সৃষ্টি করলেও শৈলর বাবা এত অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ের উদ্যোগ নেননি। তারপর হঠাৎ তিনি যখন ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন তখন দরিদ্র বিধবার পক্ষে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। এমনি করেই শৈলর বয়স বেড়ে গেছে। অবশেষে লবঙ্গের দয়ায় কোনরূপ দানসামগ্রী ছাড়া তিনি কন্যাদায় থেকে মুক্ত হলেন। এজন্য লবঙ্গের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ।

শৈল যেমন সুন্দরী তেমনি বুদ্ধিমতী ও চটপটে। গৃহকর্ম ও নানারকম শিল্পকাজেও সে খুবই নিপুণ এবং সে নিরলস। কর্তব্যকর্মে তার বিন্দুতম অবহেলা নেই। তবে বেশ একটু খর স্বভাবের ও স্বাধীনচেতা। কোন অন্যায় কখনও মুখ বুজে সে সহ্য করে না। মুখের উপর জবাব দিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে লঘুগুরু জ্ঞান তার নেই। বধূসুলভ যে নম্রতা ও সহ্যগুণ সাধারণতঃ পরিবার পরিজনরা আশা করে, শৈলর স্বভাবে তা নেই বললেই চলে। তার চরিত্রের এ সবদিক অবশ্য ধীরে ধীরে প্রকাশ পেয়েছে।

শৈলকে নিয়ে এ বাড়ীতে জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই। বিশেষ করে শৈলর বয়স নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে তরঙ্গিনী। এর অবশ্য একটা অন্য কারণও আছে। সম্বন্ধটা এনেছে লবঙ্গ। লবঙ্গের সঙ্গে তরঙ্গের একেবারে বনিবনা হয় না। তাই তরঙ্গ লবঙ্গকে ঘায়েল করার এই সুযোগটা ছাড়লনা। লবঙ্গের সামনেই মাকে

উদ্দেশ্য করে বলল,"লবঙ্গের কথায় কাজটা তুমি ভাল করলে না মা। দেবুর মত কচি ছেলের সঙ্গে ঐ ধেড়ে মেয়ের বিয়েটা কি মানানসই হয়েছে? তুমিত সবসময় লবঙ্গর কথায় চল। অথচ আমি বড় মেয়ে। আমাকে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞেসও করনা। আমার হাতেও অমন সুন্দরী কমবয়সী অনেক মেয়ে ছিল। তুমি মুখের কথা খসালেই আমি সম্বন্ধ এনে দিতাম।"লবঙ্গ খুবই মুখরা। সে মোটেই ছাড়বার পাত্রী নয়। ফুঁসে উঠে লবঙ্গ বলল," তোমাকে আমি ভালই চিনি বড়দিদি। তুমিত কাজের বেলায় চুপ আর নিন্দের বেলায় পঞ্চমুখ। এতদিনতো ছিলে এ বাড়ীতে কোন যজ্ঞিটা করে গিয়েছ শুনি। তোমার এলেম আমার ভালই জানা আছে।" ক্রুদ্ধ তরঙ্গ বলে উঠল," দেখলেতো মা ঠেকায় পড়ে তোমার কাছে কিছুদিন থাকার জন্য ও আমাকে কেমন খোঁটা দিচ্ছে। থেকেছিতো আমি আমার মায়ের কাছে। তোর কাছেতো থাকতে যাইনি। তুই খোঁটা দেবার কে?"ধুন্ধুমার ঝগড়া শুরু হচ্ছে দেখে গঙ্গা বললেন," তোদের কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই লবঙ্গ? নূতন বউটাকে একা আমিষ হেঁশেলে ঠেলে দিয়ে এখানে বসে ঝগড়া করছিস। বউটা ছেলেমানুষ, এখানকার কিছুই সে জানে না। শুধু ঝগড়া করতেই শিখেছিস। কর্তব্য জ্ঞান বলতে কিছুই ভগবান তোদের দেননি।"লবঙ্গ ঝগড়াটে হলেও তার যথেষ্ট কর্তব্যবোধ আছে। তাই মায়ের কথায় সে লজ্জিত হয়ে আমিষ হেঁশেলে চলে গেল। আর তরঙ্গ গজগজ করতেই থাকল। বলল,"ওর কূটকচালে স্বভাব নিয়ে ওযে স্বামীর ঘরে টিকে আছে, সে ওর স্বামীটা নেহাৎ হাবাগোবা ধরনের বলে। নইলে এতদিনে নাকচুল কেটে ওকে তাড়িয়ে দিত। আর তোমার ঘাড়েই পড়ত। তুমি ওর এই স্বভাবটা জেনেও কেন যে ওকে এত প্রশ্রয় দাও বুঝিনা মা।"গঙ্গা বিরক্ত হয়ে বললেন,"বকরবকর না করে তুইও নিরামিষ ঘরে গিয়ে নবকে কাজে সাহায্য কর।" জোঁকের মুখে চুন পড়লে যেমন হয়, কাজের কথা বললে তরঙ্গেরও তেমনি হয়। একেবারে চুপসে গিয়ে সে বলল,"এখন নিরামিষ ঘরে গেলে বারান্দায় বসে তরকারী কোটা ছাড়া ছোটমাসী আর কিছুই করতে দেবে না। আমি বরং স্নানটা সেরে যাই, তাহলে সবকিছুই করতে পারব।" গঙ্গা বললেন, "আচ্ছা তাই যাস।" কিন্তু তিনি জানেন তরঙ্গ কখনই নবর কাজ না সারলে যাবেনা। তার মত অলস কমই আছে। তাই তখনকার মত তরঙ্গ থেমে গেল। অলস হলেও ঝগড়ায় তরঙ্গের জুড়ি মেলা ভার।

তরঙ্গ নিন্দামন্দ করতে খুবই পছন্দ করে। কিন্তু নূতন বউটা এত ভাল

রেধেঁছে যে কিছুতেই নিন্দেমন্দ করা গেল না। তাই খেয়ে দেয়ে বিছানায় শুয়ে মনে মনে এ বাড়ীর সবার স্বভাবের সমালোচনা শুরু করে দিল। প্রথমেই পড়ল মাকে নিয়ে। মা' ত একটা একচোখা গোবিন্দ। যাকে দেখে তাকেই দেখে, আর যাকে দেখেনা তাকে দেখেই না। ছেলেদের মধ্যে মহী শচী আর মেয়েদের মধ্যে লবঙ্গ। এই তিনজনই মার সব। অন্য সন্তানরা কিছু নয়। অথচ সেতো মার প্রথম সন্তান। তাকেই তো মায়ের বেশী দেখা উচিত ছিল। সবই তরঙ্গের ভাগ্য। সেজমাসীর সঙ্গে আগে যাহোক দুটো মনের কথা বলা যেত। কিন্তু এখন আর যায় না। ঠাস্ ঠাস্ উল্টো কথা শুনিয়ে দেয় সেজমাসী। তাই তরঙ্গ এখন পারত পক্ষে সেজমাসীর সঙ্গে কথাই বলে না। আর ছোটমাসী? সে'ত সবসময় মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। বয়সতো আর বেশী নয়ছোটমাসীর। তরঙ্গের চেয়ে সামান্যই বড়। অথচ ভাবখানা যেন আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ীর। ছোটমাসীর সঙ্গে কথা বলা যা, একটা গাছের সঙ্গে কথা কথা বলাও তা। তবে একটা গুণ অবশ্য আছে। কথা কখনও পাঁচকান করে না ছোটমাসী। আর লবঙ্গতো একটা কেউটে সাপ। ওর সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতে রীতিমত ভয়ই করে। কখন কি বলবে আর কি করবে কিছুই বলা যায় না। আর ক্ষীরি সরিতো কথা বলার যোগ্যই নয়। ক্ষীরিটাতো সবসময় মুখে আষাঢ়ের মেঘ জমিয়ে রেখেছে। অমন মদমাতালে স্বামী যেন আর কারুর হয় না। সব সময় অমন গোমড়ামুখে থাকলে কপালের দুঃখ কপালেই লেপ্টে থাকে,দূর হয় না। একথা ক্ষীরিকে বুঝালেও বুঝে না। গোমড়া মুখ আরও গোমড়া করে। আর সরিটাতো ন্যাকার হদ্দ। ভাজামাছ উল্টে খেতে জানেনা। দুই সন্তানের মা হয়েছিস। খুকীটিতো আর নোস। এত ন্যাকামী কিসের? তারপর মহী । মহীরতো সংসারে তিনটিই কর্ম। বিদ্যের গুমরে ফুঁলে ফেঁপে থাকা,বউকে মাথায় করে নাচানাচি করা আর মায়ের উপর ফোঁপর দালালি করা। মহীকে তরঙ্গ দু'চোখে দেখতে পারে না। শচীটাতো এখনও ছোট তাই ঠিক বুঝা যায় না। তবে মনে হয়, ওটাও মহীর মতনই হবে। আর দেবুটাতো হদ্দবোকা। নিজের ভালমন্দ বুঝতে পারে না। তাছাড়া ওর বয়সও নেহাৎই কম বলে ওর সঙ্গেতো আর ভালমন্দ কথা বলা চলে না। আর মহীর বউটাতো একটা গুড়ের কলস। যেমন গায়ের রং তেমনি চেহারার ছাঁদছিরি। বড়লোকের মেয়ে বলে অহঙ্কারে মুখে রা কাড়ে না,কিন্তু পেটে পেটে শয়তান। নূতন বউটাও বড় সুবিধের হবে বলে মনে হয় না। লবঙ্গের মতই কেউটে সাপের স্বভাব বলে মনে হচ্ছে। তা

যে যেমন আছে,থাকুকগে। তাতে তরঙ্গর কি আসে যায়? তবে এ বাড়ীতে থাকতে তার একটুও ভাল লাগছে না। এখানে কথা বলার মত কোন লোকই নেই। বরং সুশীর বাপের সঙ্গে দুটো ভালমন্দ কথা বলা যায়। লোকটা সারাজীবন কোন রোজগারপাতি না করায় তাকে অনেক দুঃখ-অপমান সইতে হয়েছে বটে। তবে মানুষটার সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে। তাই সে কালই বাড়ী চলে যাবে। এখানে তার আর ভাল লাগছে না।

দুই বউ বাড়ীতে আসায় তাদের চেহারা ও স্বভাব নিয়ে মেয়েদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা হয়। চেহারা ও চরিত্রে দুই বউ একেবারে বিপরীত। বড় বউ সরযূ ধনী বাপের মেয়ে আর মেজবউ শৈল দরিদ্র বিধবার কন্যা। সরযূ একটু মোটাসোটা গোলগাল, নাক মুখ চোখও একটু চাপা ধরনের,গায়ের রংও শ্যামলা। শৈল অপূর্ব সুন্দরী। ছিপছিপে গড়ন,নাক চোখও মুখের গড়ন দেবী প্রতিমার মতন,দুধে আলতায় গায়ের রং। চেহারায় যেমন স্বভাবেও তারা দুজন দু'রকম। সরযূ ঢিলেঢালা অগোছাল প্রকৃতির। কাজেকর্মে অপটু ও অলস। শাড়ী গয়নায় তার বাহারের অন্ত নেই, কিন্তু পারিপাট্যের বড়ই অভাব। বুদ্ধিতেও সে নিতান্ত সহজ সরল,আচরণে খুবই নম্র। অন্যায়ভাবেও তাকে দু'কথা শুনিয়ে দিলে সে উত্তর দিতে পারে না, রাগও করতে পারে না। লেখাপড়াও জানে অতি সামান্যই। শৈল কাজে কর্মে বড়ই নিপুণ ও নিরলস। এহেন কাজ নেই যে শৈল পারে না। তার বুদ্ধি খুবই প্রখর এবং সে খুবই স্পষ্টবাদী। কাউকে ছেড়ে কথা বলার অভ্যাস তার নেই। তবে কর্তব্যকর্মে তার কোন অবহেলা নেই। যখন যেখানে যা করা দরকার নীরবে এবং নিমিষে সে তা করে ফেলে। বয়স কম হলেও তার মধ্যে একটা অসাধাবণ ব্যক্তিত্ব আছে। যার ফলে শ্বশুরবাড়ীতে সবাই তাকে একটু সমীহ করেই চলে। সে তুলনায় মোটাবুদ্ধি সরযূকে কেউ বিশেষ আমলই দেয় না। বসনে ভূষণে চালে চলনে শৈল খুবই পরিপাটী। সরযূর তুলনায় তার শাড়ীগয়না খুবই অকিঞ্চিৎকর কিন্তু সরযূর চেয়ে তাকে অনেক বেশী ছিমছাম দেখায়। শৈল কোন পাশ দেয়নি বটে, তবে লেখাপড়া সে ভালই জানে। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে ও তার কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে। আর বাংলাসাহিত্যতো ভালই জানে। তার পড়ার নেশাও আছে। অবসর সময়ে সে যেকোন বইয়ের পাতায় ডুবে যায়।

শৈলবালা বউ হয়ে বাড়ীতে আসার পর ঘরকন্নার কাজ থেকে নবদুর্গা অনেকটা অব্যাহতি পেয়েছেন। বহুদিন যে কাজের বোঝা তার মাথায় ছিল, শৈল

বাড়ীতে পা দিয়েই সব বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে। লবঙ্গ ঠিকই বলেছিল, যে কাজেকর্মে মেয়েটা খুবই নিপুণ। ওর উপর কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। খরস্বভাব হলেও শৈল মাসীশাশুড়ীদের খুবই শ্রদ্ধা করে। বিশেষ করে ছোটমাসীর প্রতি শৈলর মন খুবই সহানুভূতিশীল। এতদিন ছোটমাসী সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করে এসেছেন বলে শৈল তাকে খুব সেবাযত্ন করার চেষ্টা করে। শাশুড়ী ও সেজমাসীর প্রতিও তার সেবাযত্নের ত্রুটি নেই। এজন্য খরস্বভাব হলেও শ্বশুরবাড়ীর সবাই শৈলর উপর বড়ই সন্তুষ্ট। তাছাড়া শৈলর রূপের জন্যও শাশুড়ীদের মনে বেশ গর্ব আছে। কারণ এমন রূপবতী বউ গ্রামে আর একটিও আসেনি।

অন্তরের অন্তস্থলে প্রায় সমবয়সী স্বামীর প্রতি শৈলর অগাধশ্রদ্ধা ও ভালবাসা। তার রূপবান স্বামী তেমন বিদ্বান না হলেও যে খুবই বড় মনের মানুষ বুদ্ধিমতি শৈল তা বুঝে নিয়েছে। শৈল চিরদিন এই মনটাই চেয়ে এসেছে। টাকাপয়সা গয়নাগাঁটির লোভ শৈলর নেই। সে মনের মত মানুষ চেয়েছে এবং তাই পেয়েছে। মনে মনে শৈল স্বামীকে নিয়ে পরমসুখী।

নীলগঞ্জের রায়বংশ ও মজুমদার বংশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সম্পত্তিসংক্রান্ত যে মোকদ্দমা চলছিল তাতে উভয়পক্ষেরই প্রচুর অর্থব্যয় হচ্ছিল। মজুমদারদের তখন ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তাদের বৈষয়িক উন্নতি দ্রত এগিয়ে চলছিল। কাজেই মোকদ্দমার জন্য যে খরচ হচ্ছিল তাতে তাদের তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। কিন্তু রায়দের আর্থিক সংগতি তেমন না থাকাতে তারা খুবই আর্থিক সংকটে পড়ে গেল। কাজেই নিরুপায় হয়ে মোকদ্দমা চালাতে গিয়ে গঙ্গাকে বাজারের পাটের মহাজনের কাছ থেকে চড়াসুদে ঋণ নিতে হল। আর ধাপে ধাপে ঋণ নেওয়ার ফলে ঋণের পরিমাণও হয়েছিল নেহাৎ কম নয়। ঋণ পরিশোধের জন্য অবশ্য গঙ্গা তেমন চিন্তা করছেন না। কারণ সম্পত্তির যে অংশের আয় এখন আদালতের নির্দেশে জমা পড়ে আছে, মামলা নিষ্পত্তি হয়ে গেলে সেই আয়টা এককালীন পাওয়া যাবে এবং তাতে ঋণের অনেকটাই শোধ করা যাবে। মামলায় যে গঙ্গার নিশ্চিন্ত জয় এ বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। কারণ গঙ্গার দৃঢ় বিশ্বাস জালিয়াতী করে আইনের ঘরে জয়ী হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

এই পরিস্থিতিতেই এক সময় মামলায় নিষ্পত্তি হল। ওদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে জাল দলিলই সত্য বলে প্রমাণিত হল। গঙ্গাদের হতবাক্ করে

দিয়ে সত্য মিথ্যা হয়ে গেল আর মিথ্যা সত্য হল। গঙ্গামণি মামলায় হেরে গেলেন। আর বিতর্কিত সম্পত্তির আয় স্বাভাবিক ভাবেই জয়ী মজুমদাররা পেয়ে গেল।

সত্যের অবমাননায়,পরাজয়ের গ্লানিতে গঙ্গামণি একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। গুনমণি নবদুর্গাও এই অসম্ভব সম্ভব হল দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাছাড়া এই পরাজয়ের ফলে রায়পরিবার প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতির সন্মখীন হল।

পরাজয়ের জ্বালা, ঋণের বোঝা,সম্পত্তির একটা অংশ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় স্থায়ী ক্ষতি ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে রায়পরিবারে ঘোরতর সমস্যা দেখা দিল। কোলকাতায় যথাসময়ে মহেশকে এই দুঃসংবাদটা দেওয়া হল। খবরটা পেয়ে মহেশেরও যেন বজ্রাহত হওয়ার অবস্থা হল। তবে সে মনের দিক দিয়ে মোটেই ভেঙ্গে পড়ল না। বড়ই দৃঢ়চেতা মানুষ মহেশ। এই বিপদ থেকে উত্তরণের উপায় তাকেই খুঁজে বার করতেহ হবে। ভাইগুলো অনেক ছোট। পাশে দাঁড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। যা কিছু করার তাকে একাই করতে হবে। মাকে আর সে কোন দায়দায়িত্বে জড়াবে না। কম ঝড়ঝঞ্ঝাতো আর মার মাথার উপর দিয়ে যায়নি। তাই দ্রুত কোলকাতা বাসার ব্যবস্থা করে সে বাড়ী যাবাব জন্য প্রস্তুত হল। তার স্ত্রী আবার দ্বিতায়বার সন্তানসম্ভবা। তাই মহেশ তাকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল। আর শচীন্দ্রকে ঠাকুর চাকরের জিম্মায় রেখে সে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হল।

বাড়ীতে এসে মহেশ দেখল সমস্ত বাড়ীটায় একটা ঝিমধরা বিষন্নতা ছড়িয়ে আছে। হেরে যাওয়ার গ্লানিতে অর্থের চিন্তায় গঙ্গা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। কিন্তু মহেশ সহজে ভেঙ্গে পড়ার লোক নয়। তার অসাধাবণ মনোবল এবং দৃঢ আত্মবিশ্বাস। যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য সে প্রস্তুত এবং বিপদে সে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মহেশের উপস্থিতি ও আশাভরসাপূর্ণ কথাবার্তা শুনে বাড়ীর সবাই কিছুটা সহজ হল আর গঙ্গাও মনোবল খানিকটা ফিরে পেলেন।

এই গুরুতর বিপত্তি থেকে বিশেষ করে অর্থসংকট থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়, এই পরামর্শের জন্য মহেশ বাড়ীর সবাইকে একত্রিত করে আলাপ আলোচনা করলএবং সে মনে মনে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাও বলল। মহেশ স্থির করেছে, স্ত্রীকে সে কিছুদিন বাপের বাড়ীতে রাখবে। শচীন্দ্র এম. এ পাশ করে সবে আইন কলেজে ভর্তি হয়েছে। তার পড়াটা এ অবস্থায় বন্ধ করা ঠিক হবে না। তাই তাকে স্বল্প খরচের একটা মেসে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে কোলকাতার বাসা

উঠিয়ে দেবে। বাসা উঠিয়ে দিলে অনেক খরচ কমবে। সে নিজে ঢাকায় এসে ওকালতী শুরু করবে। শ্বশুরের প্রভাবপ্রতিপত্তির জোরে ঢাকায় তার পশার কোলকাতার চেয়ে ভাল হবে বলেই সে মনে করে। ঢাকায় সে একটু থিতু হয়ে পরিবারের সবাইকে ঢাকায় নিয়ে যাবে। পরিবারের নৈমিত্তিক খরচ ও শচীর পড়ার খরচ তার উপার্জনে চলবে। আর দেবু বাড়ীতে থেকে সম্পত্তির আয় থেকে ঋণশোধ করবে। নইলে ঋণশোধ করার আর অন্য উপায় নেই। তার প্রস্তাবটা মা মাসীদের সে ভেবে দেখতে বলল, যদি সবাই তার প্রস্তাবটা সঠিক মনে করে তবে সে সেইমত কাজ করবে।

মহেশের প্রস্তাবটা খুবই বাস্তবসন্মত। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যবস্থা ছাড়া ঋণশোধের কোন উপায় নেই। তাই গঙ্গারা তিনবোনেই একবাক্যে মহেশের প্রস্তাবে সায় দিলেন। সবাই একমত হওয়ায় মহেশ আর দেরী না করে কোলকাতায় চলে গেল এবং চটপট সব ব্যবস্থা করে শচীকে মেসে পাঠিয়ে দিয়ে কোলকাতার বাসা উঠিয়ে দিল। এমন সময়ে সরযূর দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। কিন্তু মহেশের পক্ষে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে নবজাত পুত্রকে দেখে আসা সম্ভব হল না। সে সোজা ঢাকায় চলে এল।

ঢাকায় এসে মহেশ ছোট একটা বাড়ী ভাড়া করে একা থেকে ঢাকা কোর্টে ওকালতী শুরু করে দিল। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার ঢাকায় আসার অল্পদিনের মধ্যেই শ্বশুরের প্রভাবের জোরে বা ঈশ্বরের দয়ায় মহেশের পশার বেশ জমে গেল। কোলকাতা থেকে ঢাকায় উপার্জন অনেক বেশী হতে লাগল। মহেশ ভাবল. ঈশ্বর মানুষকে একদিকে যেমন বিপদে ফেলেন,অন্যদিকে আবার রক্ষাও করেন। নইলে ঢাকায় এসে তার উপার্জন এত বেড়ে যাবে কেন?

মহেশ খুবই বুদ্ধিমান ও কর্মতৎপর লোক। বিপদে সে খুবই দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিপদে সে ভেঙ্গেতো পড়েই না বরং তার মনোবল দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সে আশাবাদী। তার দৃঢ় বিশ্বাস এই সংকট থেকে অতি শীঘ্রই তাদের উত্তরণ ঘটবে যদি যথাযথ ছক কেটে চলা যায়। তার উপার্জনে সংসার চলবে এবং সম্পত্তির আয়ে ঋণশোধ করা হবে। তাছাড়া শচীর পড়াশুনাওতো শেষের পথে। পাশ করে বেরিয়ে এসে সেও উপার্জন করবে। তখন অবশ্য তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসবে। বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবেলার ব্যাপারে চুলচেরা হিসাব করেই চলতে হবে। ঢাকায় তার উপার্জনতো ভালই হচ্ছে। এখন তার কাজ হল,

বাড়ীর সবাইকে ঢাকায় নিয়ে আসা। তাই সে ছোট বাড়ী ছেড়ে দিয়ে একটি বড় বাড়ী ভাড়া করল। তারপর সবাইকে নিয়ে আসার জন্য বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হল।

রাজচন্দ্রের মেয়েদের আত্মমর্যাদাবোধ খুবই বেশী। মিথ্যা দলিলের জোরে শরীকরা যে তাদের পৈতৃক সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়েছে, আর আসল দলিল হাতে নিয়েও তারা তাদের ন্যায্য অধিকার বজায় রাখতে পারলেন না এতে তাদের আত্মমর্যদায় এত ঘা লাগল যে তিনবোনেই মানসিক দিক দিয়ে খুবই বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। এই অবস্থায় মহেশের প্রস্তাব তাদের কাছে খুবই গ্রহণীয় মনে হল। মহেশ বাড়ীর বড়ছেলে। সে বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সুউপায়ী। একটা বৃহৎ পরিবারের অভিভাবকত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তার আছে। তাই মহেশের উপর গোটা পরিবারের যেমন আস্থা তেমনি নির্ভরতা। মহেশের কথামত চললে আর্থিক সুরাহাতো হবেই। তাছাড়া গঙ্গাদের তিনবোনেরই একটা মানসিক স্বস্তিও হবে। কারণ এই দুর্বিসহ পরাজয়ের জ্বালা বুকে নিয়ে শরীকদের পাশাপাশি বাসকরাটা খুবই যন্ত্রণা দায়ক। কিছুদিন দূরে থাকলে এই জ্বালাটা কিছুটা ভুলে থাকা যাবে। এখন ঢাকায় মহেশের ব্যবস্থাপনার জন্য তারা পথ চেয়ে আছেন।

মহেশ যথাসময়ে বাড়ী পৌঁছল। গোটা পরিবারের ঢাকা যাওয়ার প্রস্তুতি চলল। পরিবারটি নেহাৎ ছোট নয়। মা মাসীরা তিনবোন, দুই বউ, মহেশের তিন ছেলে আবার সম্প্রতি তৃতীয় বোন ক্ষীরোদা বিধবা হয়ে নাবালক ছেলে অবনীকে নিয়ে পাকাপাকিভাবে বাপের বাড়ীতে চলে এসেছে। তার উচ্ছৃংখল স্বামীটা সর্বস্ব খুইয়ে শেষ পর্যন্ত অকালে মরেছে। অশান্তি কি শুধু একদিকে? এতগুলো লোক নিয়ে গেলে একজন ঝি ও একজন চাকর সঙ্গে নিতেই হবে। কাজেই পরিবারটি বেশ বড়ই। একথা চিন্তা করেই মহেশ মোটামুটি বেশ বড় দালান বাড়ী ভাড়া করে এসেছে। খোলামেলা বাড়ীতে থেকে অভ্যস্ত মেয়েদের যাতে বাসাবাড়ীতে কোনরূপ কষ্ট না হয়.সেদিকে মহেশের নজর আছে।

ঢাকায় যেতে সবাই আগ্রহী হলেও শৈলর যেতে এতটুকু ইচ্ছে নেই। স্বামীকে একা বাড়ীতে রেখে যেতে তার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছেনা। অবশ্য সবাই চলে গেলে চাকরবাকরের বাড়ীতে তারও থাকা সম্ভব নয়। শাশুড়ী কোনক্রমেই এতে রাজী হবেন না। ঢাকা না গিয়ে সে যদি তার মার কাছে চলে যায়? তবে খুবই ভাল হয়। মা ভাইদেরও কাছে পাবে আর স্বামীও সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন যেতে

পারবেন। ফলে মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হলেও শৈল একটু নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে। শৈলর বাপের বাড়ীতো আর খুব দূর গ্রাম নয়। মাঝে মধ্যে যাওয়া আসা কোন অসুবিধের ব্যাপার নয়। তাছাড়া আরও একটা সমস্যা শৈলর মনের কোণে আছে যা কাউকে বলা যায় না। এমনিতে শৈল কাউকে তেমন পরোয়া করে না। কিন্তু ভাশুরঠাকুরকে কেমন যেন তার ভয় ভয় করে। অবশ্য ভাশুরঠাকুরকে বাড়ীর সবাই ভয় পায় এবং সমীহ্ করে। আর করবেই না কেন। তিনি বাড়ীর বড় ছেলে, অভিভাবক। শৈলও তাকে সমীহ শ্রদ্ধাই করে। কিন্তু ঢাকায় ভাশুরঠাকুরের বাসা বাড়ীতে যেতে তার কিছুতেই মন চাইছে না। তাই সে তার ঢাকা যাওয়ার অনিচ্ছেটা স্বামীকে জানাল। দেবেন্দ্র শৈলর এই অনিচ্ছেটুকু একেবারে উড়িয়ে দিল না। মনে মনে কেন জানি শৈল ঢাকায় যাক্ এটা তারও তেমন মনঃপূত নয়। শৈলকে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেই ভাল হত। কিন্তু বড়দাদা এত আগ্রহ করে নিয়ে যেতে চাইছেন,এরমধ্যে শৈল যদি না যায়, তবে সেটা মোটেই ভাল দেখাবে না। তাছাড়া এই বিপদের সময়ে কোন মতভেদ করাটাও ঠিক হবে না। তাই সে শৈলকে বুঝিয়ে বলল,''তোমার ঢাকা যাওয়ার ব্যাপারে আমারও যে খুব ইচ্ছে আছে তা নয়। কিন্তু মুস্কিল হল যে দাদার ব্যবস্থাপনা না মেনে নিলে দাদাতো অসন্তুষ্ট হবেই অন্যায়ও হবে। এই বিপদকালে নিজেদের মধ্যে কোন মনোমালিন্য সৃষ্টি করা ঠিক হবে না। তবে তুমি ঢাকায় গেলে আমার সঙ্গে যে একেবারে দেখা হবে না তা ঠিক নয়। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে দেখতে যাব। আর মনে হয় এখন যতটা খারাপ লাগবে ভাবছ তা হয়ত লাগবে না ঢাকার মত বড় শহরে গেলে দেখবে শেষ পর্যন্ত ভালই লাগবে।''শৈল অবুঝ নয়। স্বামীর কথাগুলোর মধ্যে যে যথেষ্ট যুক্তি আছে তাতে সন্দেহ নেই। স্বামীর কথা সে কখনও অমান্য করে না। তাছাড়া সে যদি না যায় তবে স্বামীকে যে পাঁচজনের পাঁচরকম বাঁকা কথা শুনতে হবে তাও শৈল বুঝে। স্বামীকে কখনও সমালোচনার পাত্র করে তুলতে চায় না সে। তাই মনের অনিচ্ছে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শৈলও ঢাকা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। তাছাড়া প্রথম যাত্রায় স্বামীও যে সঙ্গে যাচ্ছেন এতেও মনটা একটু প্রফুল্ল হল।

শুভদিন দেখে মহেশ পরিবারের সবাইকে নিয়ে রওনা হল। নূতন বাড়ীতে একটু গোছগাছ করে দেওয়ার জন্য দেবেন্দ্রও সঙ্গে গেল। দু'একদিন থেকে সব গুছিয়ে দিয়ে সে বাড়ী ফিরে আসবে।

ঢাকায় এসে সবাই খুব খুশী। বিশেষ করে গঙ্গামণি ও তার দুইবোন। বাড়ীতে থাকতে মামলা হেরে যাওয়ার জন্য মনে সর্বক্ষণ যে অশান্তির আগুন জ্বলত এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সেটা খানিকটা ভুলে থাকতে পারছেন তারা। তাছাড়া এখানে মেয়েদের সুখেস্বচ্ছন্দে থাকার চমৎকার ব্যবস্থা করেছে মহেশ। গ্রামের বাড়ী মস্ত খোলামেলা হলেও ঘরগুলো কাঁচা। এখানে ঝকঝকে চারকোঠার দালান। উঠান পর্যন্ত পাকা। মাঝের ঘরটি হল ঘরের মত বড়, অপর দুটি ঘর মাঝারি। আর একটি ঘর ছোট। মাঝের ঘরটিতে গঙ্গা, গুণ,সৌভাগ্য, অবনী,ক্ষীরোদা এবং ঝি ফুলি অর্থাৎ ফুলরানীর থাকার ব্যবস্থা হল। ঘরটি এত বড় য়ে এতগুলো লোকও দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে থাকতে পারে। মাঝারি ঘর দুটির প্রথম দিকের ঘরটাতে মহেশ ও সরযূর আর শেষের দিকের ঘরটিতে নবদুর্গা ও শৈলর থাকার ব্যবস্থা হল। শৈল ফিটফাট থাকতে খুব ভালবাসে। বেশী লোক থাকলে শৈল হয়ত ঘরটি নিজের মনের মত গুছিয়ে রাখতে পারবে না তাই গঙ্গা নবদুর্গার সঙ্গে শৈলর থাকার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ নবও ছোটবেলা থেকেই বেশ গুছানো স্বভাবের। সবচেয়ে ছোট ঘরটা ঠাকুরের ঘর করা হয়েছে। আর উঠানের শেষ সীমায় সদর দরজার কাছে যে ছোট টিনের ঘরটা আছে। সে ঘরে মহেশ সকাল বিকাল মক্কেল নিয়ে বসে। আর রাত্রে চাকর বিপিন সে ঘরে ঘুমায়। দিব্যি ব্যবস্থা।

ঢাকায় জীবনযাত্রা চলছে বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে। সবাই বেশ আনন্দে ও আরামে আছে। বড় ছেলে সৌভাগ্য ও ভাগ্নে অবনীকে মহেশ স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। সরযূও বাপের বাড়ী থেকে চলে এসেছে ঢাকার বাসায়। শিশুসন্তানসহ বউকে বেশীদিন বাপের বাড়ী ফেলে রাখা যে ঠিক নয়, এত ঝামেলার, মধ্যেও মহেশের এ ব্যাপারে লক্ষ্য আছে। তার ব্যবস্থাপনার মধ্যে এতটুকু ত্রুটি নেই।

বাড়ীর মেয়েরা অনেকেই শহর দেখেনি। ছেলেরা পড়াশুনার জন্য, চাকরীবাকরীর জন্য শহরে যায় এবং থাকে। কিন্তু মেয়েদের বেশীর ভাগেরই যাতায়াত শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম থেকে বাপের বাড়ীর গ্রাম ঐ পর্যন্তই। কার্যকারণে যখন শহরে বাসা নেওয়া হয়েছে তখন বাড়ীতে সবসময় ঘরকন্নার কাজ নিয়ে ব্যস্ত না থেকে একটু বাইরে বেরোলে মেয়েদের একঘেঁয়েমী একটু দূর হবে। এজন্য মহেশ প্রায়ই ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে মেয়েদের শহরের দ্রষ্টব্যস্থানগুলো দেখাবার ব্যবস্থা করে। সরযূ ছাড়া বাড়ীর মেয়েরা কেউই শহর দেখেনি। তাই তারা শহরের

জাঁকজমক দেখে মুগ্ধ হয়, খুশীও হয়। যে শৈল ঢাকায় আসতেই চায়নি সেই শৈল পর্যন্ত শহরের এটা ওটা দেখে দারুণ খুশী। শৈল গ্রামের মেয়ে। কিন্তু তার মনটা বড়ই আধুনিক। শহরের ছিমছাম জীবনযাত্রা তার খুবই পছন্দ। সংসারের ঝামেলা মিটে গেলে সে দেবেন্দ্রকে বলবে যেন একটা চাকরী নিয়ে শহরে চলে আসে। শৈলর শহরে থাকার খুবই আকাঙ্খা।

শুধু বেড়ানোই নয়। মহেশ মেয়েদের হাতে স্বাধীনভাবে কিছু কিছু কেনাকাটা করার টাকাও দিয়ে দেয়। বাসায় ফেরার পথে সবাই নিজের নিজের পছন্দমত টুকিটাকি জিনিষ কিনে নিয়ে আসে। ফলে বেড়ানোর দিনটা খুবই আনন্দের দিন হয়। মেয়েদের সুখসুবিধা আনন্দের দিকে মহেশের খুব লক্ষ্য আছে। এজন্য ভাশুরঠাকুরের প্রতি শৈলর শ্রদ্ধা বাড়ে।

সংসারের দায়দায়িত্ব বরাবরই নবদুর্গার উপরেই ছিল।শৈল বউ হয়ে আসার পর তিনি শৈলর উপর কিছুটা দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। ঢাকায় এসে তিনি একেবারে গা এলিয়ে দিয়েছেন। মেজবউ শৈলর উপরে সব দায়দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তিনি বেশীর ভাগ সময়েই শ্যামসুন্দরের পূজাপাট নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। নিরামিষ হেঁশেলটা ক্ষীরোদা সামলায়। আর বাকী সবই শৈলর উপর ঢাকার বাসায় এসে নবদুর্গা পূর্ণ বিশ্রামে আছেন।

শৈলর বয়স অল্প হলেও সংসারের সব কাজ সে চমৎকার গুছিয়ে করে। রান্নাবান্না পরিবেশন, গুরুজনদের সেবাযত্ন, বাচ্চাদের দেখাশোনা, ঘরদোর গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি সব দিকেই তার সমান লক্ষ্য ও নৈপুণ্য। এতসব কাজের পরেও তার বেশবাস খুবই পরিপাটি। সরযূর দামী শাড়ীর আঁচলের মত তার কমদামী শাড়ীর আঁচল মাটিতে লুটায় না। তার স্বল্প স্বর্ণালংকারের খাজে খাজে সরযূর মত ময়লা জমে থাকে না, সিঁদূরের টিপ কখনও লেপ্টে যায় না। শৈল সবসময়ই ফিটফাট। শৈলর গুণের অন্ত নেই। কিন্তু সব গুণেরমধ্যে দোষ একটাই। সে কাউকে তোয়াক্কা করে কথা বলে না। অবশ্য তার এই দোষটুকু কেউ আর এখন ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। যে অমন সংসার মাথায় করে রেখেছে, সে না হয় বললই দুটো কথা। তাতে কিছু যায় আসে না। বরং তার পরিপাটী কাজকর্মের জন্য বাড়ীর সবার মুখে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। বিশেষ করে নবদুর্গা তার উপরে খুবই সন্তুষ্ট। কারণ নবদুর্গা অগোছালো কাজকর্ম দু'চোখে দেখতে পারেন না।

বাড়ীতে মেজবউয়ের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে অকর্মা বড়বউয়ের অকর্মণ্যতা,

অধমন্যতা ও লাগামছাড়া স্বভাবের নিন্দামন্দও সমান তালে চলে। বড়বউ সরযূ সে সব শুনেও কোন উচ্চবাচ্য করে না, রাগও করে না, বড়ই গোবেচারা মানুষ সে। সবাই নিন্দামন্দ করলেও মুখরা শৈল কখনও বড়জাকে কোন অপ্রিয় কথা বলে না। দু'জনের মধ্যে খুবই প্রীতির সম্পর্ক। শৈল বুঝে, বড়জা অলস হলেও বড়ই সাদামনের মানুষ। যার মন সুন্দর, শৈল তার গোলাম। তাই শৈল বড়জাকে খুবই ভালবাসে, তার দোষত্রুটি গুলো যথাসম্ভব সামলে রাখে।

প্রায় বছর দুই হয়ে গেল বাড়ীর সবাই ঢাকায় আছে এবং মহেশের উপার্জনের উপরই এতবড় পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে। মহেশ পরিবারকে যারপর নাই সুখে রেখেছে। পূর্বকথামত দেবেন্দ্রও প্রায়ই আসে ঢাকার বাসায় শৈলকে দেখে যাওয়ার জন্য। মহেশ যেমন সুচারুরূপে পরিবারের ভরণ পোষণ করছে তেমনি দেবেন্দ্রও খুব হিসেব করে চলে সম্পত্তির আয় দিয়ে ঋণের অনেকটাই শোধ করে ফেলেছে। শচীন্দ্রের আইন পড়াও শেষের পথে। পাশ করে সেও কাজে লেগে যাবে। রায় পরিবার যে ভীষণ আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়েছিল। তা এখন প্রায় সমাধানের পথে।

গঙ্গামণি এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন। সবদিক দিয়ে যে দুর্দৈবের মধ্যে পড়েছিলেন, ছেলেদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমে এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে তার অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন। মহেশ সত্যিই বড় বুদ্ধিমান ছেলে। তার পরামর্শমত চলেই এত সহজে এই বিষম বিপদ কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে। মহেশের মত ছেলের মা বলে গঙ্গা মনে মনে গর্ববোধ করেন। শচীন্দ্র কাজে যোগদান করলেই তিনি বাড়ীতে দালানের কাজ শুরু করে দেবেন। শরীকদের দেখিয়ে দেবেন মিথ্যাচার করে সম্পত্তি কেড়ে নিলেও রায় পরিবার মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়ে আছে, ভেঙ্গে পড়েনি। এসব কথা নিয়ে তিনবোন মিলে নানা জল্পনা কল্পনা করেন।

শৈলবালার ঢাকায় আসার এতটুকু ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আসার পর বেশ কিছুদিন শহরের জীবন তার কাছে খুবই ভাল লেগে গিয়েছিল। প্রথমদিকে দেবেন্দ্রও প্রায়ই আসত ঢাকায়। ইদানীংকালে ঋণশোধ নিয়ে সে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে ঘনঘন ঢাকায় আসা সম্ভব হয়ে উঠেনা। তাছাড়া তেমন প্রয়োজনও বোধ করে না। কারণ ঢাকার বাসায় শৈল বেশ মানিয়ে নিয়েছে। কাজেই শৈলর জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই।

এতদিন সবকিছু বেশ ভালই চলছিল। কিন্তু অল্প কিছুদিন হল একটা

বিশেষ কারণে শৈল মনে মনে বড়ই অস্বস্তিতে আছে। তার অস্বস্তির কারণ স্বয়ং ভাশুর ঠাকুরই যার তত্ত্বাবধানে শৈল এখানে আছে। ভাশুরঠাকুরের মনোভাব যে শৈলর প্রতি মোটেই ভাল নয়,সেটা বুদ্ধিমতি শৈলর কাছে খুবই স্পষ্ট। ভাশুরঠাকুব সবসময় তাকে একা পাওয়ার সুযোগ খুঁজেন এবং তাকে একা পেলেই অযাচিতভাবে তার রূপগুণের প্রশংসা করেন আর সরযূর রূপগুণের ঘাটতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাছাড়া ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন সব কথা বলেন,তাতে শৈল কেন, যে কোন মেয়েই বুঝতে পারবে যে তিনি শৈলর সঙ্গে গোপনে অবৈধ প্রণয় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ব্যাকুল। ভাশুরঠাকুরের মত এমন বিদ্ধান সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ সম্পর্কে চট করেতো এসব কথা কাউকে বলা যায় না। তাই শৈল কাউকে কিছু না বলে মনে মনে খুবই সতর্ক হয়ে যায়। আগের মত ভাশুরঠাকুরের ব্যক্তিগত কাজগুলির জন্য নিজে এগিয়ে না গিয়ে কৌশলে সরযূকে এগিয়ে দেয়। নিজে নিরাপদ দূরত্বে থাকে। তবে এ সুবিধাটাও বেশীদিন রইল না। সরযূ তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিতে চলে গেল আবার বাপের বাড়ী। শৈল বেশ একটু ফাঁপরেই পড়ে গেল। তবে অবস্থামত ব্যবস্থা নেওয়ার বুদ্ধিটা শৈলর ভালই আছে। তাই সে নবদুর্গাকে বলল,"ছোটমাসী, যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলি। ভাশুরঠাকুরের বিকালের জলখাবারটা ওরাতের খাওয়ার জলটা আর সন্ধেবেলা ঘরে লন্ঠনটা জ্বালিয়ে দেওয়া ওগুলো যদি একটু কষ্ট করে আপনি করেন,তাহলে খুব ভাল হয়।"নবদুর্গা খুবই বিস্মিত হয়ে বললেন. "কেন ? ওগুলোত বরাবর তুমিই করে এসেছ, এখন আমাকে বলছ কেন? তোমার অসুবিধেটা কি?"শৈল বলল," আগেতো দিদি ছিল, দিদিকে সামনে রেখে সব করেছি, এখনত দিদি নেই। ভাশুরঠাকুর মান্য মানুষ। যদি কখনও কোন ক্রটিবিচ্যুতি করে ফেলি এই একটা ভয় আর কি! আর কিছু নয়।" নবদুর্গা বললেন, "তাই বল। আমি ভাবলাম অন্য কোন কারণ আছে বুঝি। ভাশুরকে মান্যগন্য করাটাই স্বাভাবিক। তা তুমিত মা মান্যিগন্যি তেমন কাউকে করনা, মহীর প্রতি তবু তোমার মান্যিটা আছে দেখে খুশী হলাম। ঠিক আছে। ওগুলো আর তেমন কি কাজ? আমিই ওর জলখাবারটাবার দিয়ে আসব।" ছোটমাসী তার স্বভাব নিয়ে একটু খোঁচা দিলেও শৈল আপাততঃ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু শৈলর সাবধানতা সত্ত্বেও ব্যাপারটা মোটেই থেমে থাকছে না। ইদানীং মহেশের আচরণে আর কোন আবরণ নেই। যে কোন সময় সে কোন ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে। অথচ শৈল মুখ ফুটে কাউকে

কথাটা বলতে পারছে না। মহেশ পরিবারের সবার মনেই উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত। তার সম্বন্ধে এ ধরনের কথা বললে কেউ বিশ্বাসতো করবেই না, বরং শৈলরই নিন্দা হবে। এক বলা যায় দেবেন্দ্রকে। কিন্তু সেওতো অনেকদিন ধরে আসছে না। তাছাড়া সেই বা কতটুকু বিশ্বাস করবে কে জানে। কারণ বড়দাদা পরিবারের দেবতাস্বরূপ। বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, তবু তাকে বলা যেত এবং এখান থেকে সরে পড়ার একটা ব্যবস্থা ও করা যেত। কিন্তু সম্পত্তি, ঋণ এসব নিয়ে সে এত ব্যস্ত যে স্ত্রীর খোঁজ নেওয়ার তার সময় হয় না। দেবেন্দ্রের উপর শৈলর খুব অভিমান হয়। চিন্তা ভাবনায় রাতে শৈলর ঘুম আসে না। বিছানায় শুয়ে ছটফট করে রাত কাটায়। একঘরে থেকে শৈলর যে ইদানীং রাত্রে ঘুম হয় না তা ছোট মাসী টের পান। মনে মনে ভাবেন, দীর্ঘদিন ধরে বউটা স্বামীকে ছেড়ে আছে। নিশ্চয় স্বামীর জন্য মন কেমন করে বলে ঘুম আসে না। মেজদিদিকে বলবেন শৈলকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে। অভিভাবক হিসাবে তিনিই তো সঙ্গে যেতে পারেন। কারণ ঢাকায় তারও আর ভাল লাগছেনা। কিন্তু বলি বলি করেও নবদুর্গার কথাটা মেজদিদিকে বলা হয়ে উঠেনি।

দিন দিন ব্যাপারটা শৈলর কাছে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। এখন প্রকাশ্যেই কুপ্রস্তাব চলছে। মহেশ যতই এগিয়ে আসছে, শৈল ততই গুটিয়ে থাকছে। এভাবে আর কতদিন চলতে পারে? দেবেন্দ্রকে যে গোপনে একটা চিঠি লিখবে তারও উপায় নেই। এ বাড়ীতে গোপনে চিঠি ডাকে দেওয়া সম্ভব নয়। গোপনে ছোটমাসীকে বলা যায় কিনা তাও ভাবল শৈল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস হল না। কিন্তু যদি সাহস করে সে বলত, তবে ভবিষ্যতের জন্য ফল ভালই হত। কারণ মহেশের অনেক গুণ থাকাসত্ত্বে নারীঘটিত যে একটা দুর্বলতা আছে, তা মা মাসীদের অজানা নয়। সুন্দরী মেয়ে দেখলে তার স্থানকালপাত্র জ্ঞান থাকে না। এমন দু'একটা ঘটনা অতীতেও ঘটেছে। গঙ্গা কোন মতে সে সব ধামা চাপা দিয়েছেন। শৈল এসব জানে না। তাই পরিবারের দেবতুল্য মানুষটির সম্পর্কে এ ধরণের কথা বলার সাহস তার স্বাভাবিকভাবেই হয়নি।

এদিকে মহেশ মনে মনে মরিয়া হয়ে উঠেছে। শৈলকে তার চাইই,মহেশ যা চায় তা করায়ত্ব না করে ছাড়েনা। শৈল রমণী রত্ন, রূপেগুণে অতুলনীয়া। এ রত্ন মহেশকেই শোভা পায়, বিদ্যাবুদ্ধিহীন সস্ত.চেহারার দেবেন্দ্রকে নয়। তার হৃদয়লোকে চিরদিন যে নারীর স্বপ্ন ছিল শৈল সেই নারী। কিন্তু ভাগ্যদোষে সেই

নারী তার জীবনে এল না। ছিটকে গিয়ে পড়ল দেবেন্দ্রের হাতে। আর তার ভাগ্যে জুটেছে দুই দুইটি নিকৃষ্টতম রমণী। যেমন তাদের রূপ তেমনি গুণ। রাধারানীত ছিল হাবাগোবা একটা পুঁচকে মেয়ে। বাবা সাধ করে সেই মেয়েকে তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। যাক্ অকালে মরে গিয়ে সে মহেশকে মুক্তি দিয়েছে। আর সরযূ? সেত কালো কুৎসিত একটা জড়পিণ্ডমাত্র। পয়সার জোরে তার বাপ তাকে মহেশের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন। আপাতঃদৃষ্টিতে সংসারে তার সবই আছে। কিন্তু হৃদয় তার শূন্য। এই শূন্য হৃদয় প্রবলবেগে শৈলর দিকে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই শৈলকে বাগে আনা যাচ্ছে না। শৈল তার প্রতি বড়ই বিমুখ। মহেশ বুঝতে পারে না কোনগুণে শৈল দেবেন্দ্রের প্রতি এতটা অনুরক্ত। শৈলকে দেবার মত কি আছে দেবেন্দ্রের? অথচ মহেশ তাকে কি না দিতে পারত? সোনা রূপা হীরা মণি মানিক্যের অলংকারে তার সোনার শরীর জড়িয়ে রাখতে পারত, তার হৃদয় উৎসারিত প্রেমের বন্যায় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারত। আর তাতে সামাজিক মর্যাদার হানিও কিছু ঘটত না। তারা দু'জন একমত হলে কাকপক্ষীও ব্যাপারটা টের পেত না। কিন্তু অহঙ্কারী শৈল চূড়ান্ত ঘৃণার সঙ্গে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। কিন্তু শৈল জানে না যে মহেশ যা চায় সেটা সোজাভাবে না পেলে সেটা সে ছিনিয়ে নিতে জানে। মন না দিলেও শরীর তাকে দিতেই হবে। মহেশ শৈলর উপর তার কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য মনে মনে পশুবৎ হয়ে সুযোগ সন্ধান করতে লাগল, কারণ শৈলর মন পাওয়ার আশা যে নেই তা সে ভাল করেই বুঝে নিয়েছে।

কামপ্রবৃত্তি মানুষকে অন্ধ করে দেয়। অজ্ঞান করে দেয়। কামান্ধ ব্যক্তির বিদ্যাবুদ্ধি বিচার বিবেচনা সব লোপ পেয়ে যায়। পশুবৎ আচরণ করতে তার কোন সংকোচ বা দ্বিধা থাকে না। কামের উন্মাদনায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজেকেই সে নরকে নিক্ষেপ করে। মহেশের অবস্থা হয়েছে তাই। এমনিতে তার গুণের অন্ত নেই। কিন্তু ঐ একটি দোষকে সংযত করতে না পেরে সে নিজেকে যে পশুর স্তরে নামিয়ে আনছে সে বোধ তার বিলুপ্ত হয়েছে। শুধুমাত্র একটি নারীর তনুদেহখানি ঘিরে তার কামনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। কামপ্রবৃত্তি মানুষকে যে কত নীচে নামিয়ে আনতে পারে, মহেশ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

শৈল ও মহেশের মধ্যে যে এই ভয়ানক কীর্তিকান্ডচলছে তা বাড়ীর কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। শৈল মহেশ উভয়েই যার যার কর্তব্য বেশ ঠিকঠাক করে

যাচ্ছে। কারোর ব্যবহারের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নেই। বাড়ীর সব কিছু স্বাভাবিক ভাবেই চলছে। ছুটিতে শচীন্দ্র এসেছে বাড়ীতে । তাই স্বাভাবিকভাবেই খাওয়া দাওয়ার ধূম আছেই। আজ পিঠে, পায়েস, কাল পোলাও মাংস ইত্যাদি লেগেই আছে। রান্না ও জলখাবার করতে শৈলর ভালই লাগে। কিন্তু মনের এই অবস্থায় কিছুই যেন ভাল লাগে না। তবু সবকিছু তাকেই ক রতে হয়। কাজ করতে করতে সে একা একা কাঁদে। এমনি করেই তার দিনের পর দিন কেটে যায়।

দুই ছেলের পর মহেশের একটি মেয়ে হয়েছে বলে সবাই খুশী। আগের সংসারের ছেলেকে নিয়ে মহেশের এখন তিন ছেলে এক মেয়ে। গঙ্গা নাতনীকে দেখে আসার জন্য মহেশকে তাগাদা দিচ্ছেন। কিন্তু ব্যস্ত মানুষ মহেশের সময় হয়ে উঠছে না। বাড়ীর খবরও ভালই। কাজেই এখন বিশেষ কোন চিন্তা ভাবনার কারণ নেই। গঙ্গারা তিনবোনেই বেশ প্রশান্ত মনেই আছেন। ঋণটা পূরাপুরি শোধ হয়ে গেলেই তারা বাড়ী ফিরে যাবেন। তারা গ্রামে থেকেই অভ্যস্ত। বাসাবাড়ীতে বেশীদিন তাদের ভাল লাগে না। অবশ্য বাড়ী যাওয়ার আলোচনাটা তিনবোনের মধ্যেই সীমাবন্ধ। সময় এলে মহেশকে তাদের ইচ্ছাটা জানানো হবে।

এই পরিস্থিতি তেই ন্যক্কারজনক ঘটনাটা ঘটে গেল। এতদিন ধরে যা চলছিল অন্তরালে তা প্রকাশ্যে এসে গেল। শেষরক্ষা হল না। সেদিন ছিল একাদর্শী। একাদর্শী দিন ছোটমাসী নির্জলা উপোস করে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত শ্যামসুন্দরের পূজা অর্চ্চনা করেন। শৈল দরজা ভেজিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। ছোটমাসী পূজাপাট সেরে দরজায় খিল লাগিয়ে শয্যাগ্রহণ করেন। ঢাকা আসা অবধি এই নিয়মই চলছে। সেদিনও ছোটমাসী ঠাকুর ঘরে, শৈলর চোখে সবেমাত্র একটু ঘুম নেমেছে,তখন অসুরের বল নিয়ে তার মুখ চেপে কে যেন তাকে জাপটে ধরেছে। শৈল মুর্হুতেই বুঝতে পারল কে এবং ঘটনাটা কি? কিন্তু এই আসুরিক বলের সঙ্গে তনুদেহী শৈলরতো পেরে উঠবার জো নেই। নিরুপায় শৈলর মনে হল সে তার সর্বস্ব হারাতে চলেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! হঠাৎ শৈলর মধ্যে যেন মহাশক্তি স্বয়ং প্রবিষ্ঠ হয়ে তাকে আত্মরক্ষার অমিতশক্তি যোগালেন। এক ঝটকায় শৈল শক্তিমান পুরুষ মহেশকে ঠেলে দিল এবং তার নিজের অজান্তেই ছোটমাসী বলে বুকফাটা চীৎকার করে উঠল। ঠাকুর ঘরতো কাছেই। শৈলর আর্ত চীঙ্কারে মূহুর্তে নবদুর্গার ধ্যান ভেঙ্গে গেল ছুটে এলেন তিনি এবং ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্যর্থ, ক্রুদ্ধ মহেশ ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইছিল, কিন্তু শৈল

বজ্রমুষ্টিতে তার ধুতির খুঁট চেপে ধরে চীৎকার করতেই থাকলো। আর এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সন্মুখীন হয়ে মহেশ বিভ্রান্ত, হত চকিত,তার সমস্ত শারীরিক বল অর্ন্তহিত। তাই কিছুতেই সে শৈলর বজ্রমুষ্টি থেকে নিজেকে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ছাড়িয়ে নিতে পারছিল না। বিধিবাম মহেশের।

শৈলর আর্তচীৎকারে গঙ্গা গুণরও ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারা মুহূর্তে ছুটে এলেন শৈলর ঘরে। তাদের পিছনে ক্ষীরোদা শচীন্দ্রও এল এবং সবাই মহেশ ও শৈলকে তদবস্থায় দেখল। শৈলর বেশবাস বিপর্যস্ত. এলোচুল ছড়ানো, কপালের সিঁদুর লেপ্টে গিয়ে সমস্ত কপাল লাল, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। শৈল য়েন সাক্ষাৎ চামুণ্ডা চণ্ডিকা। শৈলর এই ভীষণ মূর্তি এবং ঘটনা দেখে সবাই স্তম্ভিত, বাক্‌শক্তিরহিত।

গুণমণি এমনিতে খুব আলগা স্বভাবের মানুষ। কিন্তু মাঝে মাঝে তার অদ্ভুত উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনা দেখে গুণ দ্রুত গিয়ে বড়ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন। কারণ গোলমাল শুনে সৌভাগ্য অবনী ওরাও বেরিয়ে এসে এই মহালজ্জাকর দৃশ্য দেখে ফেলতে পারে।

দুঃখে লজ্জায় অপমানে গঙ্গামণি যেন মরমে মরে গেলেন। কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য শৈলর খুব কাছে গিয়ে অনুচ্চস্বরে বললেন, ছি! এ কি করছ মা? ছেড়ে দাও। গঙ্গা একথা বলামাত্র শৈল মহেশের ধুতির খুঁট ছেড়ে দিল। মহেশ দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার তাকে এতটুকু লজ্জিত মনে হল না। তার অবয়বে লজ্জার চেয়ে ক্রোধ ও আক্রোশই ফুটে উঠেছে বেশী। কাম-প্রবৃত্তি যে মানুষকে পশুর চেয়েও অধম এবং চূড়ান্ত নির্লজ্য করে তুলতে পারে আজ এই দৃষ্টান্তই সবার চোখের সামনে স্থাপন করল মহেশ।

এই মহাকেলেঙ্কারী কাণ্ড দেখে সবাই স্তব্ধ. স্তম্ভিত, শুধু শৈলর মুখে গালিগালাজের তুবড়ি ছুটছে। এত রাত্রে এ ধরনের চেচাঁমেচিতে পড়শীদের ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে এবং কৌতুহলী পড়শীরা ব্যাপার কি জানার জন্য যদি ছুটে আসে তবে কলঙ্ক রাষ্ট্র হয়ে যাবে। কারণ শৈলর মুখে কোন আগল নেই। তার গালিগালাজ শুনেই যে কোন লোকের ঘটনা বুঝে নিতে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু শত চেষ্টা করেও শৈলকে থামানো যাচ্ছে না। এমন সময় দিশাহারা শচীন্দ্র এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। হাউমাউ করে কেঁদে সে শৈলর দু'পা জড়িয়ে ধরে

তার পায়ে মাথা কুটতে কুটতে বলল,''ক্ষমা কর বৌঠান, ক্ষমা কর, আমি মিনতি করছি, তুমি দয়া করে চুপ কর। নইলে আমি তোমার পায়ে মাথা কুটতে কুটতে মরে যাব। আমি আর সইতে পারছিনে।'' শচীন্দ্রের চোখের জলে শৈলর পা ভিজে গেল এবং শৈল শচীন্দ্রর এই অদ্ভূত আচরণে হকচকিয়ে গিয়ে আপনিই থেমে গেল এবং নিজের অজান্তেই তার মন শচীন্দ্রের প্রতি মমতায় ভরে গেল। সে দু'হাত দিয়ে শচীন্দ্রকে তার পা থেকে টেনে তুলল এবং মায়ের মত মমতায় সে নিজের শাড়ীর আঁচল দিয়ে শচীন্দ্রের চোখের জল মুছিয়ে দিল। তারপর সীমাহীন দুঃখে ক্লান্তিতে সে বিছানায় এলিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

গঙ্গামণি চিরদিনই অসাধারণ স্থিরবুদ্ধি সম্পন্ন যে কোন পরিস্থিতিতেই তিনি ধৈর্য রাখতে জানেন। তাই এই কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি বিচলিত না হয়ে কি করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায় সেজন্য তৎপর হলেন। ঘটনার প্রাথমিক উত্তেজনা সামাল দেওয়াই এখন বড় কাজ পরে অন্য চিন্তা। বউকেও কোনমতে শান্ত করতে হবে। মহেশকেও লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। গঙ্গার সামনে উভয়সংকট। তিনি আত্মধিক্কারে মরমে মরে যেতে লাগলেন। কাবণ মহেশের স্বভাবের এদিকটা তার একেবারে অজানা নয়। তাই সুন্দরী বউকে তার এভাবে এখানে নিয়ে আসা উচিত হয়নি। বউকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেই হত। সংসারের কাজকর্মের সুবিধাটাই তিনি বড় করে দেখেছেন বলেই আজ এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারটা যে এখানেই শেষ হবে তা নয়। কারণ মহেশকেতো তিনি জানেন। তার সবই ভাল। কিন্তু এই একটা বড় দোষ। এসব দিকে যদি তার রোখ চাপে তবে ছাড়ানো খুবই মুস্কিল। দেবুকেই বা কি জবাব দেবেন তিনি? ভবিষ্যতে এ নিয়ে যে এক ভয়াবহ পারিবারিক সংকট সৃষ্টি হবে তাও তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারছেন। যাক যা হবার তাতো হয়েই গেছে। এখন আপাতপরিস্থিতি সামাল দেওয়া দরকার। তাই তিনি ছুটে গেলেন মহেশের কাছে। ভাগ্য গুণে তার ঘরের দরজা খোলাই ছিল। গঙ্গা ঘরে ঢুকে দেখলেন, কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে মহেশ। কম্বল সরিয়ে গঙ্গা তার কপালে হাত রাখলেন এবং ঘটনার উপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে বললেন ''বেয়াড়া বউটা যে শেষ পর্যন্ত এমন একটা কাণ্ড করে বসবে, আমিত ভাবতেই পারিনি বাবা' এজন্য তুই মনে কোন দুঃখ লজ্জা নিস্ না। তুই এত নামী উকীল তার উপর চার সন্তানের বাপ। তোর পক্ষে কি এ ধরনের একটা পুঁচকে মেয়ের সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করা সম্ভব? এটা

পরিবারের কেউই বিশ্বাস করবে না। তুই হয়ত ছোটমাসীর কাছে জলটল চাইতে গিয়েছিলি, আর বউটা কি বুঝতে কি বুঝেঅমন ভীষণ গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছে। ভীষণ উগ্র স্বভাবের মেয়ে আবার রূপের গুমরে সবসময় টং হয়ে আছে। কাজেই ওর পক্ষে কোন কুকর্মই অসম্ভব নয়। লবঙ্গের কথায় কি কালসাপই না ঘরে এনেছি। ও মেয়ে আমার সংসার ছারখার করে ছাড়বে।" কথাগুলো বলে গঙ্গা অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। মায়ের কথার মধ্যে, কান্নার মধ্যে যদিও একটা মিথ্যার আবরণ ছিল, তবু সেটা মহেশের মনে আত্মপক্ষ সমর্থনের শক্তি যোগাল। গঙ্গার কথার রেশ ধরে মহেশ বলল, 'তুমি মা বলেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ। কিন্তু অন্যরা বুঝবে কেন ? আজ ঘরে খাবার জল রাখা হয়নি। ছোটমাসীর কাছে জল চাইতেই গিয়েছিলাম। আর বললে তুমি বিশ্বাস করবে না মা, অমনি তোমার বজ্জাত বউ আমার ধুতি চেপে ধরল। লজ্জায় হতবুদ্ধি হয়ে আমি তার হাত ছাড়িয়ে নিতে পারিনি। তাছাড়া ওকে ছাড়াতে গেলে ওর হাত ধরতে হয় তাই বা আমি করতে যাব কেন বল ? আমার স্ত্রী সন্তান সবই রয়েছে। আমার কিসের অভাব যে ওর দিকে তাকাব। তুমিই ভেবে দেখ মা।" গঙ্গা বললেন,"সেত আমি প্রথমেই বুঝে নিয়েছি। নইলে তোকে এত কথা বললাম কেন ? যাহোক বউটা যত বদস্বভাবেরই হউক, তোর আমার কাছেতো ছেলেমানুষ। ওকে তুই এবারের মত ক্ষমা করে দে। পরের ব্যবস্থা আমি করব।" মহেশ কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে বলল," ওসব ক্ষমাটমার প্রশ্নই আর আসেনা মা। আমি সংসারের জন্য অনেক করে ফেলেছি বলেই আজ আমাকে এমন অপদস্ত হতে হল। যাক সবই আমার ভাগ্য। তবে তোমার ঐ বউকে আমি আর একদণ্ডও আমার বাসায় রাখতে রাজী নই। তুমি এখনই ওকে দূর করে দেবার ব্যবস্থা করগে। আমার আর কিছু বলার নেই।" গঙ্গা ছেলের কথায় সায় দিয়ে বললেন," সে তো ঠিকই বলেছিস। কিন্তু এক্ষুণি তো কিছু করে উঠতে পারবনা বাবা। ঘরের বউকে রাস্তায় বার করে দিলেত আমাদেরই মান খোয়া যাবে। দেবুকে খবর পাঠাব। সে না আসা পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না। এটুকু সময় তোকে ধৈর্য ধরতেই হবে। আর এ বউ যে ঘরের রাখার যোগ্য নয় তাও বুঝতে পারছি। যা হয় পরে ভাবব।" বলে গঙ্গা মহেশ সম্বন্ধে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

মায়ের সঙ্গে কথা বলে মহেশের মনের অস্বস্তির খানিকটা লাঘব হল। মা যে ঘটনাটাকে এমন বিপরীতমুখী করে সাজিয়ে তুলবেন তা সে কল্পনা ও করতে

পারেনি। মনে মনে মায়ের বুদ্ধির খুব তারিফ করল সে। এখন মায়ের প্রভাবে বাড়ীর সবাই যদি ঘটনাটাকে এমনিভাবে নেয়। তবে মহেশের মান বেঁচে যাবে আর শৈলই হবে নিন্দনীয়। তবে মহেশকে অপমান করলেও মহেশ শৈলকে ছেড়ে দেবেনা। মহেশকে শৈল চিনতে পারেনি। তবে একদিন না কেদিন শৈলকে মহেশের পরিচয় পেতেই হবে।

ওদিকে বাড়ীর সবাই মহেশের প্রতিক্রিয়া জানাব জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল। গঙ্গা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই বারান্দায় ছুটে এসে গঙ্গাকে ঘিরে দাঁড়াল। গঙ্গা কি কি কথা বলে মহেশকে খানিকটা স্বাভাবিক অবস্থায় এনেছেন তা বললেন এবং বাড়ীর সবাই অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করলে পরিস্থিতি অনেকটা আয়ত্ত্বে আসবে তাও বলে সবাইকে সর্তক করে দিলেন।

মহেশের খবর জানার জন্য সবাই যখন বারান্দায় ছুটে গেল , তখন ঘর ফাঁকা হয়ে যাওয়ার সুযোগে শৈল ভিতর দিকে খিল এঁটে দিল। মহেশ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে গঙ্গা যখন বউয়ের খোঁজ করতে গেলেন তখন দেখলেন বউ ঘরের ভিতর দিকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আবার দুশ্চিন্তা শুরু হল। বন্ধ ঘরে সে যদি আত্মহত্যাই করে বসে তবেতো আর রক্ষে নেই। বাড়ীশুদ্ধ লোককে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে আর মানসম্মানতো ধূলায় লুটাবে। তখন বাইরে থেকে ডাকাডাকি শুরু হল। কিন্তু ভিতর থেকে কোন সাড়া নেই। আতংকে সবারই হৃৎকম্প শুরু হল। শৈল যা জেদী মেয়ে, তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। আর অপমান অসম্মানটাওতো ওর কম হয়নি। মেয়ে হয়ে গঙ্গারা তিনবোনই তা উপলব্ধি করতে পারছেন। যে ভাবেই হউক দরজাটা খোলাতেই হবে। অজ্ঞান হয়েও তো পড়ে থাকতে পারে। তখন বাইরে থেকে ডাকাডাকি শুরু হল। কিন্তু ভিতর থেকে কোন সাড়া নেই। আতংকে সবার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার যোগাড় হল। শৈল যা ক্রোধী মেয়ে তারপক্ষে অনেক কিছুই করা সম্ভব।একগুঁয়ে, শৈল দেবর শচীন্দ্রের কথায় গালিগালাজ বন্ধ করেছিল। তাই শচীন্দ্রের কথায় সাড়া দিলেও দিতে পারে। এই ভেবে শচীন্দ্র সবাইকে দরজার সামনে থেকে চলে যেতে বলে সে অনুচ্চকণ্ঠে ডেকে ডেকে দরজা খোলানোর চেষ্টা করতে লাগল। খুবই অনুনয়ের স্বরে শচীন্দ্র বলল, ''দরজাটা একবার একটু খোল মেজবউঠান। তোমাকে শুধু দু'একটা কথা বলেই আমি চলে যাব। তারপর তোমার ইচ্ছে হলে আবার বন্ধ করে দিও দরজা,আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না।'' তার স্বরে এমন একটা

মিনতি ও প্রীতি মিশে ছিল যে তা বিধ্বস্ত শৈলর হৃদয় স্পর্শ করল। কিন্তু তবুও দরজা খুলল না সে। কারণ দরজা একবার খুললে যে আর বন্ধ করতে পারবে না, শৈল তা ভালই বুঝে। তাই দরজা না খুলে সে শচীন্দ্রের ডাকে সাড়া দিল। বলল,"তোমার যা বলার এখান থেকেই বলে ফেল। তোমার মেজদাদা না এলে দরজা খুলব না আমি। আমার দুর্ভাগ্য আমাকে একা থেকে ভাবতে দাও। আর দরজা খোলার জন্য তোমরা কেন এত অস্থির হচ্ছ তাও বুঝতে পারছি। বন্ধ ঘরে আমি কোন অকাজ কুকাজ করে তোমাদের কোন বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি এই তোমাদের ভয়। তবে এমন কোন কাজ আমি করব না। তাই তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যে যার কাজ করগে। আমাকে দয়া করে একটু নীরবে একা থাকতে দাও।" শচীন্দ্র একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বলল," ঠিক আছে। তোমাকে আর বিরক্ত করব না। তোমার মন একটু সুস্থ হলেই না হয় বলব। এখন আমি যাচ্ছি বউঠান।"

শৈলর কণ্ঠ এমন দৃঢ় ও শান্ত ছিল যে সবাই বুঝল দেবেন্দ্র না আসা পর্যন্ত দরজা সে খুলবে না। তবে অঘটন বিঘটন যে ঘটাবে না সে বিষয়েও নিশ্চিন্ত হয়ে সবাই যে যার মত চলতে লাগল। নেহাৎ যান্ত্রিকভাবে সংসারের কাজকর্মও সম্পন্ন হতে থাকল। নবদুর্গা রান্নাবান্না করে যথাসময়ে মহেশকে খেতে ডাকলেন। মহেশও স্বাভাবিক ভাবেই স্নান খাওয়া সেরে যথাসময়ে কোর্টে চলে গেল। তার মধ্যে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। অবনী,সৌভাগ্য, ঝি চাকর তারাও একটা কিছু যে ঘটেছে তা আঁচ করতে পারল বটে। কিন্তু আসল ঘটনা বুঝতে পারল না। তাই তারাও নীরব হয়ে রইল। তবে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চললেও বাড়ীতে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে লাগল।

মহেশ বাইরে স্বাভাবিকতা দেখালেও ক্রোধে আক্রোশে অপমানে ব্যর্থতায় সে জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল। ব্যর্থতা তার প্রবৃত্তির তাড়নাকে দ্বিগুণ করে দিয়েছে। তার ইচ্ছে হচ্ছে সমস্ত মানসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে সর্বসমক্ষে শৈলকে টেনেহিঁচড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিতে। কিন্তু সে ইচ্ছেতো পূর্ণ হবার নয়। তাই ব্যর্থ আক্রোশে তার ভিতরটা ক্ষুধিত সিংহের মত গর্জন করে চলেছে। অথচ বাইরে শান্তভাব বজায় রাখতে হচ্ছে। যার জন্য আজ তাকে এত যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে তাকে সে ছেড়ে দেবে না কিছুতেই। এটা তার জীবনপণ। আর মান সম্মান কি তার রেখেছে শৈল ? মা ব্যাপারটা যে মিথ্যা আবরণে ঢেকে দিতে চেয়েছেন তা আসলে ধোপে টিকবে না। মনে মনে বাড়ীর কেউই যে এটা বিশ্বাস করবে না এটুকু বোঝার মত

বুদ্ধি তার লোপ পায়নি। লোক জানাজানি যখন হয়েই গেছে তখন শৈলর এই তেজ সেইবা জীইয়ে রাখার সুযোগ দেবে কেন? একদিনের জন্য হলেও শৈলকে তার ভোগের সামগ্রী হতেই হবে। হার মেনে থাকা মহেশের চরিত্রে লেখা নেই। স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে তার ইচ্ছাপূরণের জন্য সে যে কত ভীষণ হতে পারে, সেটা তার অতিবুদ্ধিমতী মা গঙ্গামণিরও অনুমানের বাইরে। এব্যাপারে মহেশ ভয়ঙ্কর।

মহেশ খেয়ে দেয়ে কোঁটে গেলে বাড়ীর পরিবেশ একটু হালকা বোধ হল এবং গঙ্গা স্থিরচিত্তে ব্যাপারটা ভাববার অবকাশ পেলেন। শৈলর উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তা অনুভব করে দুঃখে শৈলর জন্য তার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। নেহাৎ মেয়েটা খুবই বুদ্ধিমতী বলে এই নরপশুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতেও যে এই নরপশু তার পিছনে থাবা উঁচিয়ে রাখবে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ মহেশকে তিনি চেনেন। মহেশের সবগুণ থাকা সত্ত্বেও নারীর প্রতি মোহ তার দুর্বার। কিন্তু তাই বলে নিজের এত কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী যে তার কন্যাসমা তার প্রতি যে সে এমন একটা মোহ পোষণ করবে এতটা গঙ্গা ভাবতে পারেন নি। এখন মনে হচ্ছে তার ভাবা উচিত ছিল। অসাধারণ সুন্দরী শৈলবে তার মহেশের এত কাছাকাছি নিয়ে আসা উচিত হয়নি। এখন গঙ্গা বউয়ের কাছে, দেবুর কাছে মুখ দেখাবেন কি করে। দেবু শান্ত হলেও মনে মনেতো বলবে হাঁড়িঠেলার জন্য শৈলকে নিয়ে এসে তিনি বাঘের মুখে ছেড়ে দিয়েছেন। এই যে বউটা জল পর্যন্ত না খেয়ে বন্ধঘরে পড়ে আছে, এ পাপ কার? এ পাপ তারই। কেন না তিনি কুসন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন বলেই না আজ শৈলর এত দুর্দশা। গঙ্গার অন্তর হু হু করে জ্বলতে লাগল। গুণমণি নবদুর্গাও শৈলর এই চরম লাঞ্ছনায় দুঃখে ম্রিয়মান। এমন কি যে ক্ষীরোদা সাতে পাঁচে থাকে না, সেও আজ শৈলর কষ্টে ভারাক্রান্ত। পরিবারের সবগুলো নারীহৃদয়ই যেন এক নারীর অপমানে অপমানিত ও ব্যথিত।

তিনদিন তিনরাত কেটে গেল। দেবেন্দ্র এসে পৌছল না। শৈলও দরজা খুলল না, স্নান করল না, জল পর্যন্ত খেল না। বাড়ীর লোকের উৎকণ্ঠার সীমা নেই, না খেয়ে শেষে যদি অজ্ঞান হয়ে যায়, তাই দরজা খোলার জন্য কিছু খেয়ে নেওয়ার জন্য বাইরে থেকে সবাই অনুরোধ উপরোধ করতে লাগল। কিন্তু ফল কিছুই হল না। বন্ধ দরজা বন্ধই রইল। তবে ডাকাডাকি করলে ভিতর থেকে ক্ষীণ সাড়া পাওয়া যায়। এটুকু নিশ্চিন্ততা। এ অবস্থায় বাড়ীর অন্যদেরও খাওয়া-দাওয়া

নেই বললেই চলে। প্রত্যেকের মনেই উদ্বেগ,উৎকণ্ঠা,একমাত্র মহেশ নির্বিকার।

সময় মন্দ হলে সবকিছুই গোলমাল হয়ে যায়। ডাকের গলযোগে দেবেন্দ্রখবরটা পেল একটু দেরীতে। তাই তার পৌঁছতেও দেরী হয়ে গেল। উদ্বিগ্ন দেবেন্দ্র চতুর্থ দিনে ঢাকায় এসে পৌঁছল। স্টেশনে নেমে শচীন্দ্রকে দেখে তার উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল। সাধারণতঃ সে ঢাকায় এলে কেউ স্টেশন থেকে নিতে আসেনা। নিশ্চয়ই কোন বড় রকমের বিপদ আপদ হয়েছে। নইলে তাড়াতাড়ি আসার জন্য তাকে টেলিগ্রামই করা হবে কেন আর শচীন্দ্রই বা স্টেশনে তাকে নিতে আসবে কেন? দেবেন্দ্র শচীন্দ্রের কাছে বাসার কারোর গুরুতর অসুখবিসুখ কিনা জানতে চাইল। শচীন্দ্র বলল,"সে সব কিছু নয়। তোমার এত চিন্তার কারণ নেই। যেতে যেতে সব বলছি তোমায়। অসুখ নয়, অশান্তি।"

শচীন্দ্র মায়ের নির্দেশে স্টেশন থেকে আসার পথে দেবেন্দ্রকে ঘটনার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়ার জন্যই গিয়েছিল। আগে থেকে কিছুটা জানা থাকলে পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য তার খানিকটা মানসিক প্রস্তুতি আসবে। হঠাৎ করে এ ধরনের একটা ঘটনা শুনলে সেই কিনা কি করে বসে বলাতো যায় না। দেবেন্দ্র এমনিতে খুবই শান্ত। কিন্তু একবার রেগে গেলে আর রক্ষা নেই। তাই ভয়ে ভাবনায় গঙ্গা এতটুকু হয়ে গিয়ে শচীকে পাঠিয়েছেন দেবুকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে আনার জন্য।

শচীন্দ্রের মুখে সংক্ষেপে ঘটনা শুনে দেবেন্দ্র যেন বজ্রাহত হয়ে গেল। কিন্তু বাইরে এতটুকু উত্তেজনা প্রকাশ করল না। অদ্ভুত এক শান্ত ভাব ধারণ করল সে। একদিকে সাধ্বী পতিপ্রাণা স্ত্রী, আর একদিকে জ্ঞানীগুনী মান্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কি করতে পারে সে এখন? সমস্ত পথ দেবেন্দ্র একটিও কথা বলল না। তার এই শান্তভাব দেখে শচীন্দ্র ভড়কে গেল। এই শান্ত ভাব কি প্রলয়ের পূর্বাভাস? শংকিত শচীন্দ্র চুপচাপ দেবেন্দ্রর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর পথে চলতে লাগল।

শৈলর বন্ধ ঘরের দরজায় দুইভাই এসে দাঁড়াল, শচীন্দ্র ডাকল,"দরজা খোল মেজ বউঠান! মেজদাদা এসেছে।" সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রও বলল, দরজা খোল শৈল! আমি এসেছি।" মুহূর্তে বন্ধ দরজা খুলে গেল। দেবেন্দ্র ঘরে ঢুকল আর তাদের দুজনকে একা কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য শচীন্দ্র তৎক্ষণাৎ সরে গেল। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে শৈল লুটিয়ে পড়ল স্বামীর পদপ্রান্তে। শৈলর চোখের জলে দেবেন্দ্রের পা ভিজতে লাগল। কিন্তু দেবেন্দ্র তাকে তুলতে চেষ্টা করল না, কান্না থামাতে বলল না, সান্ত্বনাসূচক কোন বাক্যও ব্যয় করল না। শৈল কেঁদে

চলেছে বাইরে ,আর দেবেন্দ্র কাঁদছে অন্তরে। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে দেবেন্দ্রের। সে শুধু পরিবার পরিজনদের কথাই ভেবেছে, শৈলর কথা ভাবেনি। শৈলরতো ইচ্ছে ছিল না ঢাকায় আসার। কেন সে জোর করে পরিবারের মুখ চেয়ে তাকে এখানে পাঠিয়ে এভাবে লাঞ্ছিত করল? নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না দেবেন্দ্র। শৈলর এই লাঞ্ছনা অপমানের জন্য দাদা মোটেই দায়ী নয়। দাদার প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ তার মনে ততটা স্থান পাচ্ছে না। এসব তারই পাপ্য। দাদা বরাবর পরিবারে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। আজ প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিবারের চোখে সে পঙ্কে নিমজ্জিত। দাদার নারীঘটিত দুর্বলতার কথা তারওতো জানা ছিল। তাসত্ত্বেও সে কেন শৈলকে এখানে পাঠাল? শৈলকে পাঠানোর অনিচ্ছাটা সে কেন স্পষ্ট করে বলতে পারল না? শৈলর লাঞ্ছনা অপমান আর দাদার কলংকের জন্য মূলতঃ সেই দায়ী। আর যদি কেউ দায়ী থাকে তিনি হলেন মা। দেবেন্দ্র চক্ষুলজ্জাবশতঃ তার অনিচ্ছার কথা বলতে পারেনি ঠিকই। কিন্তু মারতো সব জানা ছিল। মা কেন সঙ্গে করে শৈলকে নিয়ে আসলেন? সংসারের কাজের সুবিধার জন্য শৈল ও দেবেন্দ্রর কথা মা এতটুকু ভাবলেন না। চিরদিন মা দেবেন্দ্রর প্রতি অবিচার করে চলেছেন। আরও কত অবিচার মায়ের কাছে তার পাওনা আছে কে জানে। তবে দেবেন্দ্রের প্রতি অবিচার হচ্ছে হউক। কিন্তু শৈল কেন অবিচার পাবে। কেন লাঞ্ছিত হবে? দেবেন্দ্রর অন্তরাত্মা জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছিল।

মানুষ অনন্তকাল ধরে কাঁদতে পারে না। তাই একসময় অস্নাত, অভুক্ত,ক্লান্ত শৈলর কান্না থেমে গেল। তখন দেবেন্দ্র তাকে তুলে সযত্নে বিছানায় শুইয়ে দিল। শচীকে ডেকে জল এনে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তার মুখ চোখ ভাল করে মুছে দিল। তারপর দেবেন্দ্রই প্রথম কথা বলল,সস্নেহে সে শৈলকে কিছু খেতে অনুরোধ করল। বলল, "আমিত এসে পড়েছি শৈল। তাই এখন কিছু মুখে দাও।" কিন্তু শৈল সে অনুরোধ রাখল না। তার কঠিন প্রতিজ্ঞা। এ বাড়ীতে সে আর জলস্পর্শ করবে না। আজই সে এবাড়ী ছেড়েচলে যাবে। দেবেন্দ্র যেন সেই ব্যবস্থা করে। শৈলর জেদের কথা দেবেন্দ্রের জানা আছে। আর নিজের মনে জমেছে প্রচন্ড ক্ষোভ,তাই আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করল না। নির্জীব শৈল চুপচাপ পড়ে রইল বিছানায়। কথা বলার শক্তি নেই।

এরপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে দেবেন্দ্র গেল মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

গঙ্গার চিন্তার শেষ ছিল না। বউয়ের ব্যাপার নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে যদি একটা খণ্ডপ্রলয় বেঁধে যায় এই চিন্তায় গঙ্গা গুণ নব তিনবোনেই মহাশংকিত। দেবেন্দ্র ঘরে ঢুকতেই তিনবোনই কেঁদে ফেললেন। দেবেন্দ্র খুবই শান্ত গলায় বলল, কাঁদছ কেন তোমরা ? এতেতো কান্নাকাটির কিছু নেই। ভেবেচিন্তে কোন কাজ না করে পরে বিচলিত হয়ে কোন লাভ নেই। তার কঠিন শান্তসুরে তিনবোনেরই কান্না শুকিয়ে গেল। গঙ্গা কোন কথা বলতেই সাহস পাচ্ছিলেন না। অনেক সময় দেখা যায় জট খোলার ব্যাপারে গুনমণি বেশ এগিয়ে আসতে পারেন। এখনও তাই হল। গুণই প্রথমে স্বাভাবিকভাবে কথা শুরু করলেন। তারপর তিনবোনে মিলেই ঘটনা বর্ননা করলেন এবং তিনজনেই দেবেন্দ্রকে অনুরোধ করলেন,দেবেন্দ্র যেন মহেশের সঙ্গে আগের মতই স্বাভাবিক ব্যবহার করে। ব্যাপারটা যে দেবেন্দ্রর পক্ষে খুবই কষ্টকর তা তারা বোঝেন। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক ভাঙ্গনের যে সূত্র সৃষ্টি হয়েছে তা রোধ করতে হলে দেবেন্দ্রকেই ধৈর্য ধরতে হবে, সহ্যও করতে হবে। মা মাসীদের কথা শুনে দেবেন্দ্র তিক্ত হাসি হেসে বলল, "একথা তোমরা না বললেও আমি তাই করতাম। কারণ এতেই আমি চিরদিন অভ্যস্ত। পারিবারিক সুখসুবিধা ও সন্মানের জন্য খেসারত দেওয়ার জন্যতো আমি নির্দ্দিষ্ট হয়েই আছি। তাই তোমাদের ওসব নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই। যা হবার হয়েছে। ভবিষ্যতে হয়ত আরও অনেক কিছু হতে পারে। তাই এসব না ভেবে আমিও তোমাদের নিশ্চিন্ত থাকতে অনুরোধ করছি। বিশেষ করে মা যেন নিশ্চিন্ত থাকেন। কেননা মায়ের সুযোগ্য পুত্ররা যা করে তাই মানিয়ে যায়। সত্যি কিনা বল?" এই বলে দেবেন্দ্র একটু উচ্চহাসিই হাসল। সে হাসি গঙ্গার বুকে ছুরির ফলার মত বিঁধল আর মাসীদের মুখ বেদনায় বিবর্ণ হল। তারপর দেবেন্দ্র যে আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে শৈলকে নিয়ে চলে যাবে সেকথাও জানিয়ে দিল মা মাসীদের। এ সম্বন্ধে কেউ কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। করার কোন উপায়ও ছিল না।

ঢাকার বাসায় আজ অনেকেরই অন্নগ্রহণ করা হল না। কারন দেবেন্দ্রকে অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সে কোন খাদ্যবস্তু স্পর্শ করতে রাজী হল না। যার স্ত্রী আজ প্রায় চারদিন যাবত নিরম্বু উপবাসী আছে তাকেতো আর খাওয়ার জন্য তেমন পীড়পীড়ি করাও যায় না। এমন পরিস্থিতিতে মা মাসীদেরতো খাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। আর ক্ষীরোদা শচীন্দ্রেরও এমন পরিবেশে খাওয়ার কোন

প্রবৃত্তি হল না। তাই এবাড়ীতে আজ অর্ধেকের বেশী লোক উপোস দিল। আর খাওয়ার চেয়ে উপোস দেওয়াটা যেন তাদের কাছে অনেক স্বস্তিজনক মনে হল।

বিকালে মহেশ কোর্ট থেকে ফেরার পর দেবেন্দ্র দাদার সঙ্গে দেখা করতে তার ঘরে গেল। দেবেন্দ্রর আগমনবার্তা মহেশ আগেই পেয়েছিল। চাকর বিপিল কোর্ট গিয়ে খবরটা দিয়ে এসেছিল। তাই দেবেন্দ্রের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য সে কঠোর কঠিন মনোভাব নিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিল। ক্রোধে, ক্ষোভে আক্রোশে তার মনে তীব এক জ্বালা। কোনরূপ চক্ষুলজ্জার বালাই সে রাখবে না। আর কেনই বা রাখবে? সেত আর দেবেন্দ্রের মত হাবাগোবা নয়। সে পুরুষের মত পুরুষ। প্রাচীনকাল থেকেই পৌরুষযুক্ত পুরুষ সুন্দরী নারীকে শক্তিবলে নিজের ভোগদখলে নিয়ে এসেছে। এদিক দিয়ে সে দোষের মত কিছু করেনি। তাই দেবেন্দ্রের সামনে তার বিন্দুমাত্র সংকোচের কারণ নেই। আর দেবেন্দ্র যদি এ নিয়ে তার সঙ্গে বিবাদ করতে চায় তো খুবই ভাল। বিবাদটা ভিতরে ভিতরে না থেকে যদি প্রকাশ্যে হয় তবে কার কত হিম্মৎ তা প্রকাশ করার সুযোগ হবে। দেবেন্দ্র কি রূপ নিয়ে তার সামনে হাজির হবে, মহেশ তারই প্রতীক্ষা করতে লাগল। মোকাবেলার জন্য মহেশ সবদিক দিয়েই প্রস্তুত।

কিন্তু দেবেন্দ্র খুবই সহজ স্বাভাবিকভাবে ঘরে ঢুকে একটা টুল টেনে বসে পড়ল। দেবেন্দ্রকে দেখে মহেশের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল,ক্রুর,কুটিল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। দেবেন্দ্র লক্ষ্য করলেও এসবে সে মোটেই পাত্তা দিল না। খুব সহজভাবে প্রয়োজনীয় বৈষয়িক কথাবার্তা বলে গেল। আসল ঘটনার ধারে কাছেও গেল না। তার আচরণে মহেশের তার সঙ্গে সন্মুখ সমরে অবর্তীণ হবার কোন সুযোগ ঘটল না। তারপর আগের মত কোনরূপ অনুমতির অপেক্ষা না করে দেবেন্দ্র জানাল, আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে শৈলকে নিয়ে সে চলে যাবে। কথাটা বলে কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে, প্রণাম না করে দেবেন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শুধু প্রণাম না করার অবজ্ঞাটুকু ছাড়া মহেশ দেবেন্দ্রর কাছ থেকে কোনরূপ অপমান অসম্মান পেল না। যদিও অপমান অসম্মানের প্রত্যাশা নিয়েই সে দেবেন্দ্রের প্রতীক্ষা করছিল।

সন্ধ্যার একটু আগেই দেবেন্দ্র শৈলকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হল। যাত্রার প্রাক্কালে শৈল তিন শাশুড়ীকেই ভক্তিভরে প্রণাম করল। অস্নাত, অভুক্ত বিপর্যস্ত ও চরম লাঞ্ছিত শৈলর গমন পথের দিকে চেয়ে গঙ্গারা তিনবোনই চোখের জল

সামলাতে পারলেন না। বাড়ীর অন্যদের দৃষ্টিও বিষন্নতায় ভরা। মনে হচ্ছে দিবারাত্রের সন্ধিক্ষনে স্বয়ং গৃহলক্ষ্মী যেন অনাদর অপমানের ডালি মাথায় নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন! ওদের স্টেশনে পৌঁছে দিতে শচীন্দ্রও সঙ্গে এল।

মানসিক ধকলে, দীর্ঘ উপবাসে শৈলর শরীর যেন নিজের ভারটুকুও আর বইতে পারছে না। স্টেশনে পৌঁছে অর্ধ অচৈতন্যের মত সে স্টেশনের একটা বেঞ্চিতে গা এলিয়ে বসে রইল। শৈলর এই দুরবস্থা শচীন্দ্রকে বড়ই পীড়া দিচ্ছিল। বিশেষ করে শৈলর উপবাসক্লিষ্ট মুখের দিকে সে আর তাকাতে পারছিল না। তাই সে খুবই অনুনয় করে বলল, "বউঠান! চলেইত যাচ্ছ। যাবার বেলায় আমার একটা অনুরোধ যদি রাখ তবে আমি খুব শান্তি পাব।" শৈল নিমীলিত চোখ খুলে শান্ত সুরে বলল, "কেন রাখব না ঠাকুরপো । এই বিপদে তোমাকেই তো আমার একমাত্র আপন বলে মনে হয়েছে।" তখন শচীন্দ্র বলল, "ওবাড়ীতো ছেড়ে এসেছ। তাই বলছিলাম এখন দু'টো মিষ্টি আর জল খেয়ে নাও। গাড়ীর দেরী আছে।" শচীন্দ্রের অনুরোধে হৃদয়ের স্পর্শ ছিল। তাই শৈল তার অনুরোধ ঠেলতে পারল না। ক্ষীণ হেসে বলল, "এত করে বলছ যখন তবে তাই দাও।" শচীন্দ্র দ্রুত গিয়ে শালপাতার ঠোঙায় করে মিষ্টি আর কাচের জারে জল নিয়ে আসল। শৈলকে বলল, "আগে চোখেমুখে একটু জল দিয়ে নাও, তারপর খেতে শুরু কর।" শৈল বাধ্যমেয়ের মত শচীন্দ্রের কথামত চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে শাড়ীর আঁচলে মুখ মুছে খেতে শুরু করল। তখন শচীন্দ্র মেজদাদাকেও কাছে ডাকল। তাদের দু'ভায়েরও সারাদিন খাওয়া হয়নি। শচীন্দ্র মেজদাদার হাতেও একটা মিষ্টির ঠোঙা তুলে দিল এবং নিজেও নিল। শৈল খাচ্ছে দেখে দেবেন্দ্রেরও খেতে কোন আপত্তি হল না। সব অপমান দুঃখ ভুলে গিয়ে ঐ স্টেশনে বসে তিনজনে মিলে যেন স্বর্গরচনা করল। তারপর শৈল - দেবেন্দ্রকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে একটু শান্তির স্পর্শ নিয়ে শচীন্দ্র ফিরে গেল ঢাকার বাসায়।

শৈলকে নিয়ে দেবেন্দ্র নীলগঞ্জের বাড়ীতে ফিরে এল বটে। কিন্তু সমস্যা রয়েই গেল। দীর্ঘদিন ধরে বাড়ীতে মেয়েরা থাকে না। চাকরবাকরের সংসার, তাই অল্পবয়সী বধূ শৈলর পক্ষে এখানে থাকাটা খুবই অসুবিধাজনক। তাছাড়া শৈলর জীবনে এতবড় একটা বিপর্যয় ঘটে যাওয়ায় সেও খুব বিভ্রান্ত। এসময়ে শৈলর জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ দরকার। দেবেন্দ্র বড়ই চিন্তায় পড়ে গেল। সমস্যার সমাধান অবশেষে শৈলই করল। মানসিক এই বিপর্যয়ে শান্তির আশায়

সে কিছুদিন তার মায়ের কাছে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করল। দেবেন্দ্র শৈলর এই ইচ্ছার মধ্যে সমাধানের পথ খুজে পেল। তাই দেরী না করে সে শৈলকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হল। শৈল'র মা হঠাৎ মেয়েজামাই আসায় খুবই অবাক হলেন। দেবেন্দ্র খুব স্বাভাবিকভাবে বলল যে দীর্ঘদিন ধরে শৈল মা ভাইদের না দেখে খুবই অস্থির হয়ে পড়েছে। তাই সে শৈলকে নিয়ে এসেছে। মা শুনে বড়ই খুশী হলেন। দীর্ঘদিন পরে মেয়েকে কাছে পেয়ে মায়ের মনে আর আনন্দ ধরে না। শৈল খুবই বুদ্ধিমতী। সেত আসলে মায়ের কাছে বেড়াতে আসেনি। কিছুদিন থাকবে বলেই এসেছে। তাই সে মাকে বলল," মা এবার কিন্তু তোমাদের জামাই হাজার বললেও আমি তাড়াতাড়ি চলে যাব না। কিছুদিন তোমার কাছে থাকব।" শৈলর মা সহজ সরল নিপাট ভালমানুষ। তাই শৈলর একথায় মা বড়ই খুশী হয়ে বললেন,"তোকে বেশীদিন কাছে রাখতে আমারওতো ইচ্ছে করে। তবে জামাইয়ের অমতে কোন কিছু করিস না মা।" শৈল বলল," না মা, তোমাদের জামাই সে রকম লোক নয়। আমি থাকতে চাইলে একটুও আপত্তি করবে না। এইতো তোমার জামাই সামনেই আছে। তুমিই বল না কথাটা।" দেবেন্দ্র কাছেই ছিল এবং উভয়ের কথাবার্তা শুনছিল। তাই শাশুড়ী কিছু বলার আগেই সে হাসিমুখে বলল,"এ ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই মা। ওর যখন ইচ্ছে তবে থাকুক না কিছুদিন আপনার কাছে। আমাদের বাড়ীতে তো শুধু কাজ আর কাজ। এখানে একটু বিশ্রাম পাবে।"শাশুড়ী জামাইয়ের কথায় খুবই সন্তুষ্ট হলেন। শৈলর অনির্দ্দিষ্টকাল বাপের বাড়ী থাকা নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠার আর সম্ভাবনা রইল না। শৈল কেমন কৌশলে প্রশ্নটার মুখে মাটি চাপা দিয়ে দিয়েছে। শৈলর বুদ্ধিমত্তায় দেবেন্দ্র চমৎকৃত হল।

শৈলর বাবা নেই। বিধবা মা আর ছোট তিনটি ভাই। সংসারে স্বচ্ছলতা নেই। কিন্তু সবকিছুতেই একটা চমৎকার পারিপাট্য আছে। একটা শান্তির বাতাবরণ আছে। তাই মায়ের কাছে এসে শৈলর মনের সব গ্লানি যেন ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। এতে দেবেন্দ্র বড়ই নিশ্চিন্তবোধ করল। শাশুড়ীর অনুরোধে দেবেন্দ্রও প্রায় সপ্তাহ খানেক রইল শ্বশুর বাড়ীতে। শ্বশুর বাড়ীর আবিলতা মুক্ত পরিবেশে নিরবিচ্ছিন্ন শান্তিতে দিনগুলো কাটিয়ে বাড়ীতে ফিরে এল দেবেন্দ্র।

বাড়ীতে নায়েব গোমস্তা চাকরবাকর ছাড়া আত্মজন বলতে কেউ নেই। তাই দেবেন্দ্র একা একা সবকিছুই গভীরভাবে ভাববার অবকাশ পেল। ভাবতে

ভাবতে সংসারের প্রতি স্বজনের প্রতি তার মন নিদারুণ ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। যে সংসারে বিশ্বাস ভালবাসা ও শ্রদ্ধার কোন স্থান নেই, যেখানে শুধু অন্যায় অবিচার, লোভ লালসা আর পশু প্রবৃত্তির জয় জয়কার সেখানে থেকে নিত্যযন্ত্রণার শিকার হয়ে কি লাভ? এর চেয়ে এই জঘন্য সংসার পরিবেশ ছেড়ে যদি ঈশ্বর অন্বেষণে বেরিয়ে পড়া, যায় তবে পরম শান্তির সন্ধান মিলবে। দেবেন্দ্রের মন সংসার ত্যাগের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। যতদিন যেতে লাগল, সংসাররূপ এই নরকত্যাগের বাসনা তার ততই প্রবল হতে লাগল। কিন্তু ঘরছাড়ার প্রবল অন্তরায় শৈল। সে চলে গেলে শৈলর কি হবে? বেশ কিছুদিন অর্ন্তদ্বন্দ্বে ভুগে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে এ সংসারে কে কার? আজ যদি সে মরে যায়, তবে কি শৈল এ সংসারে টিকে থাকবে না? আসলে ঈশ্বরই সবার দায়ভার বহন করেন। মানুষ নিমিত্তমাত্র। আর সংসারে থেকেই বা সে কি নিরাপত্তা দিতে পেরেছে শৈলকে । এই যে ভদ্ররূপী এক নররাক্ষসের কবলে পড়ে শৈল এত বিপন্ন হল, সে কি সেদিন এই বিপন্নতা থেকে শৈলকে রক্ষা করতে পেরেছিল? আসলে সেত জীবনে শৈলকে কিছুই দিতে পারেনি। কাজেই শৈলর জীবনে তার মত অক্ষম স্বামী থাকা না থাকা সমান কথা। শৈল তাকে খুবই ভালবাসে একথা সত্য, তাই প্রথম প্রথম তার বিচ্ছেদে শৈলর হয়ত খুবই কষ্ট হবে। তারপর ধীরে ধীরে সয়ে যাবে। যেইমাত্র এ ধরণের চিন্তা তার মাথায় আসল অমনি সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে সে সংসার ত্যাগের জন্য কৃতসংকল্প হল। অন্তরের বৈরাগ্যের উত্তাল হাওয়া ক্রমাগতই তাকে বাইরের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। তাই এক সকালে লোভ লালসা ও হিংসাদ্বেষদীর্ণ সংসার পিছনে ফেলে দেবেন্দ্র নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াল। নায়েব মশাইকে বলে গেল সপ্তাহখানেকের জন্য ঢাকায় যাচ্ছে সে। তিনি যেন সব দেখাশোনা করেন।

ঢাকার বাসার পরিবেশ এখন স্বাভাবিক। শচীন্দ্র কোলকাতা ফিরে গেছে। মহেশের চলাফেরায়ও অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। তবু এতবড় ঘটনায় তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গঙ্গারা তিনবোনেরই একটা উৎকন্ঠা রয়েছে। সে যদি দিন কয়েকের জন্য কোথাও ঘুরে আসত, তার ভাল হত। তবে একথাতো তাকে সরাসরি বলা যায় না। এমন সময় একটা সুযোগ এসে গেল। মহেশের শ্বশুর নবজাত কন্যাকে দেখে আসবার জন্য মহেশকে চিঠি লিখেছেন। মহেশ শ্বশুরের খুবই প্রিয়পাত্র। মহেশেরও শ্বশুর মশায়ের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাভক্তি। গঙ্গারা এই

সুযোগটা হাতছাড়া করলেন না। তারা শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার জন্য মহেশকে খুবই তাড়া দিতে লাগলেন। কারণ শ্বশুরবাড়ীর আদরযত্ন ও শ্রদ্ধাভাজন শ্বশুরের সান্নিধ্যে তার মনের গ্লানি অবশ্যই কিছুটা দূর হবে। মহেশেরও মনটা খুবই বিষিয়ে ছিল। তাই মা মাসীদের কথামত সে দিনকয়েকের জন্য শ্বশুরবাড়ী চলে গেল। ফল ভালই হল। শ্বশুরবাড়ীর আদরযত্নে,স্ত্রী ও সন্তানের সান্নিধ্যে দিন সাতেক কাটিয়ে আসায় তার মনটা খুবই হালকা হল। আর দীর্ঘদিন পরে স্বামীকে কাছে পেয়ে সরযূও খুবই খুশী হল। সরযূ বড়ই সহজ সরল। কোনরকম ঘোরপ্যাঁচ বুঝে না। তবে বিদ্বান ও সুউপায়ী স্বামীর জন্য তার মনে একটা গর্ববোধ আছে। কিন্তু তার এই বিদ্বানও বুদ্ধিমান স্বামীর মনেরতলায় যে কত কলুষ লুকিয়ে আছে তা সে জানে না। তার অনুপস্থিতিতে ঢাকার বাসায় তার স্বামী যে ভীষণ এক কান্ড করেছে তা পরিবারের প্রায় সবাই জেনে গেছে। শুধু সরযূরই সেটা জানা হয়নি এবং কোনদিন হবেও না। তাই সরযূ বড়ই শান্তিতে আছে, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে।

গঙ্গামণিরা তিনবোনেরই আর ঢাকায় থাকতে মোটেই ভাল লাগছে না। আর এখানে থাকার কোনও দরকার ও নেই। ঋণ যখন শোধ হয়ে গিয়েছে তখন বাড়ী ফিরে যাওয়াই ভাল।শৈলর ঘটনার পর থেকে এখানে আব মন কিছুতেই টিকছে না। কিন্তু দায়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে। আসলে বাড়ী যাওয়ার কথাটা মহেশকে বলতে একটু বাধে। কারণ সে কিছু মনে কবতে পারে। শৈলকে যে দেবেন্দ্র বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছে এ খবর তাবা পেয়েছেন। শৈলকেও এভাবে বেশীদিন বাপের বাড়ী ফেলে রাখা যায় না। দেবেন্দ্রও শৈল বহুদিন ধরে আলাদা থাকছে। এটাও ঠিক নয়। তারা বাড়ীতে না গেলেতো আর একা বাড়ীতে শৈলকে আনা যাবে না। তাই বাড়ী যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া বেশ কয়েকদিন ধরে গঙ্গার মনটা একটা বিপদ আপদ আশংকায় বড়ই উচাটন হয়ে আছে। এতবড ঘটনার পর সম্পূর্ণ একা বাড়ীতে দেবেন্দ্রই বা কি করছে? শৈলকে নিয়ে যেতে সে যখন এসেছিল তখনতো তার সঙ্গে তেমন কথাই হয়নি। তাই ব্যাপারটা তাব মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তার কোন আঁচ পাওয়া যায়নি। দেবেন্দ্র এমনিতেই খুব চাপা স্বভাবের, সহজে তার মনের গতিপ্রকৃতি বুঝা যায় না। বাড়ী গিযে কাছে থাকলে তবু কিছুটা আন্দাজ করা যেত। মহেশকে দু'একদিনের মধ্যেই তাদেরবাড়ী যাওয়ার কথা ও সরযূকে ঢাকায় আনবার কথাটা বলতে হবে। এই

পরিস্থিতিতেই দেবেন্দ্রর খোঁজে নায়েব মশাই ঢাকার বাসায় এসে হাজির হলেন।

দেবেন্দ্র সেই যে শৈলকে নিয়ে চলে গেল, তারপরতো আর ঢাকায় আসেনি। অথচ নায়েবমশাইকে ঢাকায় যাচ্ছে বলে সে অন্য কোথায় যেতে পারে? তার কথার হেরফেরতো হয়না কখনো? কাউকে না জানিয়ে কোথায় যেতে পারে দেবেন্দ্র? নায়েবমশাই সহ বাড়ীর সবাই দেবেন্দ্রর জন্য বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়ল। শচীন্দ্রকে খবর দেওয়া হল, সম্ভাব্য সবজায়গায় খোঁজখবর করা হল। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মিলল না। তখন শচীন্দ্র ছুটে এল ঢাকায়। মহেশ ও শচীন্দ্র দুই ভাই মিলে দেবেন্দ্রর খোঁজখবর করার কোন ক্রটি করল না। কিন্তু সন্ধান না পেয়ে অবশেষে দুইভাই মিলে পরামর্শ করে পুলিশে খবর দিল, কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপাল। কিন্তু ফল কিছুই হল না। দেবেন্দ্রের সন্ধান মিলল না।

দেবেন্দ্রর এই অর্ন্তধানে গঙ্গা শোকে পাগল। শৈল পাথর। জামাইয়ের নিরুদ্দেশের খবরে শৈলর মা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। এরমধ্যে পাড়া প্রতিবেশীদের কৌতূহলও মন্তব্যের অন্ত নেই। শৈলর মায়ের কাছে এগুলো হয়েছে আর এক জ্বালা। কেউ কেউ ঠারেঠোরে শৈলকে দোষারূপ করে, কেউ আবার সহানুভূতি দেখিয়ে প্রকাশ্যেই বলে, "এমন সোনার প্রতিমা মেয়েকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে কেমন করে তোমার জামাইটা পালিয়ে গেলগো শৈলর মা? তোমার জামাইটা সত্যিই একেবারে অমানুষ। আহা মেয়েটার মুখের দিকে যে তাকানো যায় না।" ইত্যাদি আরও হরেকরকমের কথা। শৈলর মার এগুলো মোটেই সহ্য হয় না। তবু সহ্য করেই যেতে হয়। কিন্তু শৈলর মধ্যে এসব নিয়ে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। তার জীবনে একটার পর একটা ঝড় আসছে। জন্মজন্মান্তরের নিদারুণ পাপের ফলে স্বামী তাকে ছেড়ে গেছেন। স্বামীর প্রতি তার মনে বিন্দুতম অভিযোগ নেই। শৈল বুঝে যে তার লাঞ্ছনা অপমান সইতে না পেরেই স্বামী ঘর ছেড়েছেন। ঈশ্বরের ভান্ডারে শৈলর জন্য আরও কত দুঃখ না জানি সঞ্চিত হয়ে আছে। শৈল স্থির করেছে ঈশ্বরের দান একটার পর একটা দুঃখ সে গাছের মত নীরবে সহ্য করে নেবে। কাজেই শৈল বাহ্যিক দিক দিয়ে প্রতিক্রিয়া বিহীন। কথায় আছে, অল্প দুঃখে কাতর, অধিক দুঃখে পাথর। শৈলর অবস্থাও হয়েছে তাই।

নায়েব মশাইয়ের সঙ্গেই গঙ্গামণিরা সবাই ফিরে এসেছেন বাড়ীতে। বাড়ীতে এসেও সমানতালে দেবেন্দ্রর খোঁজখবর চলতে লাগল। গুণ-নব নানা

দেবতার থানে দেবেন্দ্র ফিরে আসার জন্য মানত রাখলেন। দেবেন্দ্র ফিরে আসবার মানস নিয়ে গঙ্গা প্রতি সোমবার উপোস করে শিবপূজা করতে শুরু করলেন। কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বছরের পর বছর কেটে গেল দেবেন্দ্রর কোন হদিশ মিলল না। গঙ্গার মন হুহু করে। শৈলর কথাও মনে পড়ে। এসময়ে শৈল যদি কাছে থাকত তবে হয়ত তিনি কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজে পেতেন। সাতপাঁচ ভেবে অবশেষে গঙ্গা শৈলকে আনার জন্য তার মায়ের কাছে লোক পাঠালেন। কিন্তু শৈলর মা এতদিনে সবকিছু জেনে গেছেন। তাই জামাইয়ের অনুপস্থিতিতে তিনি মেয়েকে শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাতে রাজী হলেন না। গঙ্গাও আর পীড়াপীড়ি করলেন না। আর করবেনই বা কোন মুখে?

দেবেন্দ্র নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। তার ফিরে আসার আশা এখন কেউই বড় একটা করে না। সে বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও জানা নেই। অনেকের ধারণা সে মরেই গেছে নইলে ঘরে মা আছেন, সুন্দরী যুবতী স্ত্রী আছে। তাৎক্ষাণিক উত্তেজনার বশে বেরিয়ে গেলেও এদের টানে নিশ্চয় সে এতদিনে ফিরে আসত। কাজেই তাকে মৃত বলেই ধরে নেওয়া যায়।

পরিবারেও তার আলোচনা এখন বড় একটা হয় না। তবে সবার মনেই তার জন্য চাপা কষ্ট আছে। শুধু মহেশের মনে এ ব্যাপারে মিশ্র একটা প্রতিক্রিয়া। দেবেন্দ্রের অর্ন্তধানের ব্যাপারে তার মনে একটা সূক্ষ্ম আত্মগ্লানি বোধ আছে। আর নিজের ভাই বলে তারজন্য একটা বেদনাবোধও যে তাকে পীড়িত করে না তা নয়। রক্তসম্পর্কের মধ্যে রেষারেষি থাকলেও এর মধ্যে একটা এমন টানাপোড়েন আছে যাতে কোনমতেই একেবারে সম্পর্কটা ছিন্ন করা যায় না। তাই শৈলকে কেন্দ্র করে মহেশ দেবেন্দ্রের প্রতি বিদ্বিষ্ট হলেও তার নিরুদ্দিষ্টতার জন্য ব্যথিতও বটে। আবার স্বামী নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় শৈলর জীবন যে ছারখার হয়ে গেল এজন্য একটা বিরাট আত্মতুষ্টিও আছে। তার মনে শৈলর প্রতি প্রবল আকর্ষণটা এখন প্রচণ্ড প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হয়েছে। তাই নিরুদ্দিষ্ট দেবেন্দ্রের জন্য শৈলর কষ্ট চিন্তা করে সে একটা নিষ্ঠুর আনন্দও উপভোগ করে। মানবচরিত্র কত না বিচিত্র।

দেবেন্দ্র নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার প্রায় পাঁচ ছয় বছর কেটে গেল। সে ফিরে আসবে এমন আশা কেউই করে না। কিন্তু দু'টি হৃদয় আশা গেলেও খোঁজার অভ্যাস ছাড়ে না। গঙ্গার মাতৃহৃদয় পুত্রের প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা

করে। আর ওদিকে দিনের পর দিন দেবেন্দ্র ফিরে আসবে এই আশায়প্রহর গুণে দুর্ভাগিনী শৈল।

শৈলর নিজের জীবনে যাই ঘটুক না কেন, কর্তব্যকর্মে তার বিন্দুতম অবহেলা নেই। মেয়ের দুর্ভাগ্য ঘুষতে ঘুষতে শৈলর মা দেবেন্দ্র নিখোঁজ হওয়ার বছর দুয়েকের মধ্যেই মারা গেলেন। শৈল দৃঢ়হস্তে ভাইদের সংসারের হাল ধরল। মায়ের মৃত্যুর একবছর পরই বড় ভাই মঙ্গলের বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ আনল। মেজভাই কমলটা একটু বাউণ্ডুলে প্রকৃতির। লেখাপড়ায় একেবারে মন নেই। তাই শৈল তাকে চাপ দিয়ে একটা দোকান কর্মচারীর কাজে ঢুকিয়ে দিল। ছোটভাই চঞ্চলটা পড়াশুনায় খুবই ভাল। শৈল তার পড়াশুনা যাতে ভালভাবে চলতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি রাখল। নিজের মানসিক এই অবস্থার মধ্যেও শৈল মায়ের বেহাল সংসারকে মোটামুটি গুছিয়ে তুলল। ভাইরাও দিদি বলতে অজ্ঞান। শৈলর রিক্ত জীবনে ভাইদের এই শ্রদ্ধা ভালবাসাই এখন একমাত্র সম্পদ।

ভালমন্দ জীবনে যাই আসুক না কেন, একদিন তার রেশ মিলিয়ে যায়। মানুষের জীবনযাত্রাও স্বাভাবিকভাবে চলে। বারমাসের তের পার্বনও হয়। অবস্থানুযায়ী পরিবারে নানান পরিবর্তনও ঘটে। দেবেন্দ্র চলে যাওয়ার পর রায় পরিবারেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। শচীন্দ্র আইন পাশ করে কোলকাতা হাইকোর্টে ওকালতী শুরু করেছে। শুরুতেই তার পশার প্রতিপত্তি বেশ জমে উঠেছে। শচীন্দ্রের ভাগ্যটা সত্যিই ভাল। মহেশ ঢকার বাসা উঠিয়ে দিয়ে চলে এসেছে বাড়ীতে এবং নিকটবর্তী মহকুমা শহরে ওকালতী করছে। সরযূও তার সন্তানাদি নিয়ে আছে বাড়ীতেই। তার আরও একটি পুত্র সন্তান জন্মেছে। সংসার আগের থেকে অনেক স্বচ্ছল হয়েছে। গঙ্গামণির দুই ছেলেই ভাল উপার্জন করছে। সম্পত্তির আয়ও ভালই হচ্ছে। শরীকদের সঙ্গেও বিবাদবিসম্বাদ মিটে গিয়ে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। দেবেন্দ্রও শৈলবিহীন সংসার স্বচ্ছন্দ গতিতে চলছে শুধু রায়বাড়ীর একটি হৃদয় ও তালতলার পন্ডিতবাড়ীর আর একটি হৃদয় হারিয়ে যাওয়া মানুষটাকে ফিরে পাবার জন্য অধীর আগ্রহে নীরবে দিন গুণছে। তাদের মনের কথা জানে না কেউ।

ইতিমধ্যে শচীন্দ্রের বিয়ে হয়েছে। খুবই জাঁকজমকের সঙ্গেই বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। ছোট বউ স্নেহলতা ধনী বাপের বড়ই আদরের কন্যা। বিয়েতে ধনী বাপ মেয়েজামাইকে এত যৌতুক দিয়েছেন যে ঘরে রাখার ঠাঁই হয়না। ধনীকন্যা

স্নেহলতা এক গ্লাস জলও গড়িয়ে খেত জানেনা তাই ধনী বাপ অনুক্ষণ তার সেবার জন্য সঙ্গে এক দাসী দিয়েছেন। স্নেহলতা শ্যামাঙ্গী, সুন্দরী নয়, তবে শ্রীমতী। তার সর্ব অবয়বে এমন একটা সৌষ্ঠব আছে যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অল্পদিনের মধ্যেই বুঝা গেল নূতন বউ বড়ই দেমাকী। বড়লোকের মেয়ে। বাপ অনেক দিয়েছে থুয়েছে বলে অহঙ্কারে মাটিতে তার পা পড়ে না। স্বামী ছাড়া শ্বশুরবাড়ীর অন্য মানুষকে সে মানুষ বলেই গণ্য করে না। বধূসুলভ সৌজন্যের খাতিরেও সে শাশুড়ীদের সামান্যতম সেবাযত্ন করার প্রয়োজন বোধ করে না। তার আচরণে সবাই বিস্মিত ও বিরক্ত। নূতন বউয়ের চালচলন দেখে সবারই শৈলর কথা মনে পড়ে। রূপগুণে অমন বউ হয় না, অথচ আজ সে কতদূরে। শৈলর রূপ দেখলে নিশ্চয় নূতন বউয়ের দেমাকে কিছু ভাটা পড়ত। সরযূওতো বড়ঘরের মেয়ে। কাজকর্মেও অপটু। কিন্তু তারতো এমন দেমাক নেই। দেমাক অহংকার কাকে বলে সে তা জানেই না। কাজকর্ম না করলেও সবাইকে কেমন মান্যগণ্য করে চলে। আসল কথা হল মা বাপের শিক্ষা। স্নেহলতা সঙ্গে করে যৌতুক এনেছে অনেক কিন্তু শীল আনতে পারেনি। কিন্তু সরযূ অলস অকর্মন্য যাই হউক যৌতুকের সঙ্গে শীলটুকু নিয়ে এসেছে। আর শৈল? তার সঙ্গেতো এদের তুলনাই চলে না। মেয়েদের মধ্যে তিন বউকে নিয়ে এরূপ নানা আলোচনা হয়।

শচীন্দ্র নববধূর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত অনুরক্ত। শ্বশুরবাড়ীর প্রাচুর্যে সে মুগ্ধ। বউয়ের সুখ সুবিধার প্রতি তার খুবই নজর। এ ব্যাপারে যে একটু হায়ালজ্জা থাকা উচিত সে জ্ঞান তার নেই। বউকে সে মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করতে চায় না। তার আদেখলাপনা দেখে বাড়ীর সবাই বিরক্ত হয়। কর্মস্থানে চলে যাবার সময় সে যখন নির্দ্ধিধায় মায়ের কাছে বউকে সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করল তখন মনে মনে বিরক্ত হলেও গঙ্গা এতে কিছুমাত্র আপত্তি করলেন না। এমন দেমাকী বউ চোখের সামনে না থাকাই ভাল। মহেশওতো বড় ঘরের মেয়ে এনেছে। কিন্তু এমন আদেখ্‌লাপনাতো কখনও দেখায়নি। অমন যে সুন্দরী বউ শৈল, তবু দেবুতো কোনদিন এমনটা করেনি। এমন কেলে বউ নিয়েই এত, আর দেবুর বউয়ের মত সুন্দরী বউ হলে শচী না জানি কি করত। এধরনের নিন্দাবাদে মেয়ে মহল মুখর। যাক যথাসময়ে শচীন্দ্র তার আদুরে নূতন বউকে নিয়ে চলে গেল কোলকাতা। বাড়ীর লোকও হাঁফছেড়ে বাঁচল।

শচীন্দ্র কোলকাতায় পছন্দমত বাড়ী ভাড়া করে নূতন বউকে নিয়ে সংসার পাতল। খুব ছিমছাম সাজানো গুছানোসংসার। কাজের জন্য স্নেহলতার বাপের বাড়ীর ঝিতো আছেই আর রান্নার জন্য ঠাকুর রাখা হল। স্নেহলতা কুটোগাছটি ও দু'ভাগ করে না। শুয়ে বসে সেজেগুজেই দিন কাটায়। নূতন সংসারে নূতন বউকে নিয়ে মেতে আছে শচীন্দ্র। নূতন সংসারে খরচ অঢেল। তাই বাড়ীর টাকার বরাদ্দখুবই কমিয়ে দিয়েছে সে। এজন্য মহেশ মনে মনে খুবই অসন্তুষ্ট । কর্তব্যে অবহেলা মহেশ মোটেই পছন্দ করে না। সে শচীন্দ্রের মত আত্মসুখী নয়। বিয়ের পর শচীন্দ্র আমূল বদলে গেছে। বাড়ীর কথা সে ভুলেই গেছে? ভুলে গেছে হারানো মেজদাদাকেও। বউ আর শ্বশুরবাড়ীই এখন তার ধ্যানজ্ঞান। শচীন্দ্র নিরুদ্দিষ্ট ভাইকে ভুলে গেলেও মহেশ কিন্তু একেবারে ভুলে যেতে পারেনি। দেবেন্দ্রের জন্য তার মনে একটা বেদনাবোধ আছে। আবার দেবেন্দ্র-শৈলর প্রতি ঈর্ষা আক্রোশও সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। শৈলকে নিজের কবলে পাওয়ার দুরাশা আজও সে মনে পোষণ করে চলেছে। কামপ্রবৃত্তি মহেশের মহৎ হৃদয়কে ক্রমাগত নীচের দিকে টানছে। সর্বগুণের আধার হয়েও মহেশ তার এই ত্রুটিটুকু সংশোধন করতে পারল না। নারীর প্রতি মোহ কি বিষম বস্তু।

ঘর ছেড়ে দেবেন্দ্র প্রথমে উপস্থিত হল কাশীধামে। কাশী পৌঁছে সে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে এখানে সেখানে বেশ কয়েক দিন ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াল। তারপর ভিড়ে গেল গেরুয়াধারী একদল সাধুর সঙ্গে। তাদের নির্দেশে সেও নিজের বেশবাস ত্যাগ করে গেরুয়া ধাবণ করল। গেরুয়া ধারণ করলেই যথার্থ সাধু হওয়া যায় না। যথার্থ সাধু হতে গেলে সাধনা দরকার। কিন্তু এদের মধ্যে উচ্চতর কোন সাধক ছিল না যে তাকে পথের সন্ধান দিতে পারে। তবু ধৈর্য ধরে দেবেন্দ্র এদের সঙ্গেই চলতে লাগল এবং মনে মনে যথার্থ দিশারীর সন্ধান করতে লাগল।

এই সাধুরা শৈব সাধু। এদের মূল ঘাঁটি কাশীধাম। তবে বছরে এরা একবার পরিব্রাজনে বের হয়। বছরে এরা চারমাস কাল পর্যটন করে থাকে। এবারও তাদের নির্দ্দিষ্ট পরিব্রাজনের সময় এসেছে। এবার তাদের ভ্রমণের লক্ষ্য দক্ষিণ ভারতের তীর্থগুলি। তাদের যাত্রারআয়োজন সম্পর্ণ হল। দিনক্ষণও স্থির হল এবং দেবেন্দ্র যখন তাদের সঙ্গেই আছে, তাই স্বাভাবিকভাবে সেও তাদের সঙ্গী হল।

সাধুর দলটি গেল প্রথমে পুরীধামে। সেখানে তারা প্রথমেই জগন্নাথ মন্দির দর্শন করল এবং ভক্তিভরে মন্দিরে পূজা দিল। সমুদ্রস্নান করল। দেবেন্দ্র এর আগে কখনও সমুদ্র দেখেনি। পুরীর সমুদ্রের নীল জল, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, অবিশ্রাম গর্জন দেবেন্দ্রকে অভিভূত করে ফেলল। ঈশ্বরের সৃষ্টির কি মহিমা! ভাবল দেবেন্দ্র। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কথা মনে পড়ল তার । এখানেই তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে জগন্নাথের সঙ্গে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন বলে শুনেছে সে। আজ সেই পুণ্যস্থান চাক্ষুষ দেখে সে নিজেকে ধন্য মনে করল।

পুরী থেকে সাধুর দলটি যাত্রা করল দক্ষিণভারতের বিশেষ তীর্থগুলির উদ্দেশ্যে। কন্যাকুমারিকা তাদের শেষ গন্তব্যস্থল। সাধুরা বেশীর ভাগই পদব্রজে চলাফেরা করেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে দিন শেষে কোন পরিত্যক্ত মন্দিরে বা কোন ধর্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভোর থেকে শুরু হয় আবার পথচলা। সুখে লালিত দেবেন্দ্র এতশ্রমে অভ্যস্ত নয়। তার পায়ে ফসকা পড়ে। শরীর ভেঙ্গে আসে। তবু চলতে হয়। বেরিয়ে যখন পড়েছে তখনতো চলতে হবেই।

দেবেন্দ্র কখনও দেশভ্রমণ করেনি। তাই এই পরিব্রাজনকালে প্রথম সে প্রকৃতির অনুপম শোভা, দেখল অনেক অনেক নদনদী, সমুদ্রপর্বত, বিপদসংকুল গভীর অরন্য, হিংস্র জীবজন্তু। এসবই প্রকৃতির সৃষ্টি। যাত্রাকালে দর্শন ঘটল অপূর্ব গঠনের কত না মন্দির, কত না পথ ঘাট, দেখল ইতিহাসের উত্থান পতনের কত না চিহ্ন। কাল যারা ছিল আজ তারা নেই। কালের নিয়মে তারা হারিয়ে গেছে। দেবেন্দ্র শ্রষ্টার সৃষ্টির মহিমা যেমন উপলব্ধি করল তেমনি অভিভূত হল স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সৃষ্টিও কীর্তি দেখে। ক্ষুদ্র গ্রামের ছেলে দেবেন্দ্র বিরাটের রূপ দেখে ঘর ভুলে গেলে, তার মন থেকে মুছে গেল এতদিনের সঞ্চিত দুঃখতাপ। এমন কি শৈল পর্যন্ত তার মন থেকে হারিয়ে গেল।

গৃহের ক্ষুদ্র গন্ডী থেকে বের হয়ে দেবেন্দ্র বৃহতের মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। মনপ্রান এখন শান্ত শীতল। তবু একটা কাঁটা সর্বক্ষণ মনে খচখচ করছে। যার জন্য সে ঘর ছেড়েছে সেই পরমপুরুষের সান্নিধ্যে যাবার পথ দেখাতে পারে এমন মহাপুরুষের সন্ধানতো এত তীর্থ ঘুরেও সে পেল না। শুনেছে সে সময় হলে গুরু নিজেই এসে দর্শন দেন। দেবেন্দ্রর সময় হবে কবে? তার মনতো আর ধৈর্য্য ধরতে পারছে না। নীরবেই সে এসব ভাবে। সঙ্গী সাধুদের কাছেতো আর এসব বলা যায় না। এমনি করেই একদিন পরিব্রজন শেষ হল। সাধুদের সঙ্গে সে

আবার ফিরে এল তাদের কাশীধামের স্থায়ী আস্থানায়। এই সাধুদের যিনি প্রধান তিনি দেবেন্দ্রকে খুবই স্নেহ করেন এবং তাকে শৈবধর্মে দীক্ষিতও করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রের তেমন ইচ্ছে নেই বুঝতে পেরে তিনি আর চাপাচাপি করেননি। ঐ সাধুদের মধ্যে উচ্চস্তরের সাধক নেই বটে, তবে তারা নেহাৎ ভন্ড নয়। সাধনভজনের কিছু চেষ্টা তাদের আছে। কিন্তু সাধনক্ষেত্রে উচ্চমার্গে উঠার মত সাধনক্ষমতা তাদের নেই। তবে তারা শুদ্ধ সুশৃংখল জীবনই যাপন করে। দেবেন্দ্র এতদিন ধরে এদের সঙ্গে থেকে সদব্যবহারই পেয়েছে। নূতন কোন লোককে তারা সহজেই গ্রহণ করে। জোর করে কারো উপর তাদের মতও বিধিবিধান চাপিয়ে দেয় না। তাদের সঙ্গে থাকতে হলে শুধু গেরুয়া বস্ত্রখানি পরলেই চলে। তাই দেবেন্দ্র তাদের মন্ত্রাদি গ্রহণ না করেও স্বচ্ছন্দে তাদের সঙ্গে থাকতে পারছে।

কাশীতে ফিরে এসে দেবেন্দ্রর মন বড়ই উতলা হয়ে উঠল। প্রায় বছর দেড় দুই হয়ে গেল সে ঘর ছেড়েছে। কিন্তু যার জন্য এই ঘরছাড়া, এই কৃচ্ছ্র সাধন সেই পরমার্থলাভের পথ চিনিয়ে দেওয়ার মত কোন গুরুর হদিশতো আজ অবধি মিলল না। তবে কি গুরুর অভাবে তার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে ? ঈশ্বরের করুণালাভ কি তার ভাগ্যে নেই ? হরেক রকম প্রশ্ন মনে উদয় হয়। হতাশ উদাস দেবেন্দ্র সকাল সন্ধ্যা দুইবেলা একা একা দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে বসে থাকেএবং নানান চিন্তা করে। লক্ষ্যহীনভাবে জীবনের কতবেলা বয়ে গেল। সার্থক জীবনের সন্ধান ঘরে বাইরে কোথাও পেল না সে। হয়ত এই উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরে জীবনই তাকে কাটিয়ে যেতে হবে। কিন্তু একবার বেরিয়ে যখন এসেছে ঘরে আর ফিরবে না সে। এরকম ভাবনার মধ্যেই চকিতে শৈলর মুখ ভেসে উঠল মনে। দেবেন্দ্র নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠল। যাকে সে পিছনে ফেলে এসেছে, যার স্মৃতি সে মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে, সে কেন তবু আসে বার বার। স্মৃতিতে তার এই ঘুরে ফিরে আসাটা বন্ধ করতেই হবে। এজন্যই হয়ত গুরু মিলছে না তার। চঞ্চল মন নিয়ে দেবেন্দ্র নদীর তীরে পায়চারী করে আর সদগুরুলাভের চিন্তা করে। ক্রমে তার মন শান্ত হয় এবং রাত বেড়ে গেলে সে আস্থানায় ফিরে আসে। এমনি করেই দিনের পর দিন কাটে।

দশাশ্বমেধ ঘাটে সকাল সন্ধ্যা বসে থাকাটা দেবেন্দ্রর একটা অভ্যাস পরিণত হয়ে গেছে। আগের মত সে সব সময় যে সাধু সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য করে তা নয়।

আনমনে বসে সময় কাটায়। হঠাৎ একদিন ভোরবেলা দশাশ্বমেধঘাটে স্নানরত এক সাধুর দিকে তার দৃষ্টি পড়তেই ভীষণভাবে চমকে উঠল সে। সাধুর সৌম্যমূর্তি ,দীপ্তদৃষ্টি দেবেন্দ্রকে খুবই আকৃষ্ট করল। তার হতাশ মন আশায় দুলে উঠল। ভাবল, হয়ত এতদিনে তার উপর ঈশ্বরের কৃপা হয়েছে। বোধ হয় ইনিই তার সেই কাঙ্ক্ষিত গুরু।

সাধু ধীরে সুস্থে স্নান-তপণ সমাপন করলেন, পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্তন করলেন। তারপর কমন্ডলু জলপূর্ণ করে চলার জন্য পা বাড়ালেন। দেবেন্দ্র তৈরী হয়েই ছিল। যেই সাধু পা বাড়ালেন অমনি দেবেন্দ্র সামনে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরল,বলল,"প্রভু আমি বড়ই তাপিতপ্রাণ। ঈশ্বর লাভের আশায় বহুদিন ধরে পথে প্রান্তরে ঘুরছি। কিন্তু গুরুর সন্ধান পাচ্ছি না। আজ আমার জীবন ধন্য। আপনাকে পেয়েছি। আপনি কৃপা করে আমাকে শিষ্য করে নিন। আমাকে পথের সন্ধান দিন।"

সাধুর দুই চোখে অপূর্ব একজ্যোতি খেলে গেল। মধুর হাসিতে বদন উদ্ভাসিত হল। স্নিগ্ধ মধুর স্বরে বললেন," আমার হাতে তো তোর জন্য কিছু নেই। তোর গুরু আছেন হরিদ্বারে। গঙ্গার ঘাটে ঠিক এই সময়ে স্নানরত অবস্থায়ই তার দেখা পেয়ে যাবি।" দেবেন্দ্র বিহ্বল হয়ে সাধুর পা ছেড়ে দিল। সাধু তার মাথায় হাত রেখে তাকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর নিজের গন্তব্যপথে পা বাড়ালেন। সাধুর স্পর্শে দেবেন্দ্রর সর্বঅঙ্গে অদ্ভুত এক শিহরণ খেলে গেল। সে কেমন আবিষ্টের মত সাধুর গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। বাহ্যচেতনা তখন তার প্রায় লুপ্ত।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ ঘাটে একভাবে বসে থাকার পর দেবেন্দ্র আবিষ্টভাব কাটিয়ে স্বাভাবিক হল। তার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। এতদিনে ঈশ্বর তারদিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। তার অভীষ্টলাভের আর বেশী দেরী নেই। কালই সে রওনা হয়ে যাবে হরিদ্বার। তারপর গুরুর দেখা পেলে তাঁর হাত ধরে সে পৌঁছে যাবে সেই ঠিকানায়, যেখানে সে যেতে চায়।

পরদিনই দেবেন্দ্র শৈবসাধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেল হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে। হরিদ্বারে পৌঁছে দেবেন্দ্রের আশ্রয়ের জন্য কোন অসুবিধা হল না। দীর্ঘ দু'বছর ধরে সাধুদের সঙ্গে বাস করাতে সাধুসমাজ সম্পর্কে তার একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল। তাই হরিদ্বারে পৌঁছে গেরুয়াধারী দেবেন্দ্র সহজেই

সাধুদের এক আস্থানায় নিজের ঠাঁই করে নিল। কোন এক ধনী মহাজন সাধুসেবার জন্য ঢালাও ব্যবস্থা করে রেখেছেন। দেবেন্দ্রর সঙ্গী সাথীরা ওখানেই নিত্য প্রসাদ পায়। তাদের সঙ্গে দেবেন্দ্ররও নিত্য প্রসাদের একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল। ফলে হরিদ্বারে নূতন এলেও অন্ন ও আশ্রয়ের জন্য তার কিছুমাত্র অসুবিধা হল না। এখানে যেন কোন অদৃশ্য হস্ত আগে থেকে তার জন্য সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। এখানে এসে তার একমাত্র কাজ হল সকাল সন্ধ্যা গঙ্গার ঘাটে বসে থেকে গুরুর সাক্ষাৎলাভের জন্য প্রতীক্ষা করা।

প্রতীক্ষায় প্রায় মাস দুই কেটে গেল। গুরুর সাক্ষাৎলাভ হল না। তাতে দেবেন্দ্রর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল না। কারণ দশাশ্বমেধ ঘাটের সেই মহাপুরুষের কথাতো মিথ্যে হবার নয়। সময় হলে গুরুর সাক্ষাৎ এখানে অবশ্যই মিলবে।

গঙ্গার ঘাটে বসে থাকতে থাকতে মাঝে মধ্যে দেবেন্দ্র খুবই আনমনা হয়ে যায়। কে জলে নামছে, কে উঠছে সবসময় লক্ষ্য রাখতে পারে না। এই আনমনা ভাবের মধ্যেই হঠাৎ তার নজরে এল অনেকটা দশাশ্বমেধঘাটের সাধুর মতই ঋজুদেহী উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীপ্তিমান এক সাধু স্নান সেরে জলপূর্ণ কমণ্ডলু হাতে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে উপরে উঠে আসছেন। সাধুর চোখে অসাধারণ উজ্জ্বলতা, মুখে অদ্ভুত প্রসন্নতা। দেবেন্দ্র তার দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। তার সর্বশরীর শিহরিত হল। বুঝতে পারল এতদিনে তীরে তরী ভিড়েছে,গুরুর দেখা মিলেছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিযে সে লুটিয়ে পড়ল সাধুর চরণে। সাধু তাকালেন না, কোন কথাও বললেন না। শুধু চোখের ঈঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে বললেন। দেবেন্দ্র আনন্দে আত্মহারা। বহু আকাঙ্ক্ষিত গুরুর সন্ধান এতদিনে মিলেছে। ঈশ্বর কারো আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন না। গুরুর হাত ধরে এবার সে এগিয়ে যেতে পারবে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি পরমার্থ লাভের পবিত্র পথে। দুঃখ গ্লানিময় পিছনের জীবন পড়ে থাকবে পিছনে। বড়দাদা শত্রুর বেশে মিত্রের কাজই করেছেন।

সাধুকে অনুসরণ করে দেবেন্দ্র পিছনে পিছনে চলতে লাগল। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সাধু থামলেন অনুচ্চ পাহাড়ঘেঁষা এক ঝুপড়ির সামনে। এবারও কোন কথা না বলে ইঙ্গিতে দেবেন্দ্রকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে তিনি প্রবেশ করলেন ঝুপড়িতে। কমণ্ডলু একপাশে রেখে তিনি আসনে উপবিষ্ট হলেন এবং ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। দেবেন্দ্র মুগ্ধচোখে সাধুর কার্যকলাপ দেখতে লাগল এবং মনে মনে ভাবতে লাগল, ভগবৎ সাধনের পথতো

সহজ নয়। না জানি কতদিনে সে তার অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করবে। এ জন্মে তা হবে কিনা একমাত্র গুরুই জানেন।

দুপুর গড়িয়ে গেল। সাধুর ধ্যান আর ভাঙ্গে না, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর দেবেন্দ্র। কিন্তু তার ধৈর্য অটুট। ভাগ্য গুণে গুরুর দেখা যখন পেয়ে গিয়েছে, তখন ধৈর্য হারালেত চলবে না। সাধনপথে যে অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন দেবেন্দ্র তা অনুমান করতে পারে। অবশেষে এক সময় ধ্যান ভাঙ্গল সাধুর । তিনি আসন ত্যাগ করলেন এবং কথা বললেন, দেবেন্দ্রকে তিনি ঝুপড়ির ভিতরে ডেকে নিলেন। তার কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে দেবেন্দ্র মুগ্ধ হয়ে গেল। ক্ষুধাতৃষ্ণাও যেন ভুলে গেল। সাধু বললেন "সন্ন্যাসী হবি বলেইত ঘর ছেড়েছিস? তাই না? তবে ঘরে বসে সাধন ভজন করেও ঈশ্বরের কৃপালাভ করা যায়রে। ঈশ্বরকে পেতে হলে যে ঘর ছাড়তে হবে তা নয়। আসলে ঘরের অশান্তিই তোকে বাইরে টেনে এনেছে। নইলে কি আসতিস? কেমন ঠিক বলিনি? দেবেন্দ্র অবাক। বুঝতে পারল, সাধু অর্ন্তযামী। সে কোনরকমে হাঁ উচ্চারণ করে অধীর উৎকণ্ঠায় চুপচাপ বসে রইল। সাধু হাসলেন, সে কি অপূর্ব হাসি। এমন সুধাঝরা হাসি দেবেন্দ্র জীবনে দেখেনি। তার নয়নমন যেন সার্থক হয়ে গেল। তারপর সাধু অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। বললেন,'ক্ষুধাতৃষ্ণায় খুব কাতর হয়েছিস আগেকিছু খেয়ে নে। তারপর কথা হবে।" এই বলে কিছু হালুয়া ও কিছু ফল তার দিকে এগিয়ে দিলেন। সাধুর নির্দেশমত দেবেন্দ্র খাবার গুলো খেয়ে নিল। মনে হল এমন সুস্বাদু খাবার সে জীবনে কোনদিন খায়নি। সাঁধ কমণ্ডলু থেকে তার হাতে জল ঢেলে দিলেন। অঞ্জলিভরে দেবেন্দ্র সেই জল পান করল। খাবার ও জল খেয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্ত হওয়ায় দেবেন্দ্র বেশ সুস্থ ও স্বস্তি বোধ করল। তখন সাধু আবার কথা বললেন, "বড় কঠিন সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিস। কিন্তু কতটুকু হবে কে জানে। কার জন্য ঘর, কার জন্য পথ, কার জন্য সাধনা, কার জন্য বেদনা নির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকে কে জানে।"সাধুর কপালে ভাঁজ পড়ল, মুখ গম্ভীর হল। তীরে এসে শেষ পর্যন্ত যদি তরী ডুবে যায় এই ভয়ে দেবেন্দ্র সাধুর পা জড়িয়ে ধরে বলল, "প্রভু আপনার কৃপা থাকলে সবকিছুই সম্ভব হতে পারে। জন্মান্তরের কর্মফলও আপনি ইচ্ছে করলে খণ্ডন করতে পারেন। এটুকু অন্ততঃ আমি বুঝতে পেরেছি। বড় আশা নিয়ে আমি ঘর ছেড়েছি। তাই আমাকে দয়া করে ফিরিয়ে দেবেন না। আপনার চরণে আমার এই প্রার্থনা। আমাকে সন্ন্যাস দিন,সাধনার কঠোর কঠিন পথ

অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছবার শক্তি দিন।" সাধু আবার প্রসন্ন হাসি হাসলেন, মধুর কণ্ঠে বললেন, "সন্ন্যাস চাইলেই সন্ন্যাস পাওয়া যায় না বেটা! গেরুয়া ধারণ করলেই কি সন্ন্যাসী হওয়া যায়? এইত তুই গেরুয়া পরে রয়েছিস, কিন্তু সন্ন্যাসী হতে পেরেছিস কি? প্রকৃত সন্ন্যাসী হতে গেলে একজন্মের সাধনায় হয় না। জন্মজন্মান্তরের সাধনা সুকৃতী থাকলে তবেই হয়। পার্থিব ভোগ খণ্ডন না হলে মনে ত্যাগ আসে না, ত্যাগ না হলে শুদ্ধি আসে না, শুদ্ধি না আসলে সন্ন্যাস হয় না। তোর যে পার্থিব ভোগ রয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি।"

সাধুর কথা শুনে দেবেন্দ্র মনে মনে হতাশ হল। যার জন্য সে আজ দুটি বছর ধরে বহুকষ্ট স্বীকার করে জলে-জঙ্গলে নগরে-কান্তারে ঘুরে বেড়িয়েছে। তা কি পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে? কূলে এসে সে কি আবার অকূলে ভেসে যাবে? সংসার যে তার জন্য নয়। তা চরম তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই বয়সেই সে বুঝে নিয়েছে। তাই সংসার জীবনে সে কোনক্রমেই আর ফিরে যাবে না। যে পথে সে বেরিয়েছে, সেই পথেই তাকে চলতে হবে। লক্ষ্য ভ্রষ্ট কিছুতেই হবে না। তাই সাধুর চরণ স্পর্শ করে বলল, "আমাকে ফিরে যেতে বলবেন না বাবা। বহুকষ্টে আজ আপনার চরণতলে পৌঁছেছি আমি। সংসারে আমার আশ্রয় ভালবাসা বিশ্বাস কিছুই নেই । তাই বিষবৎ সংসার পরিত্যাগ করে আমি পরমপ্রাপ্তির সন্ধানে পথে পথে ঘুরে মরছি। আপনি আমাকে পরমার্থ লাভের পথের সন্ধান দিন। আপনার চরণতলে যখন একবার পৌঁছে গিয়েছি তখন ফিরে আমি যাবনা। আপনার চরণ আঁকড়ে এখানেই পড়ে থাকব।"

সাধুর প্রসন্ন দৃষ্টি প্রসন্নতর হল। সস্নেহে বললেন, " তোকে ফিরেয়ে দেব একথাতো একবারও বলিনি আমি। ফিরিয়েই যদি দেব তবে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম কেন? আসলে ঈশ্বরোপলব্ধি যে জীবের পক্ষে কত কঠিন শুধু তাই বলছি। তিনি আসলে আমাদের খুব কাছেই আছেন। কিন্তু মোহবশতঃ আমরা তার কাছে যেতে পারি না। ঈশ্বরকে কেউ পাইয়ে দিতে পারে না বাবা! সাধনার দ্বারা নিজেকেই পেতে হয় তাঁকে। গুরু পথের দিশারীমাত্র। কিন্তু পথ চলতে হবে নিজেকেই। তবে প্রাবব্ধভোগ ক্ষয় না হলে পথের শেষে পৌঁছানো যায় না। তবু ঐকান্তিক আগ্রহ থাকলে যে যতটুকু সাধনভজন করে তার ফল নষ্ট হয় না। জন্মজণ্মান্তরের জন্য সঞ্চিত থাকে। যাক, আজ তুই ক্লান্ত, মনও তোর খুবই চঞ্চল। তাই এসব কথা এখন বুঝবি না তুই। আজ রাতটা আমার এই ঝুপড়িতেই

বিশ্রাম কর। কাল খুব ভোরে গঙ্গায় স্নান করে আসবি। তারপর তোর কানে ইষ্টমন্ত্র দেব আর কয়েকটা সাধন প্রক্রিয়াও শিখিয়ে দেব। এগুলো নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে। তারপর দেখা যাবে ' আজ তোর সঙ্গে আর কথা হবে না।'' একথা বলে সাধু উঠে গিয়ে ঘরের কোণে আর একখানি আসন পাতলেন এবং আচমন করে আবার ইষ্ট আরাধনায় রত হলেন। বেশ কিছুক্ষণ অনুচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ করার পরে তিনি কমণ্ডলু থেকে এক অঞ্জলি জলপান করলেন। তারপর ঝুপড়ির দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ঐ এক অঞ্জলি জলপান করা ছাড়া দেবেন্দ্র সারাদিন সাধুকে কিছু খেতে দেখেনি। এতে মনে মনে বড়ই অবাক হল সে।

সাধুর শেষের দিকের কথায় দেবেন্দ্র আশ্বস্ত হল। এতদিনে যথার্থ গুরু মিলেছে। এখন সে যদি নিষ্ঠাভরে গুরু নির্দেশিত পথে চলতে পারে, তবেনিশ্চয়ই অভীষ্ট পূরণ হবে। তার মনের এতদিনের জমাটবাঁধা ভার যেন নিমেষে মন থেকে নেমে গেল। প্রশান্ত মনে গুরুর চরণ স্মরণ করে সে ঘরের কোনে রাখা চাটাইয়েশুয়ে পড়ল এবং একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। সে ঘুম গভীর শান্তির ঘুম।

পরদিন গঙ্গাস্নানের পরে দেবেন্দ্রের কানে ইষ্টমন্ত্র দিলেন গুরু আর শিখিয়ে দিলেন কিছু সাধন প্রক্রিয়া। দেবেন্দ্র নিষ্ঠার সঙ্গে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগল আর গুরুর নির্দেশমত সাধনপ্রক্রিয়াগুলোর অনুশীলন করতে লাগল। আহারের,বাসস্থানের চিন্তাও তার নেই। সব ভার গুরু নিয়েছেন। গুরুর ঝুপড়ির লাগোয়া দেবেন্দ্রর জন্য একটা ছোট ঝুপড়ি তৈরী করা হয়েছে। সেখানেই দেবেন্দ্রের সাধনভজন আহার নিদ্রা সবই চলে। গুরু নিত্য কোথা থেকে দেবেন্দ্রের আহার সংগ্রহ করেন সে জানে না। গুরু নিজে আহার্য বিশেষ গ্রহণ করেন না। দেবেন্দ্র লক্ষ্য করে দেখেছে যে তিনি নিত্যদিন এক অঞ্জলি মাত্র জল পান করেন। তিনদিন পর পর দুটি মাত্র ফল আহার্য হিসাবে গ্রহণ করেন।

গুরুর আশ্রয়ে দেবেন্দ্র খুবই ভাল আছে। এখন বাড়ীর কথা তার মনেই পড়ে না। শৈলর চিন্তাও মনকে পীড়িত করে না। অধ্যাত্ম-উন্নতির চিন্তাই সর্বক্ষণ তার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। একটা নির্মল আনন্দ যেন সারাক্ষণ তাকে ঘিরে থাকে। তার আগের চিত্তচাঞ্চল্যের ছিঁটাফোটাও এখন নেই। চিত্ত এখন প্রশান্ত, স্থির।

গুরুর নির্দেশ নিষ্ঠাসহকারে পালন করে খুব অল্পসময়ের মধ্যেই দেবেন্দ্র

অধ্যাত্ম উন্নতির প্রাথমিক ধ' ' অতিক্রম করল। এত অল্পসময়ে তার এই উন্নতি দেখে গুরুও খুবই প্রীত হলেন। তারপর তিনি দেবেন্দ্রকে যোগধ্যান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কয়েকটি যোগের প্রক্রিয়া শিক্ষা দিয়ে সেগুলো নিত্যঅভ্যাস করতে নির্দেশ দিলেন এবং ধ্যানের নিয়মাদি সম্বন্ধেও নির্দেশ দিলেন। দেবেন্দ্র এখন নিয়মমত যোগাভ্যাস করে এবং ধ্যান করে। ধ্যানে প্রথম প্রথম সে মন বসাতে পারেনি। কিন্তু ঐকান্তিক চেষ্টায় ধীরে ধীরে তার চিত্ত সমাহিত হল এবং এখন দীর্ঘসময় অনায়াসে সে ধ্যানস্থ থাকতে পারে। এখন ধ্যানস্থ অবস্থায় তার অনেক অলৌকিক দর্শনও হয়। দিব্যজগতের আস্বাদলাভ করে নিজেকে ধন্য মনে হয়। যোগেও তার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। শিষ্যের এই ক্রমবর্ধমান উন্নতিতে গুরুও খুবই খুশী। যোগধ্যান নিয়মিত অভ্যাস করলেও যোগসিদ্ধ হওয়া যেমন সময়সাপেক্ষ তেমনি কঠিন ব্যাপার। তাই গুরুসান্নিধ্যে থেকে প্রায় বছর দেড়েক ধরে চলল দেবেন্দ্রের একনিষ্ঠ যোগসাধনা। যোগসাধনায় পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হলেই হয়ত গুরু তাকে সন্ন্যাস দেবেন। প্রায় চার বছর হয়ে গেল দেবেন্দ্র ঘর ছেড়েছে। কিন্তু এই চার বছরে দেবেন্দ্রের প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। সে আর সেই আগের দেবেন্দ্র নেই। তার দেহে মনে এসেছে একটা দিব্যভাব। দিব্যজগতের খুব কাছাকাছি এখন তার বিচরণ। আর একটু এগুতে পারলেই দিব্যজগতে ঘটবে তার উত্তরণ। আশাতীতভাবে দেবেন্দ্র সাধনজগতে এগিয়ে গেছে। তার মন এখন প্রশান্ত,দিব্যভাবে ভাবিত। গুরু এখন শিষ্যের সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলেন না। নীরবে তিনি শিষ্যের যাবতীয় প্রয়োজন মিটিয়ে চলেছেন আর তার সাধন' : দিকে তীক্ষ্ম নজর রাখছেন। মায়ের কোলে শিশু যেমন নিশ্চিন্ত, গুরুসান্নিধ্যে দেবেন্দ্রও তেমনি নিশ্চিন্ত।

হরিদ্বারে গুরুসান্নিধ্যে একটানা প্রায় বছর দু'য়েক সাধনভজনের পর গুরু দেবেন্দ্রকে নিয়ে পরিব্রাজনে বের হতে মনস্থ করলেন। কারণ সাধনার ক্ষেত্রে পরিব্রাজনের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। দেবেন্দ্র অবশ্য শৈব সাধুদের সঙ্গে একবার পরিব্রাজনে বের হয়েছিল। কাজেই সাধকের জীবনে পরিব্রাজন যে অত্যাবশ্যক তা দেবেন্দ্ররও জানা আছে। গুরু শিষ্যকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। শুভদিন দেখে গুরু শিষ্য মিলে যাত্রা শুরু হল। প্রথমেই গুরু শিষ্যকে নিয়ে হিমালয়ের পথে পা বাড়ালেন। দেবতাত্মা হিমালয় বহু সিদ্ধ সাধকের আবাস স্থল। তুষারাবৃত হিমালয়ের মৌনগম্ভীর পরিবেশ সাধকের সিদ্ধির পক্ষে বড়ই

অনুকুল। হিমালয়ে দেবতারা সতত বিচরণ করেন এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে। তাই সাধুসন্তরা হিমালয়ের গিরি কন্দরেই তপস্যায় মগ্ন থাকেন। লোকহিতের প্রয়োজনে অনেক সময় তারা নেমে আসেন সমতলে। কত সাধু যে শত শত বছর ধরে গোপনে হিমালয়ের গিরি কন্দরে তপস্যানিরত আছেন তা জানা যায় না। তাই গুরু শিষ্যকে নিয়ে প্রথমেই গেলেন হিমালয়ের পথে।

চিরতুষারাবৃত গিরিরাজ হিমালয়েরমৌন গুরুগম্ভীর রূপ দেখে দেবেন্দ্র বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রইল। এই মৌনমহান পর্বতের গুহাকন্দরে পর্বতগাত্রে যেমন আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি তেমনি আছে জীবনসংশয়কারী ভয়াল পরিবেশ। দেবেন্দ্রের মনে হল, মহামহিম হিমালয় সত্যিই দেবতার লীলাভূমি। এই হিমালয়ের মহিমা ক্ষুদ্র মানুষের বর্ণনার অতীত। ক্ষুদ্র মানবের সেই সূক্ষ দৃষ্টিই বা কোথায়?

হিমালয়ের পার্বত্য পথ অতিশয় দুর্গম। প্রতিপদে জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। স্থানে স্থানে প্রকৃতির বুকে রয়েছে মৃত্যুর হাতছানি, রয়েছে জানাঅজানা নানা হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আক্রমণের আশংকা আবার জন শূন্য পার্বত্য পথে অশরীরীদের উপস্থিতির একটা আভাসও যেন মনের মধ্যে একটা গা ছমছম করা ভয়ের উদ্রেক করে। গুরুর অভয়হস্ত ধারণ করে দেবেন্দ্র হিমালয়ের দুর্গম পথ পাড়ি দিতে লাগল। হিমালয়ের পথে দীর্ঘদিন ধরে তপোমগ্ন অনেক পুণ্যাত্মার দেখা মিলল ও তাদের আশীর্বাদ লাভ করে জীবন ধন্য হল। অনেক অলৌকিক দর্শন ও ঘটল। যা দেবেন্দ্র এখানে না এলে কল্পনাও করতে পারত না,হিমালয়ের হিমশীতল মৌনতার মধ্যে এমন অলৌকিক বিস্ময় লুক্কায়িত আছে যা আমাদের স্থুল চর্মচক্ষুতে তা দেখা যায় না। সাধানার দ্বারা চিত্ত নির্মল না হলে যেমন দিব্যজ্ঞান জন্মে না, দিব্যচক্ষু লাভ না করলে দিব্যজগতের দ্রষ্টব্য বস্তুও দেখা যায় না। দেবেন্দ্রর পক্ষেও দিব্যদর্শী গুরুদের সঙ্গে না থাকলে এমন অলৌকিক দর্শন লাভ ঘটত না এবং এমন দুর্গম পথ সহজে অতিক্রম করাও সম্ভব হত না। সবই গুরুর অসীম কৃপা। ক্ষুদ্র বৃহৎ, ভাল মন্দ, ভয় বিস্ময়ের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে করতে দুর্গম গিরি হিমালয় ও তার সমতল অঞ্চলগুলিতে পরিব্রাজনে কাটিয়ে দিল প্রায় টানা একটি বছর। সেই ভ্রমণ কাহিনী এক আলাদা বৃত্তান্ত। হিমালয় ভ্রমণ শেষ করে গুরু শিষ্যসহ ফিরে এলেন নিজ আস্থানায়,হরিদ্বারের সেই ঝুপড়িতে।

কিছুদিন হরিদ্বারে নিজ আস্থানায় বিশ্রাম করে সশিষ্য গুরু আবার যাত্রা করলেন বিন্ধ্যপর্বতের উদ্দেশ্যে। বিন্ধ্যের আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে গুরু এই পর্বতের বৈশিষ্ট সম্বন্ধে শিষ্যকে সমাক ধারণা করার সুযোগ দিলেন এবং এখানে এমন কয়েকটি দৈবমাহাত্মপূর্ণ দুর্গম স্থান দর্শন করা হল যার সন্ধান অনেকেই রাখে না। ভারতে বিখ্যাত বিখ্যাত তীর্থগুলি ছাড়া এমন কতগুলি পুণ্যভূমি আছে, যার সন্ধান সিদ্ধ সাধু ছাড়া অন্য কেউ জানে না। গুরু দেবেন্দ্রকে সেইসব পুণ্যভূমি পরিদর্শন করালেন। কত বন, কত নদী, কত গুহা কত ঝর্ণা যে দেখা হল তার ইয়ত্তা নেই। ভ্রমণে মন উদার হয়। সংকীর্ণতার গণ্ডী ছেড়ে বৃহতের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই চিত্তের সংযোগ সাধিত হয়। স্রষ্টার সৃষ্টি মাহাত্মের উপলব্ধি হয়। ফলে মনের মালিন্য দূরীভূত হয়ে চিত্ত নির্মল হয়, পবিত্র হয়। এই উদ্দেশ্যেই গুরুর শিষ্যকে নিয়ে এই পরিব্রাজন। কারণ নির্মল পবিত্র চিত্তেই ঘটে ঈশ্বরের আর্বিভাব।

এরপর গুরু শিষ্যকে নিয়ে নর্মদা পরিক্রমাকরতে মনস্থ করলেন। শিবপুত্রী নর্মদা অতি পবিত্র নদী। তপোভূমি নর্মদা। সুপ্রাচীনকাল থেকে এই নর্মদাতীরে তপস্যারত থেকে কত সাধু মহাপুরুষ যে চরম সিদ্ধিলাভ করে গেছেন এবং এখনও করছেন তার ইয়ত্তা নেই। সিদ্ধিলাভের এক বিশেষ স্থান যেমন হিমালয় তেমনি এই নর্মদার তীরভূমি। এখানে বহু শক্তিশালী সিদ্ধপুরুষ বিচবণ করছেন। তাই নর্মদা পরিক্রমণে অশেষ পণ্যসঞ্চয় হয়। তবে এই পরিক্রমার পথ বড়ই বিপদসংকুল। অনেকে এই পরিক্রমার পথে বেঘোরে প্রাণ হারায়। অবশ্য সাধুরা দলবেধেই এই নর্মদা পরিক্রমা করে থাকেন। কিন্তু দেবেন্দ্রের গুরু কোন সাধুর দলের সঙ্গে যোগ না দিয়ে শুধুমাত্র শিষ্যকে নিয়েই পরিক্রমা শুরু করলেন। কারণ তিনি শক্তিধর মহাপুরুষ। তাই যে কোন বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করার অলৌকিক শক্তি তার মধ্যে রয়েছে। দেবেন্দ্রর জীবনে এই পরিক্রমা একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা। নর্মদার দক্ষিণ তীর ধরে গুরু শিষ্য রওনা হলেন। পথে মাঝে মাঝে পরিক্রমাকারী অনেক সাধুর দলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রতি পদে পদে হয়েছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সারাদিন পথচলার পর সন্ধ্যায় কোন না কোন মন্দিরে আশ্রয় নিতে হয়েছে। আবার প্রাতঃকৃত্য সেরে নগ্নপদে পথচলা শুরু হয়েছে। পথে যেতে যেতে কত যে ভয়াল অরণ্য পার হতে হল। কত যে হিংস্র জন্তুজানোয়ারের সম্মুখীন হতে হল। অসভ্য হিংস্র আদিবাসীদের কবলে পড়তে হল তার ইয়ত্তা

নেই। এই চলার পথে যে কোন সময় জীবন বিপন্ন হতে পারে। তবু পরিক্রমাকারীরা জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে অবিরাম পথ চলেছে। নগ্নপদে চলার দরুণ নানা আঘাতে পা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য বন্যগাছের মূল খেতে হচ্ছে। কারণ পরিক্রমনকালে একদিনের মত ছাড়া খাদ্য সঞ্চয়ের নিয়ম নেই। অনেককে বাঘের মুখে,সাপের ছোবলে প্রাণ দিতে হচ্ছে। তবু পথ চলার বিরাম নেই। আবার পথে অনেক সিদ্ধ সাধকের সাক্ষাৎলাভও ঘটেছে। এইসব সাধকরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী। তাঁরা আকাশমার্গে বিচরণ করতে পারেন, সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন, হিংস্র জন্তুকে বশ মানাতে পারেন। জলে,স্থলে, অন্তরীক্ষে তাদের অবাধ গতি। এত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ যে মানবদেহ ধারণ করে পৃথিবীতে বর্তমান আছেন, তা এই পরিক্রমায় না এলে দেবেন্দ্র কোনদিনই জানতে পারত না। এদের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে দেবেন্দ্র শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে আপ্লুত। জন্মান্তরের বহু সুকৃতি ভিন্ন এরূপ উচ্চকোটির সাধকের দর্শন মিলে না। দেবেন্দ্র এই সাধুদের সঙ্গে গুরুর নিরন্তর ভাববিনিময় দেখে আরও আশ্চর্য হল এবং বুঝতে পারল তার গুরুও এইসব শক্তিধর সাধকদের সমপর্যায়ের শক্তিধর সাধক। অথচ কত স্নেহে যত্নে তিনি দেবেন্দ্রের মত এক অতি সাধারণ শিষ্যকে আগলে বেড়াচ্ছেন। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় দেবেন্দ্রের মনভরে যায়। জন্মান্তরের বহু সুকৃতির ফলেই তার ভাগ্যে এমন গুরু লাভ হয়েছে। বিন্ধ্য পরিভ্রমণ ও নর্মদা পরিক্রমা শেষ করতে সময় লাগল এক বছরেরও বেশী। পরিক্রমা শেষ করে যথাবিধি ভৃগুকচ্ছ বা ভারোচে পরিক্রমা বিসর্জন দেওয়া হল। এখানেই নর্মদামাতা তাঁর গতি শেষ করে আরবসাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। এই পবিত্র সঙ্গমস্থান দেখে দেবেন্দ্রর নয়নমন সার্থক হল, জীবন ধন্য হল।

নর্মদা পরিক্রমণ খুবই শ্রম সাধ্য ব্যাপার, অনেকে পরিক্রমা শুরু করে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। অনেকে প্রাণ হারায়। তবু সাধুসন্তরা এই পরিক্রমা থেকে বিরত থাকেন না। নর্মদামায়ের কৃপা ভিন্ন এই পরিক্রমা সম্পন্ন করা যায় না বলে অনেকের বিশ্বাস। এই পরিক্রমণ অত্যন্ত্য শ্রমসাধ্য ব্যাপার বলে দেবেন্দ্ররা গুরুশিষ্য উভয়েই খুবই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য গুরুর শ্রান্তি নেহাৎ বাহ্যিক ব্যাপার। তিনি শক্তিধর সাধক। তাই শ্রান্তি ক্লান্তি মূলতঃ তাকে স্পর্শ করতে পারেনা। কিন্তু বাইরে তার সাধনশক্তির কোন প্রকাশ নেই। লোকচক্ষে তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন।

দেবেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে গুরু সান্নিধ্যে আছে বলেই গুরুকে কিছুটা বুঝতে পারে।

ভারোচের কাছাকাছি এক মনোরম স্থানে গুরুর পরিচিত এক সাধুর আশ্রমে গুরু শিষ্যসহ মাসাধিক কাল বিশ্রাম গ্রহন করলেন। সর্বতীর্থ পর্যটনকরে ঐ সাধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেভরা এই বনে আশ্রম স্থাপন করেছেন নিরিবিলি ধ্যানতপস্যার জন্য। এখানে সাধুর তিনজন শিষ্য আছে। তারাই আশ্রমের পরিচর্যা করে। যে কোন অতিথি এলে এখানে আপ্যায়িত হয়। সাধুর এক ধনী ব্যবসায়ী শিষ্য বারমাস আশ্রমের ব্যয় বহন করেন। কাজেই আশ্রমে অন্নবস্ত্রের সমস্যা নেই। সাধু পরম বৈষ্ণব। এখানে রোজ রাধাগোবিন্দের ভোগ হয়। শিষ্য এবং অতিথিরা সেই প্রসাদ পায়। আশ্রমের পরিবেশ সাধনভজনের পক্ষে খুবই অনুকূল। নিতান্ত বিষয়ীলোকের মনও এখানে এলে ভগবৎমুখী হতে বাধ্য। আশ্রমবাসীরা মোটামুটি মৌন। মৌনতার মধ্যে দিয়েই ঘড়ির কাঁটার মতনিয়মমাফিক আশ্রমের যাবতীয় কর্ম সম্পাদিত হয়। কর্মের অবসরে আশ্রমবাসীরা সাধনভজনে মগ্ন থাকে। এখানকার সাধুমহারাজ সাধনভজনের জন্য উপযুক্ত স্থানটিই আশ্রমের জন্য নির্বাচিত করেছেন। দেবেন্দ্রও গুরুর নির্দেশে আশ্রমের কাজে কর্মে অংশ গ্রহণ করে এবং বাকীসময়ে গুরুর নির্দেশমত জপধ্যানে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। এখানকার দিনগুলি অনাবিল শান্তির মধ্য দিয়ে কেটে যায়। পরিক্রমনজনিত শ্রান্তিক্লান্তি দূর হলে গুরু আবার দেবেন্দ্রকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। মধ্য ও পশ্চিম ভারতের মধ্যে যত তীর্থ আছে সবগুলিই পরিদর্শন করা হয়। সারাদিন চলে পথ চলা, সন্ধ্যায় চলার বিরাম। কোনদিন কোন মন্দির প্রাঙ্গণে; কোনদিন বৃক্ষতলে কোনদিন কোন পরিত্যক্ত ভাঙা মন্দিরে কোনদিনবা রাজপথের ধারেও রাত্রি অতিবাহিত হয়। খাওয়াদাওয়ার হাঙ্গামাতো নেই বললেই চলে। গুরু আহার্য্য প্রায় গ্রহণ করেন না। আর দেবেন্দ্রের আহার তিনি যথাসময়ে জুটিয়ে দেন। কিন্তু কিভাবে তা দেবেন্দ্র বুঝতে পারে না। তবে ঠিকসময় তার আহার জুটে যায়। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে সশিষ্য, গুরু এলেন প্রভাসতীর্থে। এখানে দর্শনীয় স্থান দর্শন করে তিনি উপস্থিত হলেন একসিদ্ধ মহাপুরুষের আস্তানায়। খুবই নির্জন এলাকায় এক ভাঙা পরিত্যক্ত মন্দিরে এই মহাপুরুষের আস্তানায়। ইনি যোগীপুরুষ। এই যোগীপুরুষ বল্কল পরিহিত, দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারা। দীর্ঘজটা মাথার সামনের দিকে চূড়ো করে বাঁধা। ঈষৎ রক্তাভ উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু,গায়ের রং নিকষ কালো। সর্বঅবয়বে একটা তেজ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দেখলে একটা

ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রম জাগে। তবে তেজদীপ্ত আয়ত চক্ষু দুটি যেন আনন্দে ঝলমল। চক্ষু দুটিতে যেন একই সঙ্গে সূর্যের তেজ আর চাঁদের স্নিগ্ধতা খেলা করছে। ঐ একজোড়া চক্ষু ভিন্ন পৃথিবীতে বোধ হয় আর এমন চক্ষু নেই। অন্ততঃ দেবেন্দ্রের তাই মনে হল। যোগীর আস্তানায় অর্গলবিহীন দুইটি কক্ষ। যোগীবরের সঙ্গে নাকি গুরুদেবের বিশেষ কথা আছে।

যোগীর আস্তানায় কোন আলোর ব্যবস্থা নেই। প্রজ্জ্বলিত ধুনির আলোকেই যতটুকু সম্ভব আলোর কাজ চলে। আহার্যেরও কোন ব্যবস্থা নেই। যোগীপুরুষ নিরাহারী। ব্রাহ্মমূহুর্তে স্নান সমাপন করে তিনি যোগধ্যান করেন তারপর কিসের যেন দুটো পাতা চিবিয়ে তিনি পূর্ণ এক কমণ্ডলু জলপান করেন। এতেই তাঁর অটুট স্বাস্থ্য বজায় থাকে। অন্য আহার্য্যের প্রয়োজন হয় না। আর গুরুদেবেরতো আহারের বালাই নেই। বাকী থাকে দেবেন্দ্র। তবে তারও কোন অসুবিধা হল না। যোগীবর তাকে প্রতিদিন দু'টি করে সুস্বাদু একপ্রকার ফল প্রদান করেন। এই দুটো ফল খেয়েই দিব্যি সারাদিন কেটে যায়। ক্ষুধাবোধ হয় না।

গুরু এখানে এসেছেন যোগীপুরুষের সঙ্গে আলাপচারিতার জন্য। কিন্তু তাদের মধ্যে আজ পর্যন্ত একটিও কথা হল না। যে যার মত নীরবে ধ্যান তপস্যায় রত থাকেন। শুধু অপরাহ্নবেলায় ভাঙ্গা মন্দিরের বারান্দায় দু'জন মুখোমুখি বসেন। দেবেন্দ্র আড়াল থেকে লক্ষ্য করেছে, ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়, দু'জনের মধ্যে একটা বাক্যেরও বিনিময় হয় না। তারপর সন্ধ্যা নামলে যে যার ঘরে চলে যান। দেবেন্দ্র আজ পর্যন্ত যোগীপুরুষের কণ্ঠস্বর শোনেনি। তৃতীয় রাত্রিতেদেবেন্দ্র আর কৌতূহল চাপতে পারল না। গুরুকে প্রশ্ন করে বসল । বলল,"গুরুদেব আপনিতো যোগীবরের সঙ্গে কথা বলতেই এখানে এসেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ততো আপনাদের কোন কথা বলতে শুনিনি। কালতো আমরা চলেই যাচ্ছি। আপনাদের কথাটা হবে কখন?" প্রশ্ন শুনে গুরুদেব হাসলেন। সেই অমিয়ঝরা হাসি। বললেন,"সেকিরে! ঘন্টার পর ঘন্টা বারান্দায় বসেতো কথাই বলি, শব্দ না করেও মনে মনে চোখে চোখে কথা বলা যায়। কেমন করে বলা যায় সে তুই এখন বুঝবি না। আরও অনেক এগিয়ে গেলে এসব বুঝতে পারবি। যাক এখন আর এসব চিন্তা না করে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়। ভোরে আমাদের যাত্রা করতে হবে।"

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গুরুশিষ্যের যাত্রা শুরু হল। যোগীপুরুষ

সঙ্গে সঙ্গে এসে তাদের অনেকটা পথ এগিয়ে দিলেন। দেবেন্দ্রের মাথায় হাত দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন। এর আগে দেবেন্দ্রের দিকে তিনি ফিরেও তাকাননি। তাঁর করস্পর্শে দেবেন্দ্রের সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হল এবং তার শরীরে জ্বররোগীর মত একটা উত্তাপ সঞ্চারিত হল। দেবেন্দ্রের বিস্ময়ের অবধি রইল না। পথেযেতে যেতে সে গুরুকে এর কারণ জিজ্ঞেস করল। গুরু বললেন,"অসীম শক্তিধর পুরুষ তোর মধ্যে তার শক্তির কণামাত্র সঞ্চারিত করে দিয়েছেন, যাতে দুঃখে কষ্টে বিপদে আপদে ভেঙ্গে না পড়িস। আসলে তোর জন্যইতো আমার এখানে আসা, আর তোকে নিয়েই কথাবার্তা। আমি এ পর্যন্ত যা কিছু করছি সবই তোর জন্য।" দেবেন্দ্র আবার প্রশ্ন করল," এই শক্তিধর যোগীপুরুষের সঙ্গে আপনার কবে কিভাবে পরিচয় হল গুরুদেব?" গুরু বললেন,"এই তোর আমার সঙ্গে পরিচয় যেভাবে হয়েছে। সেইভাবেই ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। আর পরিচয়টাতো আজকের নয়। জন্মজন্মান্তরের পরিচয়। দেবেন্দ্র; ইনিই আমার গুরু।" গুরুর গুরু! দেবেন্দ্রের ভাগ্যে গুরুর গুরুর দর্শন ঘটেছে। একি সৌভাগ্য তার! আনন্দে আবেগে দেবেন্দ্রের দেহমন আন্দোলিত হতে লাগল। তাই গুরুর থেকে অনেকটা পিছনে পড়ে গেল সে। হৃদয়ের আবেগ কিছুটা প্রশমিত হলে দেবেন্দ্র ত্রস্তে পথ চলে গুরুর নিকটবর্তী হল। গুরু শিষ্যকে নিয়ে পৌঁছলেন পুরীধামে। শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরে পূজা দেওয়া হল। তারপর কোনারকের বিখ্যাত সূর্যমন্দিরও দর্শন করা হল। তাছাড়া ওড়িষ্যার আরও খ্যাত ও অখ্যাত মন্দিরগুলিও দর্শন করা হল। কোন কিছুই বাদ দেওয়া হল না। তারপর পুরীতে গুরু জগন্নাথ মন্দিরেই দু'দিনের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি শিষ্য সহ যাত্রা করলেন দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণের তীর্থগুলির মধ্যে সেতুবন্ধ রামেশ্বরম ও কন্যাকুমারিকাই যদিও প্রধান লক্ষ্য ছিল তথাপি অন্যান্য তীর্থ ও মন্দিরগুলিও একে একে সবই দর্শন করা হল। পুরীতেও দক্ষিণের তীর্থগুলিতে দেবেন্দ্র শৈবসাধুদেরসঙ্গে আগেও এসেছে। তবু গুরুর সঙ্গে তীর্থদর্শনের মহিমাই আলাদা। যত তীর্থদর্শন করে ততই যেন দেবেন্দ্রের মন উদার হয়। পবিত্র হয়। সবই শ্রীগুরুর অসীম কৃপা।

নর্মদা পরিক্রমাসহ এই পরিব্রাজনে প্রায় দীর্ঘ দুই বছর কেটে গেল। দুই বছরের কাছাকাছি সময় এবার গুরু পূর্বমুখী হলেন। চলতে চলতে এসে পৌঁছলেন একান্নপীঠের একপীঠ কামাখ্যায়। কামাখ্যামন্দির দর্শন করা হল পূজা দেওয়া

হল। অনেক মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এবং দেবেন্দ্র সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল যে, সব মহাপুরুষরাই যেন গুরুদেবের পূর্বপরিচিত। গুরু কামাখ্যা মন্দিরে তিনদিন অবস্থান করলেন এবং আসামরাজ্যের দ্রষ্টব্য স্থান ও মন্দিরগুলো দর্শন করলেন। তারপর তিনি সশিষ্য ফিরে এলেন হরিদ্বারের সেই ঝুপড়িতে। কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণের পর উত্তরভারতের তীর্থগুলি দর্শনের জন্য তিনি আবার প্রস্তুতি নিলেন।

কিন্তু দেবেন্দ্রের আর পরিব্রাজনের ইচ্ছা নেই। তার ইচ্ছা কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়ে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করা। তাছাড়া শৈবসাধুদের সঙ্গে সে উত্তরভারতেরও অনেক তীর্থই দর্শন করেছে। শুধু বৃন্দাবন পরিক্রমাটাই বাকী আছে। সে ঘর ছেড়েছে প্রায় সাত বছর হতে চলল। এর মধ্যে প্রায় দু'বছর মাত্র কেটেছে ধ্যান তপস্যায়। আর বাকী সবক'টি বছরই কেটেছে পরিব্রাজনে। তার ইচ্ছা আর পরিব্রাজনে সময় খরচ না করে পূর্বাশ্রমের সঙ্গে সম্পর্ক সপূর্ন ছিন্ন করে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে নিরন্তর ধ্যান তপস্যায় রত থেকে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করা। তাই আর পরিব্রাজনে তার মোটেই ইচ্ছে নেই। গুরুর সঙ্গে দেবেন্দ্রের খুবই সহজভাব। তাই সহজেই সে গুরুর চরণে তার ইচ্ছের কথা নিবেদন করল। গুরু তার এই ইচ্ছের কথা শুনে তিরস্কারের সুরে বললেন, "তোর কিসে ভাল হবে, সেটা তুই বেশী বুঝিস না আমি বেশী বুঝি? শৈবসাধুদের সঙ্গে ঘুরে এসেছিসত কি হয়েছে? তীর্থের মাহাত্ম্য কি উপলব্ধি করেছিস কিছু? তুই কি করেছিস না করেছিস সব আমার জানা আছে। ভারত দর্শন না করলে আত্মদর্শন হয় না। কারণ ভারত শুধু একটি দেশই নয়। ভারত দেবভূমি। এ দেশের প্রতি ধূলিকণায় ছড়িয়ে আছে দেবতার মাহাত্ম্য। ভারতকে উপলব্ধি না করতে পারলে আত্মোপলব্ধি হয় না। সাধুসন্তরা কি বিনা প্রয়োজনেই পরিব্রাজন করেন? আগে বাইরেটা ভাল করে চিনে নিতে হয়। তারপর অন্তর সমুদ্রে ডুব দিয়ে ইচ্ছেমত মনিমানিক্য তুলে আনা যায়।" গুরুর প্রথমদিকের কথার সুরে তিরস্কার থাকলেও শেষদিকে সেই সুর স্নেহে বিগলিত। দেবেন্দ্রের জীবনে গুরুকর্তৃক এই প্রথম তিরস্কার। দেবেন্দ্র বড়ই লজ্জিত হল এবং গুরুর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করল। গুরু হাসলেন; চিরপরিচিত সেই হাসি যা দেবেন্দ্রের প্রাণমন সুশীতল করে দেয়। তারপর দেবেন্দ্রের মনে কোন গ্লানি রইল না। সে গুরুর নির্দেশমত যাত্রার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

যথাসময়ে রওনা হয়ে কাশী, গয়া মথুরা, বৃন্দাবন, ত্রিবেণীতীর্থ ইত্যাদি সব তীর্থই দর্শন করা হল এবং মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেওয়া হল। খুবই নিষ্ঠাভরে

বৃন্দাবন পরিক্রমা করা হল। গয়াতে গুরু দেবেন্দ্রকে দিয়ে পিতৃতপর্ণ করালেন। দেবেন্দ্রের ভারত দর্শন প্রায় সমাপ্তির পথে। তাই গুরু রাত্রি প্রথম প্রহরের অবসর কালীন সময়ে প্রতিদিন একটু একটু করে দেবেন্দ্রের কাছে সর্ব তীর্থের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করলেন। গুরুমুখে এই তীর্থমাহাত্ম্য শুনে দেবেন্দ্রের হৃদয়ে অনির্বচনীয় পবিত্রভাবের উদয় হল। অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হতে হলে যে পরিব্রাজন অত্যাবশ্যক তা দেবেন্দ্র মনে প্রাণে অনুধাবণ করতে পারল। অধ্যাত্মপথে তার অগ্রগতির জন্যই যে পরমকরুনাময় গুরুর তাকে নিয়ে এই পরিব্রাজন তাও সে উপলব্ধি করতে পারল। এই পরিব্রাজন সম্পূর্ণ করার ফলে দেবেন্দ্র যেন সম্পূর্ণ এক নূতন মানুষে পরিণত হল।মনে হয় তার যেন নবজন্ম হয়েছে। দেবেন্দ্র মনে মনে স্থির করল,নিজের ইচ্ছে বলে সে আর কিছু রাখবে না। সমস্ত ইচ্ছা আকাঙ্খাই গুরুর চরণে সমর্পন করবে। গুরুর নির্দেশ পালন করাটাকেই সে ভগবৎ প্রাপ্তি বলে মনে করবে। শ্রীগুরুর. উপর পূর্ণ নির্ভরতাই অধ্যাত্মজীবনে উত্তরণের একমাত্র চাবিকাঠি। এই সত্য দেবেন্দ্র এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছে।

উত্তর ভারতের তীর্থ ভ্রমণ সম্পন্ন হল বেশ দ্রুত, মাত্র দুই মাসের মধ্যে। এখন গুরুশিষ্য হরিদ্বারের আস্থানায় ফিরে এসে টানা বিশ্রাম নিলেন। প্রায় সাড়ে তিন বছর দেবেন্দ্রের গুরুর সঙ্গে পরিব্রাজনে কেটেছে। ভারতের সমস্ত তীর্থই দর্শন করা হয়েছে। পরিব্রাজন আধ্যাত্মিক পথে অগ্রগতিরএকটা বিশেষ অঙ্গ। দেবেন্দ্রের জীবনে এই কর্ম সমাপ্ত। এখন গুরু তার জন্য কোন পথ নির্দেশ করবেন,দেবেন্দ্র তারই প্রতীক্ষা করছে। দেবেন্দ্রের মনে হল পরিব্রাজনের শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হলে গুরু বোধ হয় তাকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা দেবেন। সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা নিলে পূর্বাশ্রমের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে নবজন্ম হয়। নূতন নামকরণ হয়। পূর্বাশ্রমের বন্ধন ছিন্ন করে সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ এক নূতন মানুষে রূপান্তরিত হয়। গুরু তাকে গেরুয়া দিয়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত সন্ন্যাস দেননি। এতকিছুর পরেও পূর্বাশ্রমের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি অথচ দেবেন্দ্র পূর্বাশ্রমের সঙ্গে সব সম্পর্ব ছিন্ন করে সন্ন্যাসী হবে বলেই ঘর ছেড়েছিল। সন্ন্যাসের জন্য তার মন উদগ্রীব। এখন গুরুর ইচ্ছা। এবার পরিব্রাজন শেষে ফিরে আসার পর গুরুর সঙ্গে দেবেন্দ্রের কথাবার্তা খুব কমই হয়। ফিরে আসার পর থেকেই গুরুর মধ্যে যেন একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সদাপ্রসন্ন গুরু কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছেন। তার ললাটে চিন্তার রেখা। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি ধ্যানস্থ। দেবেন্দ্র ঘর ছেড়েছে

সাত বছর হয়ে গেল। কিন্তু এখনও তার অভীষ্ট পূরণ হল না। এজন্য মাঝে মাঝে মন উতলা হলেও সে ধৈয্য হারায় না। গুরুর পরবর্তী পথ নির্দেশের প্রতীক্ষায় থাকে।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই মধ্যরাতে হঠাৎ গুরুর আহ্বানে দেবেন্দ্রের ঘুম ভেঙ্গে গেল। দ্রুত শয্যাত্যাগ করে সে এসে দাঁড়াল গুরুর দরজায়। গুরু তাকে কাছে ডাকলেন এবং সামনের একটি আসনে বসতে বললেন। গুরুর নির্দেশে দেবেন্দ্র আসন গ্রহণ করল। স্নেহে, করুণায়,বেদনায় গুরুর কণ্ঠ দেবেন্দ্রের কানে অন্যরকম শোনাল। তিনি বললেন,"দেবেন্দ্র, অনেক চেষ্টা করেও তোর প্রারব্ধ খণ্ডাতে পারলাম না। তাই এ জন্মে তোর সন্ন্যাস হবে না। গৃহে তোকে ফিরতেই হবে। তোর ভাগ্যে যে সংসারভোগ রয়েছে তার খণ্ডন নেই। প্রারব্ধ কেউ খণ্ডাতে পারে না। অবতার পুরুষকে পর্যন্ত প্রারব্ধভোগ করতে হয়। সাধারণ মানুষতো কোন ছার। তোর সংসারের কথা তুই আমাকে কিছুই বলিসনি। আমিও জানতে চাইনি। কেননা তুই না বললেও আমি সবই জানি? সংসারে তোর মারাত্মক পিছুটান রয়েছে। আর রয়েছে নিদারুণ ভবিতব্য। সাধ্বী স্ত্রীর দুর্বার টান ঈশ্বরকে স্বর্গ হতে ধূলার ধরণীতে নামিয়ে আনতে পারে। আর মানুষেরতো কথাই নেই। সংসারের অনেক দুঃখ বিড়ম্বনা ভোগ তোর ভাগ্যে আছে। জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত কর্মফল ভোগ না করে জীবের মুক্তি নেই। তুই তোর এ জন্মটাই শুধু দেখতে পাচ্ছিস্ আর আমার মনে তোর অনেক জন্মের ছবি ধরা আছে। একটা জন্ম এমন কিছু বেশী সময় নয়। পরজন্মে তোর হবে। এ জন্মে তোর এই সাতটি বছরই আধ্যাত্মিক পথে বিচরণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আজ সেই সাতবছর পূর্ণ হয়েছে। কাল ভোরেই তোকে গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে। প্রভাসতীর্থে আমি আমার গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম তোর জন্যই। কিন্তু তিনিও তোর এই ভোগ খণ্ডনের কোন উপায় দেখতে পেলেন না। তাই ফিরে আসার সময় তোর মস্তক স্পর্শ করে তোর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে দিয়েছেন। এই শক্তির বলে তুই জীবনের দুঃখদুর্যোগ সহ্য করে যেতে পারবি। আর আমিত ছায়ার মত তোর পাশেই আছি এবং থাকব। ভাবনার কিছু নেই। আমি পূর্বজন্মেও তোর গুরু ছিলাম। এ জন্মেও তাই আছি, পরজন্মেও তাই থাকব। এ জন্মের মত তোর সাধনা সমাপ্ত। পরজন্মে প্রায় জন্মসিদ্ধ হয়েই জন্মাবি। আমার সঙ্গে তোর দেখাও হবে। তবে এখানে নয়। কেদারবদ্রীতে আমি তোর সঙ্গে মিলিত হব। তখন অতি

সামান্য সাধনায় তুই স্বরূপে ফিরে যাবি।" গুরু থামলেন,নীরব দেবেন্দ্রের চোখ দিয়ে অঝোরধারায় জল গড়াচ্ছিল। দেবেন্দ্রের চোখে জল দেখে গুরু তাকে মৃদুর্ভৎসনা করে বললেন,"দেবেন্দ্র! এত দুর্বল তুই! একটা জীবননাট্যের অভিনেতা হতে হবে বলে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছিস! এতদিন ধরে আমার কাছে কি শিক্ষা পেলি তুই?" দেবেন্দ্র তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলল। পরমস্নেহময় গুরুর এই মৃদুর্ভৎসনায় দেবেন্দ্রের আকুল চিত্ত সংযত হল।

গুরু আবার বলতে শুরু করলেন।" এবার তোর সংসার জীবনে কি হবে না হবে তাও বলে দিচ্ছি। সব জেনে বুঝে নিরাসক্ত মন নিয়ে সংসার জীবনের পথ পরিক্রমা করবি। পতিপ্রাণা প্রথমা স্ত্রী দীর্ঘায়ূ হবে না। গৃহশত্রুর চক্রান্তে তার প্রাণনাশ হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে হবে তোকে। সন্তান হবে মোট সাতটি। প্রথম পুত্রসন্তান বাঁচবেনা। এক অসামান্য যোগীপুরুষ সামান্য স্খলনের জন্য পৃথিবীতে তোর ঘরে তোর প্রথম সন্তানরূপে জন্ম নেবেন। ঊনত্রিশ দিন তার পরমায়ু। তবে মায়ার বশে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে ঊনত্রিশবছর পর্যন্ত আমি একটা উপায় বের করে দিতে পারি। কিন্তু সেটা না করাই ভাল। কারণ যে চলে যাবার জন্য এসেছে তাকে ধরে রেখে ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু নেই। তবু সংসারীর সন্তানের মায়া বড় সাংঘাতিক। তাই আমি ওষুধ হিসাবে একটা শিকড় তোকে দিচ্ছি। ঊনত্রিশ দিন বয়সে শিশু যখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে তখন এই শিকড়টা বেটে মধুর সঙ্গে খাইয়ে দিলে শিশুতৎক্ষণাৎ জীবন ফিরে পাবে। কিন্তু ঊনত্রিশ বছর বয়সে তাকে কোনমতেই ধরে রাখা যাবে না, একথা মনে রাখিস। সংসার করলেও সংসার সুখ তোর ভাগ্যে নেই। বঞ্চনা,প্রতারণা,শত্রুতা, শোকতাপ এসবের মধ্য দিয়েই তোর জীবন কাটাতে হবে। সবসময় ধৈর্য রাখিস্। তবেই অসুবিধা কিছু হবে না। সংসারে থাকলেও সাধন ভজন ভুলে থাকিস্ না, আমি তোকে এই ঝোলাটা দিলাম। এতে সাধনভজনের নানা পদ্ধতি লেখা গুটি কয় পুঁথি আছে. জপের মালা আছে,রুদ্রাক্ষ আছে, আর আছে ওষুধ হিসাবে কিছু মূল্যবান শিকড় বাকড়। সবচেয়ে লম্বা সাদা শিকড়টা ওই শিশুর জন্য। ওটা আলাদা কাগজে মুড়ে দিয়েছি। মনে রাখিস্। আর মনে কোন শংকা বা খেদ রাখিস্ না। আমি সূক্ষ্মভাবে সবসময় তোর কাছাকাছি আছি এবং থাকব। আর যদি তেমন প্রয়োজন বোধে আমাকে স্মরণ করিস্ তখন তোর চোখের সামনেই আমাকে দেখতে পাবি। আর দেরী নয় দেবেন্দ্র! ভোর হয়ে

আসছে। জিনিষপত্র গুছিয়ে চোখেমুখে জল দিয়ে তৈরী হয়ে নে। সকাল ছয়টায় যে গাড়ী হরিদ্বার স্টেশন ধরবে, ওই গাড়ীতেই রওনা হয়ে যা।"

গুছিয়ে নেবার মত কীই বা আছে। গোটা দুই গেরুয়া বস্ত্র,দুইটি উত্তরীয়, একটি কম্বল ও একটি কমণ্ডলু। এগুলো এবং গুরুর দেওয়া ছোট ঝোলাটা দেবেন্দ্র একটা অপেক্ষাকৃত বড় ঝোলায় পুরে নিয়ে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। একটি পরিচ্ছন্ন নারকেল মালায় জল এবং শালপাতায় দুটো বাতাসা দিয়ে গুরু বললেন,"জলটুকু খেয়ে নে। শূন্যমুখে গুরুগৃহ থেকে যেতে নেই।" দেবেন্দ্রের চোখে আবার জল এসে গেল। মা যেমন ছেলেকে শূন্য মুখে ঘর থেকে বার হতে দেন না,গুরুও যেন ঠিক তাই। বিনাবাক্যব্যয়ে দেবেন্দ্র বাতাসাদুটো মুখে দিয়ে জল টুকু খেয়ে নিল এবং ভূলুণ্ঠিত হয়ে গুরুকে প্রণাম করল। গুরু তার মাথায় হাত রেখে ইষ্টমন্ত্র জপ করলেন এবং পাথেয় স্বরূপ তার হাতে কিছু অর্থ তুলে দিলেন। ধীর পদক্ষেপে দেবেন্দ্র রওনা হল। তাকে এগিয়ে দেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা পথ গুরুও আসলেন। দেবেন্দ্র আবার গুরুকে প্রণাম করল। গুরু তারমস্তক স্পর্শ করে অভয়হস্ত উত্তোলন করলেন। চলতে চলতে দেবেন্দ্র যতবার পিছন ফিরে তাকাল, ততবারই দেখতে পেল অভয়হস্ত উত্তোলন করে গুরু চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান।

এক দুপুরে গঙ্গা, গুণ, ক্ষীরোদা এবং আরও দু'একজন বিধবা আত্মীয়া খেতে বসেছেন। পরিবেশন করছেন নবদুর্গা হঠাৎ বাইরের দিকে চোখ পড়তেই নব দেখলেন, কাঁধে ঝোলা, হাতে কমণ্ডলু এক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী আকাশের দিকে তাকিয়ে বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নবদুর্গা গঙ্গাকে উদ্দেশ করে বললেন, " দিদি এক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। খুব উঁচুদরের সাধু বলে মনে হচ্ছেগো দিদি।" সাধুসন্তের প্রতি গঙ্গামণির প্রগাঢ় ভক্তি। সাধুসন্ন্যাসী দেখলেই গঙ্গা তাদের সেবাপূজায় মেতে উঠেনঅর্থব্যয়ও করেন বিস্তর। মাঝে মধ্যে ভণ্ড সাধু দ্বারা প্রতারিতও হন। তবু তার সাধুভক্তির হেরফের হয় না। তার এই স্বভাবের জন্য অনেক সময় মহেশ শচীন্দ্র রাগারাগি করে। কিন্তু গঙ্গার কোন পরিবর্তন হয় না। কারণ গঙ্গার বিশ্বাস;সাধুসন্তরা অর্ন্তযামী। তাদের ঠিকমত ধরতে পারলে নিশ্চয় দেবুর একটা সন্ধান পাওয়া যাবে। আশা যে দুরাশামাত্র তা তাকে বুঝানো যায় না। তার ধারণা দেবু একদিন না একদিন ফিরে আসবেই। তাই সাধুসন্ত দেখলেই গঙ্গা দেবুর সন্ধানের জন্য

গণনা করতে ধরে বসেন। নবর মুখে সন্ন্যাসীর কথা শুনে গঙ্গা মহাব্যস্ত হয়ে বললেন,''তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসন পেতে দিয়ে সাধুকে বসতে বল নব। দেখিস যেন চলে না যান । আমি এঁটো হাতটা ধুয়ে এখনই আসছি।'' নবদুর্গা আসন পেতে দিয়ে সন্ন্যাসীকে বসতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী বসলেন না, কোন কথাও বললেন না, চুপচাপ আগের মতই ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে আরও দু'একজনের চোখ পড়েছে সন্ন্যাসীর দিকে, তারা এসে জড়ো হয়েছে সাধুর কাছে। সাধু উঁচুস্তরেরই বটে। দীপ্ত চক্ষু, গৌরকান্তি নবীন সন্ন্যাসী, মাথার সামনের দিকে ঘনকৃষ্ণচুল চূড়া করে বাঁধা। দৃষ্টি সুদূরে। সন্ন্যাসীকে দেখলেই মনে শ্রদ্ধাজাগে,চরণে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে।

পাতের ভাত ফেলে এস্তে ব্যস্তে এঁটো হাত ধুয়ে গঙ্গা-গুণ দুইবোনও সন্ন্যাসীর কাছে এগিয়ে এলেন। নবতো আগেই সাধুর সামনে উপস্থিতা উঁচুদরের সাধুতো! একটু এদিক ওদিক হলেই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন।

সন্ন্যাসীর আগমনবার্তাটা ততক্ষণে বাড়ীময় ছড়িয়ে পড়েছে। ভীড় ক্রমেই বেড়ে চলছে। সেদিনটায় মহেশ শচীন্দ্রও বাড়ীতে ছিল। খবর পেয়ে তারাও উঁচুস্তরের সন্ন্যাসী দেখতে চলে এল। সন্ন্যাসী যে খুবই উঁচুস্তরের এবিষয়ে কারো মনে কোন সন্দেহ রইল না। সন্ন্যাসীর সর্ব অবয়বে কেমন একটা দিব্যভাব। এধরনের সন্ন্যাসীরা সচরাচর কোন গৃহস্থের অঙ্গনে পদার্পন করেন না। বোধহয় পরিবারের কোন শুভ সময় সমাগত। তাই বাড়ীতে এহেন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব। এরূপ ভাবল শচীন্দ্র। কারণ সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি তার মনেও একটা দুর্বলতা আছে। মহেশ এত কিছু ভাবল না তবে তার চোখেও একটা ভক্তির ভাব ফুটে উঠল।

এমন পরিস্থিতিতেই গঙ্গামণি হঠাৎ হৈ হৈ করে চীৎকার করে উঠলেন। ''সাধু নয়, সাধু নয়- এযে আমার দেবুরে।''পাগলের মত চীৎকার করতে করতে তিনি ভীড় ঠেলে দুই হাত বাড়িয়ে সন্ন্যাসীকে জড়িয়ে ধরতে এগিয়ে গেলেন। শচীন্দ্র চট করে গঙ্গাকে ধরে ফেলল। তিরস্কারের সুরে বলল,''করছ কি মা? পাগল হয়ে গেলে নাকি? না জেনে না বুঝে মহাপুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করতে যাচ্ছ? পাপভাগী হবে যে সে জ্ঞান আছে? মেজদাদা জীবিত নেই। থাকলে কবেই ফিরে আসত। ভাগ্যে যা ঘটার ঘটে গেছে। অনর্থক পাগলামী করে লাভ আছে কিছু?'' গঙ্গাশচীন্দ্রের হাত ছাড়াতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন.আর হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, জানা বুঝার কোন দরকার নেই আমার। কোন

ভুল আমি করিনি। আমি ঠিক চিনে ফেলেছি। মা হয়ে নিজের গর্ভের সন্তানকে চিনব না আমি? সন্তানের মর্ম তোরা কি বুঝিস্। বিদেশে ছেলে মরলে মা জানে আগে। তুই বললেই হল আমার দেবু বেঁচে নেই। ছেড়ে দে আমাকে। আমি নিশ্চিন্ত জানি সন্ন্যাসীর বেশে এ আমার দেবু, অন্য কেউ নয়।" গঙ্গার কথায় ভীড়ের মধ্যেও একটা ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। সবাই একেবারে কাছে গিয়ে সাধুকে দেখার জন্য ব্যস্ত। এমন সময় সবাইকে চমকে দিয়ে সন্ন্যাসী কথা বললেন, "তোমার কোন ভুল হয়নি মা! আমি দেবেন্দ্র!" ভীড়ের মধ্যে যেন একটা বাজ পড়ল। সবাই স্তম্ভিত, বিস্ময়ে হতবাক। শুধু গঙ্গার হাউমাউ কান্না বেড়ে গেল এবং এই কান্নায় এবার যোগ দিল গুণমণি ও নবদুর্গা। আর সবাই নির্বাক নিস্তব্ধ। শচীন্দ্রের হাত আপনিই শিথিল হয়ে গেল। ছাড়া পেয়ে গঙ্গা দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল সন্ন্যাসীকে। গুণ-নবও চুপ করে রইল না। তিনবোন মিলে কাঁদতে কাঁদতে সন্ন্যাসীর গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগল। এতদিন পরে হারানিধি ফিরে এসেছে। তাই আনন্দের কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে তিনবোন। সে এক নাটকীয় দৃশ্য। একটু সম্বিৎ ফিরলে মহেশ শচীন্দ্রও লক্ষ্য করল যে তাদেরও নিজের নিজের চোখের জলে বসন ভিজে গেছে।

গ্রামে বার্তা রটে গেল যে মহেশ উকীলের ছোট ভাই দেবেন্দ্র এতদিন পরে সন্ন্যাসীর বেশে ফিরে এসেছে। গ্রামের লোকেরা দেবেন্দ্রকে মৃত বলেই ধরে নিয়েছিল। তাই হঠাৎ এমন চমকপ্রদ খবর শুনে সন্ন্যাসী দেবেন্দ্রকে চাক্ষুস দেখার জন্য সমস্ত গ্রামবাসী গঙ্গার বাড়ীতে ভেঙ্গে পড়ল। গেরুয়াধারী দেবেন্দ্রের সৌম্যমূর্তি দিব্যকান্তি দেখে সবার মন শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আপ্লুত হল। ছোটবড় নির্বিশেষে সবাই দূর থেকে দেবেন্দ্রের উদ্দেশ্য প্রণাম জানাতে লাগল। নানাজনে নানা কথা বলতে লাগল। সবার মুখে মুখে শুধু একটাই কথা। রায়বাড়ীর দেবেন্দ্র সিদ্ধিলাভ করে ফিরে এসেছে। গঙ্গামণি রত্নগর্ভা। কতপুণ্য থাকলে এমন সিদ্ধপুরুষের মা হওয়া যায়।

ভীড় ও গুঞ্জনের যেমন কমতি নেই। তেমনি গঙ্গারা তিনবোনের কান্নারও বিরাম নেই। হাজার বছরের কান্না যেন তাদের মনে বরফ হয়ে জমেছিল। দেবেন্দ্রকে কাছ পেয়ে আজ যেন সেই বরফ গলে গলে ঝরে পড়ছে। মা মাসীদের শান্ত করার জন্য দেবেন্দ্র বলল, "তোমরা এত কান্নাকাটি করছ কেন মা! আমিত্ত ফিরেই এসেছি।" গঙ্গার কান্না দ্বিগুণ হল। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "ফিরেত এসেছিস

বাবা! কিন্তু আবার যদি আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাস্ এই ভয়েই যে আমি কেঁদে মরছি।"দেবেন্দ্র অল্প হেসে খুব শান্ত গলায় বলল,"চলে যাব বলে আম ফিরে আসিনি মা! থাকব বলেই এসেছি। আমি ভোগ খণ্ডন করতে এসেছি।" দেবেন্দ্রের শেষের কথাটা তিনবোনের মধ্যে কেউই অনুধাবন করতে পারেন নি। শুধু দেবেন্দ্র আর চলে যাবে না শুনেই তারা খুশী হয়ে অবুঝ বালিকার মত তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে স্বাভাবিক হয়ে গেলেন।

মানুষের শ্রান্তি ক্লান্তি ক্ষুধাতৃষ্ণার প্রতি নবদুর্গার বরাবরই তীক্ষ্ণ নজর। তাই তিনি মনে মনে ভাবলেন, কত কষ্ট করে কত দূরদেশ থেকে দেবু এসেছে। আসার পর থেকেই চলছে অবিরাম হুল্লোড়। নিশ্চয়ই দেবু ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়েছে। তাকে কিছু খেতে দেওয়া দরকার। কিন্তু সন্ন্যাসী মানুষ দেবু কি খাবে না খাবে বুঝতে না পেরে খুব ভেবে চিন্তে তিনি একটা পাথরের রেকাবীতে কিছু ছানা মিছরী ও পাথরের গ্লাসে একগ্লাস সরবত তুলসীপাতা দিয়ে দেবেন্দ্রের সামনে নিয়ে আসলেন। আর আনলেন হাতমুখ ধোয়ার জন্য কাঁসার ঘটিতে করে একঘটি জল। তারপর খুবই সংকুচিত সুরে বললেন, "দেবু! অনেকদূর থেকে বোধহয় এসেছিস্।তাই নিশ্চয়ই তুই খুবই পরিশ্রান্ত আর এতক্ষণ ধরে চলছে এক মহাহুল্লোড় এবার ঘটির জল দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এই ছানা আর সরবতটুকু খেয়ে নে। আমি খুব শুদ্ধভাবেই খাবারটুকু নিয়ে এসেছি। আজন্মব্রহ্মচারিণী স্নেহময়ী ছোটমাসীর সংকুচিত সুর দেবেন্দ্রের হৃদয় স্পর্শ করল আর গুরুর কথাও মনে পড়ে গেল। ঠিক এমনি করেই তিনি দেবেন্দ্রের সামনে খাবার তুলে ধরতেন। দেবেন্দ্রের চোখে প্রায় জল এসে গেল। খুবই স্নিগ্ধগলায় সে বলল,"তোমার হাতের দেওয়া খাবার কি কখনও অশুদ্ধ হতে পারে ছোটমাসী? তোমার হাতে খেয়েই যে মানুষ হয়েছি, সে কি ভুলে গেলে?" সন্ন্যাসী দেবেন্দ্র যে ছোটবেলার কথা মনে রেখেছে তা জেনে নবদুর্গা খুবই খুশী হলেন এবং ঘরে গিয়ে একটা তালপাতার পাখা নিয়ে এসে বাতাস করতে করতে দেবেন্দ্রকে খাওয়ার জন্য তাড়া দিলেন। এবার কণ্ঠে সে সংকোচ নেই। দেবেন্দ্রও দ্বিরক্তি না করে ছোটমাসীর কথামত ছানা মিছরী ও সরবতটুকু খেয়ে নিল। দেবেন্দ্রকে এতক্ষণ ধরে খাবার কথা না বলায় গঙ্গা ও গুণ একটু লজ্জিত হলেন এবং গুণমণি বলেই ফেললেন, দেবুকে কিছু খেতে দেওয়া যে দরকার আমাদের তো মনে হয়নি। নবর কিন্তু বেশ বুদ্ধি আছে। তাই সে ওর জলখাবার ব্যবস্থা করেছে। শুধু খাবার দেওয়া নয়

দেবেন্দ্রের বিশ্রামের দিকেও লক্ষ্য আছে নবদুর্গার। তাই তিনি বললেন," সেজদিদি দক্ষিনের ঘরে মেঝেতে দেবুকে বিছানা করে দাও। ধোয়া চাদর বালিশ আছে তাকের উপরে। একটু শুয়ে বিশ্রাম করুক। একেতো পথের কষ্ট, তার উপর এতক্ষণ যা ধকল গিয়েছে।" গুনমণি নবর কথামত বিছানা করে দিয়ে দেবেন্দ্রের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন। তবে মা মাসীরা দেবেন্দ্রের কাছছাড়া হলেন না।

দেবেন্দ্রকে দেখে প্রথমে আবেগে উল্লসিত হলেও মহেশের মনটা বেশ দমে গেল। যে অবাঞ্ছিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেবেন্দ্র গৃহত্যাগ করেছিল, সেই ঘটনার স্মৃতি এতদিন মনে চাপা পড়েছিল। দেবেন্দ্রের আগমনে আবার সেই পূর্ব স্মৃতি তার মনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। একটা সংকোচ। একটা জ্বালা তার মনের ভারসাম্য নষ্ট করে দিল। সৌম,শান্ত,আত্মস্থ দেবেন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে বড়ই হেয় মনে হতে লাগল। তার কেবলই মনে হতে লাগল, এই দীর্ঘদিন পরে দেবেন্দ্র ফিরে না এলেই ভাল হত। দেবেন্দ্র আসায় সেই পূর্বস্মৃতি পরিবারের সবার মনেই নূতন করে জেগে উঠবে, এবং সবাই মনের মধ্যে তার প্রতি এক নীরব অবজ্ঞা বয়ে বেড়াবে। তাছাড়া দেবেন্দ্র ফিরে আসার প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে যাওয়ার পরেই মহেশের স্মৃতির পটে ভেসে উঠেছে শৈল নামক সেই রূপসী নারী যে তার হৃদয়টাকে একেবারে ফালাফালা করে দিয়েছে। এতদিন এসব ভুলে সে একরকম ভালই ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্র ফিরে আসায় সেই পুরানো ক্ষত তার মনে নূতন হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই এতদিন পরে দেবেন্দ্রের ফিরে আসাটা তার পক্ষে মোটেই ভাল হয়নি বলে তার মনে হতে লাগল। একটা বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা ও হীনম্মন্যতার ভাব তার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল।

শচীন্দ্রের প্রতিক্রিয়া আবার সম্পূর্ণ অন্যরূপ। দীর্ঘদিন পরে মেজদাদাকে ফিরে পাওয়ায় সে দারুণ খুশী। কত দুঃখে, কত অপমানে যে মেজদাদা ঘর ছেড়েছিল তাতো আর সে ভুলে যায়নি। তবে একদিকে দুঃখ অপমান পেলেও মেজদাদা অন্যদিকে বড়ই ভাগ্যবান। অনিত্যবস্তুকে ছেড়ে মেজদাদা যে নিত্যবস্তুর সন্ধান পেয়েছে তা তার চেহারায়ই ফুটে উঠেছে। মেজদাদার সর্ব অঙ্গে যেন এক দিব্যআভা। আধ্যাতিক জগতে উন্নতির চরম শিখরে উঠতে পারলেই মানুষ এমন দিব্যদেহী হয়। মেজদাদার জীবন ধন্য। আর মেজদাদার জন্য তাদের পরিবারও ধন্য।

দেবেন্দ্রের গেরুয়া গাত্রবাস গঙ্গার মোটেই পছন্দ হচ্ছেনা। তাই সাহস

করে তিনি বলে ফেললেন,"বাবা. সংসারে যখন ফিরেই এসেছিস তবে আর গেরুয়া কেন? মায়ের চোখে কি এ বেশ ভাল লাগে?" দেবেন্দ্র বলল," তোমার ইচ্ছেমত সবই হবে মা! তবে সব কিছুরই একটা নিয়ম আছে। ঘরে ফেরার সাতদিন পরে ইষ্টপূজা করে গেরুয়া বিসর্জন দিতে হবে। গুরুর এরকম নির্দেশই আছে।" গঙ্গা কিছুটা আশ্বস্ত হলেও তার চিন্তা গেল না। যে ছেলে দীর্ঘ সাতবছর ধরে সন্ন্যাসী, সহজে কি সংসারে তার মন ফিরবে? তাকে সংসারমুখী করার ক্ষমতা আছে একমাত্র বধূমাতার। কিন্তু শৈল যা অভিমানী ও জেদী মেয়ে, সে কি করবে না করবে তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। দুঃখ কষ্টতো আর কম পায়নি শৈল। তার অভিমান হতেই পারে। দেখা যাক কি হয়। সবই ভগবানের ইচ্ছা।

দেবেন্দ্র ফিরে আসার খবর গেল শৈলর বাপের বাড়ীতে। শৈলকে নিতে এসেছে স্বয়ং শচীন্দ্র। জামাইবাবু ফিরে এসেছে জেনে শৈলর ভাইয়েরা আনন্দে আত্মহারা। ধীর স্থির শৈলর প্রতিক্রিয়া বুঝা গেল না। তবে কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করে শৈল দেবরের সঙ্গে রওনা হল স্বামীসন্দর্শনে। শৈলর বড় ভাই মঙ্গলও দিদির সঙ্গে রওনা দিল। দিদির দুঃখে মঙ্গল বড়ই মর্মাহত ছিল। এতদিন পরে ভগবান তার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। তবু সন্ন্যাসী ভগ্নীপতির মতিগতি বুঝবার জন্য সেও দিদির সঙ্গে চলে এল দিদির শ্বশুরবাড়ীতে।

সাত বছর পরে শৈল শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে এল। এখানে ফিরে আসার আশা বিলীন হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরের অঙ্গুলিহেলনে আশ্চর্যভাবেই হঠাৎ করে সে এল শ্বশুর বাড়ীতে। যেখানে বসবাসের তার চিরন্তন অধিকার ।

শৈল এসেই গলায় আঁচল দিয়ে ভক্তিভরে শাশুড়ীদের প্রণাম করল। তার শীর্ণ চেহারা ক্লিষ্টমুখ দেখে বেদনায় অনুতাপে ভরে গেল গঙ্গার হৃদয়। শৈলকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু শৈলর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এই দীর্ঘ সাত বছর ধরে দুঃখকষ্টের বোঝা বইতে বইতে সে যেন পাথর হয়ে গেছে। তার চোখে জল নেই, মনে অভিমান নেই, কারো প্রতি কোন অভিযোগও নেই। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার বিশীর্ণ শৈলর রূপ এতটুকু ম্লান হয়নি। তার সর্ব অবয়বে একটা অদ্ভুত শান্তশ্রী, সে যেন তপক্লিষ্টা শৈলসূতা উমা। দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে শৈল খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গঙ্গা শৈলকে নিয়ে দেবেন্দ্রের ঘরের দরজায় গিয়ে তাকে ডেকে বললেন," দেবু! মেজ বউমা এসেছে।" এটুকু বলেই গঙ্গা চলে

গেলেন। শৈল ভিতরে প্রবেশ করল। দেবেন্দ্র এক পলক শৈলর দিকে তাকিয়েই চোখ নত করল এবং দৃষ্টি নিজের প্রসারিত করতলে নিবদ্ধ করল। শৈলর শীর্ণ চেহারা বিশুষ্ক বদন দেখে তার হৃদয়ে বেদনা ও অনুশোচনার দহন শুরু হল। শৈলরত কোন অপরাধ ছিল না। তবু তাকে যে এত কষ্ট পেতে হল তার জন্য সেইত দায়ী। দেবেন্দ্রের স্বচ্ছ সন্ন্যাসী হৃদয়ে এই প্রথম সংসার ভাবনার ছায়াপাত ঘটল। শৈলও নতমুখে ঠায় দাঁড়িয়ে। তবে সে কিছুই ভাবছিল না। এতদিন পরে সে যে চোখের সামনে স্বামীকে দেখতে পেয়েছে তাতেই কৃতার্থ সে। তার মনে বিন্দুতম অনুযোগ অভিযোগ নেই, নেই কোন ভাবনা।

স্বামী সন্দর্শনের প্রথম আবেগটা কেটে যাওয়ার পর শৈল গলায় আঁচল জড়িয়ে দূর থেকে স্বামীকে প্রণাম করল। সন্ন্যাসী স্বামীর চরণ স্পর্শ করল না। এতক্ষণে দেবেন্দ্রও খানিকটা ধাতস্থ হল এবং সেই প্রথম কথা শুরু করল। বলল, "তুমি কেমন আছ সে প্রশ্ন আমি করছিনে শৈল। তোমাকেত আমি ভাল রাখিনি যে তুমি ভাল থাকবে। তোমার প্রতি বড় অবিচার করে ফেলেছি তাই না শৈল। কিন্তু বিশ্বাস কর মনের দিক দিয়ে সে সময় আমি বড্ড নিরুপায় হয়ে পড়েছিলাম। তাই ঈশ্বরের হাতে তোমাকে সমর্পণ করে পথের জীবন বরণ করে নিয়েছিলাম। তোমার কাছে যে আমি অপরাধী হয়ে আছি সে আমি বুঝি শৈল।"

শৈল এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। স্বামীর কথা শুনে সে ধুপ করে মেঝেতে বসে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। সাত বছর পরে তার শুষ্ক চোখে প্রথম জলের ধারা বইল। কাঁদতে কাঁদতেই সে বলল, "একি কথা বলছ তুমি! আমার কাছে তুমি অপরাধী হবে কেন? মনের কোন অবস্থায় যে তুমি ঘর ছেড়ে, আমাকে ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলে তা আমার চেয়ে কে বেশী বুঝবে বল। যদি স্বামীর মনটাই বুঝতে না পারি তবে ধিক্ আমাকে। বিশ্বাস কর, তোমার প্রতি মুহূর্তের জন্যও এতটুকু অনুযোগ অভিযোগ আমার মনে জাগেনি। আমি একটু রোগা হয়ে গেছি বলেই হয়ত তোমার আরও খারাপ লাগছে। তবে সেটা অন্য কিছু নয়। তোমার মঙ্গলের জন্য আমি অনেক পূজো করেছি, অনেক উপোস দিয়েছি। তাই হয়ত আমাকে একটু রোগা বলে মনে হচ্ছে।" শৈলর কান্না থেমে গেল। সে আগের মেজাজে ফিরে এসেছে। তার শীর্ণমুখ খুশীর আলোয় ঝলমল। সাত বছরের সঞ্চিত কথা সে যেন স্বামীর কাছ উজাড় করে বলে দিতে চাইছে। তাই শৈল হড়বড় করে বলে যেতে লাগল, "তাছাড়া তুমি যে আমাকে ছেড়ে চলে গেছ তাতো আমার

মনেই হয়নি। লোকে অবশ্য বলেছে যে আমি কপাল পোড়া। তাই স্বামী আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমি কিন্তু রোজ রাতে তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নের মধ্যে কত যে বন পর্বত নদী সমুদ্র দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। রোজ রাতেই স্বপ্ন দেখতাম কিনা। স্বপ্নে দেখেছি পার্বত্যপথে বনের পথে নদীর তীরে সমুদ্রের ধারে ধারে গেরুয়াবসন পরে হাতে কমন্ডলু নিয়ে তুমি হেঁটে চলেছ; তোমার সঙ্গে এক অনিন্দ্যকান্তি জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ।" শৈল দেবেন্দ্রের মুখে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আবার বলল, "হ্যাঁগো সতিই কি তুমি অমনি করে পথ চলেছিলে না ওগুলো শুধুই স্বপ্ন?" শৈলর কথা শুনে দেবেন্দ্র বিস্ময়ে বাক্যহারা। সে সাত বছর ধ্যানতপস্যা করে য়ে দিব্যদৃষ্টি লাভ করতে পারেনি, ঘরে বসে শুধু স্বামীচিন্তা করে শৈল সে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে ফেলেছে। গুরু অবশ্য একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, পতিপ্রাণা স্ত্রী এমনিতেই সিদ্ধিলাভ করে থাকেন। তাদের কোন সাধনার প্রয়োজন হয় না। দেবেন্দ্র বুঝতে পারল যে শৈল সেই পতিপ্রাণা স্ত্রী যে কোন সাধনা ছাড়াই শুধু পতিপ্রেমের জোরে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে ফেলেছে। দেবেন্দ্রকে চুপ করে থাকতে দেখে শৈল আবার বলল, 'চুপ করে রইলে কেন? বল না আমার স্বপ্নগুলো সত্যি কিনা?" দেবেন্দ্র বলল, " স্বপ্নগুলো তোমার সত্যিই, ওভাবেই আমি পথ চলেছিলাম।"শৈল আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠল, বলল,"যিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলছিলেন সেই মহাপুরুষটি কেগো?" দেবেন্দ্র বলল," ইনিই আমার গুরু।" শৈল বলল," তাহলে আমাদের ছাড়াছাড়িটা হল কোথায় যে আমি তোমার উপর রাগ করে থাকব। স্বপ্নেত রোজ আমাদের দেখা হয়েছে। তবে কথাটথা হয়নি এই যা।" বলেই শৈল হঠাৎ সময় সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে বলল," অনেকক্ষণ হল এসেছি। মা মাসীরা না জানি কি ভাবছেন। এখন যাই।" বলে শৈল আবার স্বামীকে চরণস্পর্শ করে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।

ঘরে ফিরে আসার সাতদিন পরে বিধিমত ইষ্টপূজা করে বাড়ীর সামনের পুকুরে গেরুয়া বিসর্জন দিয়ে দেবেন্দ্র গৃহীর বেশ ধারণ করল। সেই উপলক্ষে গঙ্গা জনাকয়েক ব্রাহ্মনভোজন করালেন। দেবেন্দ্র যে আর চলে যাবে না এ বিষয়ে সবাই নিশ্চিন্ত হল। তবে সংসারের নিয়মই এই যে কোন সময়েই সর্ব্বব্যাপারে ঠিক নিশ্চিন্ততা আসে না। গঙ্গার মনের কোনে শৈলকে নিয়ে একটা চিন্তা আছে। ঢাকার বাসায় যে কুকীর্তি ঘটেছিল, তার ফলেই কত না কাণ্ড ঘটে গেল। আবারও

সেই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে বলে গঙ্গা মনে মনে খুবই সতর্ক। শৈলকে তিনি বেশ একটু আগলে রাখেন। মাছের হেঁশেলে রান্না এবং পরিবেশন ইত্যাদি কাজে তিনি শৈলকে বড় একটা যেতে দেন না। শৈলর উপরে নিরামিষ হেঁশেলের ভার। ফলে শৈলকে তারা তিনবোনের দৃষ্টির মধ্যেই থাকতে হয়। দেবেন্দ্রও নিরামিষাশী। আমিষ হেঁশেলে রান্নার চাপ বেশী। ঢিলেঢালাগোছের সরযূ সামাল দিতে পারে না। তাই মায়ের নির্দেশে স্নানের আগে আমিষ হেঁশেলে সকাল ও দুপুরের রান্না করে ক্ষীরোদা এবং যতটুকু পারে পরিবেশনও করে। আর বাকীটুকু সরযূকেই করতে হয়। শৈল সধবা মানুষ। তাই তার খাওয়ার ব্যবস্থা আমিষ হেঁশেলে। শৈল নিরামিষ ঘরের পাট চুকিয়ে বড়জায়ের সঙ্গে খেতে বসে। সেই সময়টুকুও গঙ্গা শৈলকে চোখের আড়াল করেন না। অকারণে মাছের ঘরের কাছে ঘুরঘুর করতে থাকেন। গঙ্গার এই চালাকী মহেশের নজর এড়ায় না। মায়ের প্রতি মনে মনে তার ক্রোধের সঞ্চার হলেও বাইরে তা প্রকাশের সুযোগ থাকে না। ফলে তার মেজাজ সব সময় চড়ে থাকে। এমনি করেই দিন চলে।

বহুদিন পরে গঙ্গামণির সংসার প্রকৃত সুখের মুখ দেখল। সংসারের আর্থিক পারিপার্শ্বিক উন্নতি অনেক আগেই হয়েছিল। কিন্তু দেবেন্দ্র বিহনে গঙ্গারা তিনবোনের মনে এতচুকু সুখ বা শান্তি ছিল না। এখন দেবেন্দ্র ফিরে আসায় তাদের মনে আর কোন দুঃখ নেই। তাছাড়া আবও সুখের বিষয় দেবেন্দ্র ফিরে আসার এক বছরের মধ্যেই দেবুর একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিয়েছে। শিশুটি দেখতে এমন সুন্দর হয়েছে যে মনে হয় ঠিক যেন এক দেবশিশু। আসলে দীর্ঘ সাত বছব ধরে দেবেন্দ্র বহু তীর্থ ঘুরে যে পুণ্য সঞ্চয় করে এসেছে তার একটা ফলতো আছেই। এজন্যই তার ঘরে এমন দেবশিশুর আবির্ভাব হয়েছে। দেবেন্দ্র বহুতীর্থ ঘুরে এসেছে বলে গঙ্গা নাতির নাম রাখলেন তীর্থকুমার। তীর্থকে দেখে মহেশও বড়ই খুশী। ব্যর্থকাম মহেশের মনে শৈলর প্রতি হিংসা বিদ্বেষ থাকলেও ভ্রাতৃষ্পুত্রের প্রতি তার স্নেহের অভাব নেই। আর গঙ্গামণিরা তিনবোনের মনেতো তীর্থকুমারকে নিয়ে আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু এ আনন্দ বেশীদিন রইল না। ঊনত্রিশ দিন বয়সে হঠাৎ বিকাল থেকে সুস্থ শিশুর গায়ের রং কেমন নীল হয়ে গেল এবং ধীরে ধীরে সে নিস্তেজ হতে থাকল। ডাক্তার বৈদ্য ডাকা হল, ওষুধ বিষুধও দেওয়া হল। কিন্তু কোন ফল হল না। সন্ধ্যার একটু পরেই শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

বাড়ীতে কান্নার রোল উঠল। শৈল অজ্ঞান হয়ে গেল। দেবেন্দ্র গুরুর কথা ভুলে গেল। মনকে সাধকজনোচিত স্তরে ধরে রাখতে পারল না। সাধারণ পিতার মতই পুত্রশোকে শয্যায় আছড়ে পড়ল, আর্তনাদ করতে করতে হতচেতন হল। এই অবস্থায়ই চোখের সামনে আবির্ভূত হলেন গুরু। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন," 'সবকিছু জেনেও যখন এতটাই ভেঙ্গে পড়েছিস তবে শিকড়টা বেটে খাইয়ে দিলেইতো হয়" "গুরু অন্তর্হিত হলেন। শিকড়ের কথা ও অন্য সব কথা মনে পড়ল দেবেন্দ্রের। পরের চিন্তা না করে সে ঝোলা থেকে দ্রুত শিকড় বের করে ছোটমাসীকে শিকড়টা বেটে মধু মিশিয়ে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে বলল। নবদুর্গাও তাড়াতাড়ি সেটা বেটে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে এলেন। দেবেন্দ্র তুলা ভিজিয়ে সেই শিকড়বাটাসহ মধু ফোঁটা ফোঁটা করে শিশুর মুখে দিতে লাগল। মৃত শিশুর কশ বেয়ে সেই মধুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। দেবেন্দ্রের পাগলামী দেখে সবাই হতবাক। কান্নাকাটি থেমে গেছে। শুধু মহেশ বলল," আর ওসব পাগলামী করে কি হবেরে দেবু। যা হবার তাতো অনেকক্ষণ আগেই হয়ে গেছে।" কিন্তু দেবেন্দ্র থামল না। সে ওই ওষুধ শিশুর মুখে দিতেই থাকল। কিন্তু কি আশ্চর্য আস্তে আস্তে ওষুধ যেন শিশুর মুখের ভিতরে যেতে লাগল। কশ বেয়ে আর গড়িয়ে পড়ল না। ক্রমে শিশুর নিস্পন্দ শরীরে স্পন্দন টের পাওয়া গেল। ঠোঁট যেন একটু নড়ে উঠল.মৃদু হলেও শ্বাসের লক্ষণও দেখা গেল। দেবেন্দ্র ওষুধ দেওয়া বন্ধ করল না। শিশু এবার যেন একটু হাঁ করল।" প্রাণ আছে, প্রাণ আছে-বলে সবাই চেঁচিয়ে উঠল। মহেশ সবাইকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল এবং মেয়েরা চেঁচামেচি করবে বলে তাদের সরিয়ে দিয়ে নিজেই শিশুর পরিচর্যা শুরু করে দিল। মহেশ সর্বকাজেই বিশেষ নিপুণ। সে নরম ন্যাকড়া অল্প গরম করে শিশুকে সযত্নে কোলে নিয়ে সেঁক দিতে লাগল। শিশুর হিমশীতল শরীরে তাপ উঠল। তারপর দেবেন্দ্রকে বলল তুলা ভিজিয়ে শিশুর মুখে জল দিতে। এভাবে দুই ভাই মিলেই শিশুর পরিচর্যা করতে লাগল। মেয়েদের কাছে ঘেষঁতে দিল না। একটু পরেই শিশু ক্ষীণস্বরে কেঁদে উঠল। দেবেন্দ্র বলে উঠল "যাক্ এবারের মত ফাঁড়া কেটে গেল।" মহেশ শিশুকে তখন মা গঙ্গামণির কোলে তুলে দিল।

এই অত্যাশ্চর্য ঘটনায় সবার মনেই বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। দেবেন্দ্র যে অলৌকিক শক্তি অর্জন করে এসেছে এ বিশ্বাস সকলের মনেই দৃঢ় হল। মহেশত আনন্দে দেবেন্দ্রকে জড়িয়ে ধরল এবং বলল." দেবু তুই যে মৃতকে প্রাণ দেওয়ার

শক্তি পর্যন্ত অর্জন করে এসেছিস তা কিন্তু ভাবতেই পারিনি। তোকে ভাই বলে ভাবব না দেবতা বলে ভাবব বুঝতে পারছিনে। " উত্তরে দেবেন্দ্র বলল,"ওসব কিছু নয় দাদা। সবই গুরুর কৃপা। গুরুর কৃপা বলে অসম্ভবও সম্ভব হয়" একথা বলে দেবেন্দ্র যুক্ত করে গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল। অভিভূত মহেশও যুক্ত করে দেবেন্দ্রের গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল।

অজ্ঞান শৈলর জ্ঞান এখনও ফিরে আসেনি। ছেলে যে বেঁচে উঠেছে তা সে জানতেই পারেনি। তাই এখন সবাই শৈলকে নিয়ে পড়ল। অনেক চেষ্টায় তার জ্ঞান ফিরে আসামাত্র যেই সে ছেলের জন্য কান্না শুরু করতে যাবে, অমনি গঙ্গা তার কোলে ছেলেকে ফেলে দিলেন। ছেলে একেবারে সুস্থ। একটু একটু হাতপা নাড়ছে এবং মিটমিট করে তাকাচ্ছে। শৈলর মনে হল, সে স্বপ্ন দেখছে না ত। তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে সেও সব ঘটনা শুনল এবং সব শুনে স্বামীকে তার সাক্ষাৎ দেবতা বলে মনে হল। না জানি কোন জন্মের পুণ্যে তার ভাগ্যে অমন স্বামী লাভ হয়েছে।

শৈলর ছেলে তীর্থকুমার দিন দিন শশীকলার মত বেড়ে চলেছে। যেমন তার রূপ তেমনি তার বুদ্ধি। মহেশ বলে,"এ ছেলে বড় হয়ে অসাধারণ বিদ্বান হবে"তীর্থকে যে দেখে সেই চোখ ফিরাতে পারে না। এমন দিব্য কান্তি শিশু সচরাচর চোখে পড়ে না। সে যে কোন একটা বড় কাজ করবার জন্যই পৃথিবীতে এসেছে এটা সবারই মনে হয়, বাড়ন্ত গড়ন বলে তীর্থকে বয়সের তুলনায় বড় দেখায়। লোকের দৃষ্টি লাগবে বলে গঙ্গা নাতিকে একটু আড়ালে আড়ালে রাখেন।

সংসার এখন খুব সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবেই চলছে। গঙ্গা এখন মনের সুখেই আছেন। নাতি নাতনীও হয়ে গেছে বেশ কয়েকটি। মহেশেরতো ঠাকুরের দয়ায় চার ছেলে একমেয়ে। শচীন্দ্রের এক ছেলে আর এক মেয়ে। ওরা আছে কোলকাতার বাসায়। ছুটিতে বাড়ী আসে। শুধু দেবেন্দ্রের সন্তান ছিল না। এখন তার এই পুত্রসন্তানটি হওয়ায় গঙ্গার সংসার এখন ধনেজনে পূর্ণ। বড় বউ সরযূআবার সন্তানবতী। ঠাকুর জানেন ছেলে হবে না মেয়ে হবে। ছেলেরা এখন দু'হাতে উপার্জন করছে। মহেশ শচীন্দ্রতো ওকালতীই করছে। আর দেবেন্দ্র মস্ত বড় ব্যবসা ফেঁদে বসেছে,তার ব্যবসা খুবই ভাল চলছে। হু হু করে টাকা আসছে আর সম্পত্তির আয়ত আছেই। তবু এই সুখের সংসারেও যে তলে তলে একটু আধটু অশান্তি ঈর্ষা বিদ্বেষ নেই তা নয়। সব সংসারেই ওসব একটু আধটু

থাকেই,ওসব কোন ব্যাপার নয়।

শৈলর চেহারায় সে শীর্ণতা আর নেই। তীর্থের জন্মের পর তার রূপ যেন একেবারে উপচে পড়ছে। তিন জায়ের মধ্যে শৈল রূপেগুণে আলাদা। আবার শাশুড়ীদেরও খুবই প্রিয়পাত্রী। শৈলকে শাশুড়ীমা এত আগলে রাখেন যে দেখে জায়েদের রাগ হয়। শাশুড়ীর কাছে শৈল যেন হীরের টুকরো আর তারা দুই জা যেন ছাই পাঁশ। হোক না শৈল তাদের চেয়ে সুন্দরী। কিন্তু ঐ রূপটুকু ছাড়া শৈলর আর আছেটা কি? বাপতো তার একরকম ভিক্ষাজীবী বামুন। আর স্বামীর বিদ্যাবুদ্ধি যোগ্যতা ওতো তেমনি। তাদের স্বামীদের কড়ে আঙ্গুলের যোগ্যও নয়। তবে সাধুসন্ত মানুষ। তা অযোগ্য মানুষের সাধুসন্ত হওয়া ছাড়া মান বাড়াবার উপায়ই বা কী আছে! অবশ্য শৈল নিজে বিদ্যাবতী। সংস্কৃতও জানে। মেয়েমানুষের অমন বিদ্যার মুখে ছাই। কি কারণে যে শৈলকে নিয়ে শাশুড়ীর এত আদেখ্‌লেপনা তা বুঝে উঠা ভার, এসব চিন্তাভাবনা অবশ্য স্নেহলতার। সরযূরতো আসলে তেমন বোধভাষ্য নেই। স্নেহলতা তাকে যেমন বুঝায় তেমনি বুঝে এবং দুই জায়ে মিলে শৈলর বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকায়। শৈল মনে মনে জায়েদের এই ঘোঁটঘাট বুঝে, কিন্তু মোটেই এসবে পাত্তা দেয় না। আড়ালে আবডালে ঘোঁট পাকানোটা তার কাছে বড়ই নীচতা বলে মনে হয়।

দুই জায়ে মিলে শৈলর বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকানোর ব্যাপারে স্নেহলতার মনে অন্য একটি কারণও আছে। কিছুদিন ধরে কোলকাতার বাসা ছেড়ে সে বাড়ীতেই আছে। বড়লোক বাপের মেয়ে বলে তার প্রচণ্ড অহমিকা। তাই ঘরকন্নার কাজ করতে তার অহমিকায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। সে'ত আর রাঁধুনী নয় যে গুষ্টির পিণ্ডি সিদ্ধ করবে। তাই এতদিন সে শ্বশুরবাড়ীতে হেঁশেলের ছায়া কমই মাড়িয়েছে। কিন্তু ইদানীংকালে শাশুড়ী তার অহমিকাকে ধূলিসাৎ করে ঘরসংসারের কাজকর্ম ভাগ করে দিয়েছেন। আমিষ হেঁশেলের দায়িত্ব স্নেহলতার ও সরযূর। আর নিরামিষ দিকটা দেখবে শৈল। নিরামিষদিকে মাত্র কয়েকজনের রান্না, তাই কাজ খুবই কম। আর আমিষ হেঁশেলে চাকরবাকরসহ একগুষ্টি লোকের রান্না পরিবেশন। হীরেরটুকরো মেজবউ দুপুর শেষ হওয়ার আগেই কাজকর্ম সেরে সোনার টুকরো ছেলে নিয়ে হাওয়া খায়। আর সরযূ স্নেহলতা বেলা তিনটের আগে কোনমতেই হেঁশেল থেকে বেরোতে পারে না। একচোখা শাশুড়ীর জন্যই মেজবউ শৈল শরীর বাঁচিয়ে দিব্যি আরামে আছে। রাগে স্নেহলতার সর্বাংগ জ্বলে যায়। কিন্তু প্রতিবাদ

করার কোন উপায় নেই,শাশুড়ীটা এমন রানী ভিক্টোরিয়ার মত মুখ করে কথাবার্তা বলে যে প্রতিবাদের সাহসই হয় না। তাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত রাগটাই পড়ে গিয়ে শৈলর উপর। এই কারণেও সে মেজবউ শৈলর উপর তেতে থাকে এবং বড় বউ সরযূকেও তাতায়। কিন্তু শাশুড়ী কেন যে মেজবউ শৈলকে এতটা আগলে রাখেন তার আসল কারণ দুই বউয়ের কেউই জানে না।

শাশুড়ীর এতটা সতর্কতা সত্ত্বেও শৈল ইদানীং মোটেই স্বস্তিবোধ করছে না। কিছুদিন চলছিল বেশ ভালই। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে ভাশুরঠাকুরের রকমসকম তার ভাল ঠেকছে না। আবার যদি ঢাকার বাসার মত কোন ঘটনা ঘটে যায় তবে শৈল আর এ অপমান সহ্য করতে পারবে না। বিদ্বান বড়মানুষ মহেশ যে কতটা নারীলোলুপ তার প্রমাণতো হয়েই গিয়েছে। দেবেন্দ্র এখন ব্যবসা নিয়ে খুবই ব্যস্ত। বাড়ীতে কমই থাকে। ব্যবসার প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ওড়িষ্যা এবং বাংলার বিভিন্ন স্থানে যাওয়া আসার মধ্যেই থাকে। সরযূও দিনকয়েক হল পঞ্চম সন্তানের জন্ম দিতে আবার বাপের বাড়ী চলে গেছে। স্নেহলতা তার সঙ্গে যতই রেষারেষি করুক তবু সে আছে বলে কিছুটা রক্ষা। তবে সেও কিছুদিনের মধ্যেই চলে যাবে। বাড়ী অনেক ফাঁকা হয়ে যাবে। শাশুড়ীরওতো বয়স হয়েছে। তিনিই বা সবসময় কতটা লক্ষ্য রাখতে পারবেন। শৈলর বড় দুশ্চিন্তা হয়।

মহেশের মনমেজাজ আবার বিগড়ে গেছে। শৈলর রূপ আবার তার মনে নূতন করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। তীর্থের জন্মের পরে কেন জানি ভ্রাতৃষ্পুত্রের দেবোপম মুখ তাকে খানিকটা ভুলিয়ে রেখেছিল। তার নিজেরও তো বেশ কয়টি সন্তান আছে। কিন্তু তাদের প্রতিতো কোনদিন তার হৃদয়ে এতটা বাৎসল্যের সৃষ্টি হয়নি। বিশেষ করে মরে গিয়ে বেঁচে উঠায় তীর্থের প্রতি তার স্নেহ আরও বেড়ে গিয়েছিল এবং এই স্নেহের মোহে সে পূর্বস্মৃতি খানিকটা ভুলে ছিল। কিন্তু এখন আবার সেই পুরানো আগুন তার মনে নূতন করে দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠেছে। সে বীর্যবান পুরুষ, তার পৌরুষ অপরিমেয়। তাই অবলা নারীর মত সে জ্বলে পুড়ে ছাই হবে কেন ? শৈলর রূপমাধুরী আকণ্ঠপান করে সে শীতল হবে। মহেশ জানে শৈল কখনও স্বেচ্ছায় তার কাছে ধরা দেবে না, জোর করে তাকে ছিনিয়ে নিতে হবে। শৈলর সর্বস্ব লুটে তাকে পঙ্কে নিমজ্জিত করে দিয়ে মহেশ তৃপ্ত হবে। ফাঁকা বাড়ীতে এখন সে সুযোগ ও যথেষ্ট। কিন্তু একমাত্র বাধা মহেশের অতি চতুর মা। মা যেভাবে শৈলকে আগলে রাখেন, তাতে তাকে বাগে পাওয়া বড়ই

মুস্কিল। তাই মহেশের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে মায়ের উপর। মায়েরতো উচিত যে কোন মূল্যে ছেলের মন রাখা। কিন্তু তার মায়ের কাছে ছেলের মনের চেয়ে বউয়ের মান অনেক বড়। মহেশ নিজের মত করে ব্যাপারটা অনেক ভেবে দেখেছে যে এতে দেবেন্দ্রের প্রতিও মোটেই অবিচার করা হয় না। কারণ দেবেন্দ্র দীর্ঘদিন সাধুসঙ্গ করে এসেছে। তাই স্ত্রীসঙ্গের প্রয়োজন নিশ্চয়ই তার কাছে গৌণ। সবদিক থেকেই বিচার করলে শৈলর এই অসামান্য রূপ যৌবন দেবেন্দ্রের জন্য নয়। এ রূপ যৌবন পৌরুষদীপ্ত মহেশেরই ভোগ্য হওয়া উচিত তাছাড়া প্রথমদিকে মহেশের মনে শৈলর রূপের প্রতি যেমন মোহ ছিল তেমনি তার গুণের প্রতি ও মনের প্রতিও আকর্ষণ ছিল। একজন যথার্থ পুরুষ একজন নারীর মধ্যে শুধু রূপই খুঁজে ফিরে না, হৃদয়েরও সন্ধান করে। শৈল রূপে রুচিতে বোধে বুদ্ধিতে এমন এক পরিপূর্ণ নারী যাকে লাভ করে একজন পুরুষ সার্থক হয়ে উঠতে পারে। শৈলর তুলনায় সরযূতো একটা নিরেট পদার্থমাত্র। কিন্তু শৈল তার হৃদয়ের মূল্য বুঝল না। নির্মম ঘৃণায় তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বোধবুদ্ধিহীন বিবাগী দেবেন্দ্র তার হৃদয়ের দেবতা। যাক এসব ভাবনা এখন অবান্তর। কিন্তু শৈল প্রত্যাখ্যান করলেও সে কোনক্রমেই প্রত্যাখ্যাত হবে না। মন না পেলেও শৈলর মান সে কেড়ে নেবেই। তার যেন আর তর সইছে না। কিন্তু মা যে সামনে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মহেশের মনে শৈলর প্রতি এমন কি দেবেন্দ্রর প্রতিও একটা প্রতিশোধ স্পৃহার জ্বালা সর্বক্ষণ দাউদাউ করে জ্বলে এবং ক্রোধের আকারে সেই জ্বালা আত্মপ্রকাশ করে। তার মেজাজ সবসময় সপ্তমে চড়ে থাকে, সব কিছুতেই অকারণে দোষ ধরে,ভাতের থালা ছুড়ে ফেলে দেয়, জিনিষপত্র ভাঙচুর করে। তার মেজাজের জন্য বাড়ীর সবাইকে তটস্থ থাকতে হয়। তার বদমেজাজের কারণ কেউ বুঝতে পারে না। শুধু শৈল বুঝতে পারে, আর পারেন গঙ্গামণি,গুণমণি নবদুর্গাও যে একেবারে বুঝেন না এমন নয়। মেজদিদির জন্য তাদের দুঃখ হয়। এমন কুসন্তান থাকার চেয়ে তাদের যে সন্তান নেই তা একরকম মন্দ নয়। মহেশ নিরন্তর এসব অশান্তি সৃষ্টি করে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত করেই ক্ষান্ত থাকেনি। কামান্ধ মহেশের পুঞ্জীভূত ক্রোধ আরও বড় কিছু করার ফন্দী ফিকির খুঁজছে। পুরুষ হয়ে সে একটা স্ত্রীলোককে জব্দ করতে পারবে না তা কি কখনও হয়? মাঝে মাঝে তার মনে হয় গুণ্ডা লেলিয়ে শৈলকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার ইজ্জৎ ছিঁড়ে কুঁড়ে আস্তকুঁড়ে ফেলে দিতে। স্ত্রীলোকের তেজের দাম তার জানা আছে।

আবার মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়, যে দেবেন্দ্রকে নিয়ে শৈলর এত আদিখেত্যা সেই দেবেন্দ্রকে যদি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় তবে শৈলর সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হয়। একটা কিছু তার করতেই হবে। মায়ের উপর ও তার রাগ কম নয়। দেবেন্দ্র বাড়ী ফিরে আসার পর থেকে একচক্ষু কাকের মত মায়ের মন দেবেন্দ্রতেই নিবদ্ধ। কিন্তু কেন? মহেশ কি এ সংসারের জন্য কম কিছু করেছে? সে তুলনায় দেবেন্দ্রতো কিছুই করেনি। তবু কেন দেবেন্দ্রের প্রতি মায়ের এই পক্ষপাতিত্ব? আর শুধু মা কেন? মাসীদের টানটাও দেবেন্দ্রের প্রতিই। সব দিক থেকেই তার মন বড়ই বিষিয়ে আছে। এসব অন্যায় ব্যবহার সে কিছুতেই সহ্য করবে না। এমন একটা কিছু সে করবে যাতে সবারই উচিত শিক্ষা হয়।

মহেশ এমনিতে লোক খারাপ নয়। বহু সদ্‌গুণের সমাবেশ তার চরিত্রে। কিন্তু একশ মন দুধে এক ফোঁটা গোমূত্র পড়ে গেলে যেমন সবটুকু দুধ নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি নারীলোলুপতা তার সব সদগুণাবলী নষ্ট করে দিয়ে পশুপ্রবৃত্তিকেই প্রধান করে তুলেছে।

নারীর রূপের প্রতি মোহ সর্বকালে সর্বদেশে যে ধ্বংসের কারক হয়েছে, পুরাণ ইতিহাসে তার ভুরিভুরি নজীর রয়েছে। যেমন লঙ্কার রাজা রাবণ ত্রিলোক বিজয়ী বীর। অনেক সদগুণে তার চরিত্রঅলংকৃত। কিন্তু নারীর রূপজমোহ সে জয় করতে পারেনি। তাই সীতার রূপের আগুনে তার সোনার লঙ্কা পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। শুধু রাবণই নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। মহেশের এই মোহও যে রায় পরিবারে বিরাট এক অনর্থপাতের সূত্র তৈরী করে চলেছে, তা পরিবারের লোকেরা কল্পনা করতে পারেনি।

মানসিক বিপর্যস্ত মহেশ এখন বাড়ীতে থাকেনা তার কর্মস্থান নিকটবর্তী মহকুমা শহরে বাসা ভাড়া করে তার পুত্র পরিবার নিয়ে উঠে গেছে। শচীন্দ্রতো তার পরিবার নিয়ে কোলকাতায়ই থাকে। গরমের ছুটি ও পূজাব ছুটিতে বাড়ীতে আসে এবং ছুটি কাটিয়ে চলে যায়। তিন ভাইয়ের মধ্যে দেবেন্দ্রই এখন স্থায়ীভাবে বাড়ীতে বাস করছে। মহেশ রোজ শনিবার বাড়ীতে আসে, রবিবার থেকে সোমবারে ভোরে চলে যায়। বাড়ী ছেড়ে গেলেও তার মেজাজের কোন পরিবর্তন হয়নি। মেজাজ সব সময়েই বিগড়ানোই থাকে। শত তোয়াজ করেও তাকে সন্তুষ্ট করা যায় না। মায়ের উপরই যেন তার রাগটা বেশী। তার কথাবার্তা ও আচার আচরণে অতিষ্ঠ গঙ্গামণি অনেক সময় চোখের জল ফেলেন। মায়ের চোখের জলও তাবে

এতকটুকু বিচলিত করেনা। বিধাতা কেন যে তাকে এত মতিচ্ছন্ন করে তুললেন, গঙ্গা তা ভেবে পান না। গঙ্গা সব সময় ঈশ্বরের কাছে মহেশের সুমতি প্রার্থনা করেন। আর্থিক দিক দিয়ে রায়পরিবারের ভাগ্য এখন খুবই প্রসন্ন। ওকালতীতে মহেশ শচীন্দ্র দুই ভাইয়েরই যথেষ্ট উপার্জন। দেবেন্দ্রও ব্যবসা বানিজ্য করে অঢেল লাভের টাকা ঘরে তুলছে। সম্পত্তির আয়তো আছেই। তাই স্বচ্ছন্দে এখন বাড়ীতে পাকা কাজ শুরু করা যায়। খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে দালানকোঠার যে পৈতৃক বাড়ী তাদের ছেড়ে আসতে হয়েছিল, এজন্য গঙ্গামণিদের তিন বোনের মনেই গভীর দুঃখ। পৈতৃক বাড়ীর অনুরূপ দালানবাড়ী তৈরী করার আকাঙ্খাও ছিল। কিন্তু নানান ঝামেলায় এতদিন পর্যন্ত সেটা আর হয়ে উঠেনি। তাই সবাই পরামর্শ করে এবার বাড়ীর কাজ শুরু করে দিতে মনস্থ করলেন।

শুভদিন দেখে বাড়ীর কাজ শুরু হল। ইট, সুরকী, চুন,বালী, সিমেন্ট, কাঠ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় মাল মশলা কেনা হল। মিস্ত্রী মজুর ডাকা হল এবং পূরাদমে বাড়ীর কাজ শুরু হয়ে গেল। গঙ্গাদের তিনবোনের মনেই খুব আনন্দ। এতদিনে পৈতৃক বাড়ীর অনুরূপ বাড়ী তৈরী হচ্ছে। গুনমণির ইচ্ছানুসারে প্রথমেই সামনের পিছনের ঘাট বাঁধানো হল। তারপর দালানের ভিত তৈরীর জন্য মাটি কাটা শুরু হল। আপাততঃ পাঁচকোঠার দালান হবে। মাঝের কোঠাটা বেশ বড় হবে। সেই কোঠায় থাকবেন গঙ্গারা তিনবোন বামপাশের দুই কোঠায় থাকবে যথাক্রমে মহেশ ও শচীন্দ্র, আর ডানপাশের এককোঠায় দেবেন্দ্র থাকবে, আর এক কোঠা হবে ঠাকুর ঘর। পরবর্তী সময় ঠাকুর দালান করার জন্যও অবশ্য ছক কাটা হয়ে গেছে। লাগোয়া খাবার ঘর ও রান্নাঘরটাও এইসঙ্গে করে ফেলা হবে। বাড়ীটা তিন খণ্ডে বিভক্ত। পিছনের খণ্ডে চাকর বাকরদের থাকার জন্য ছোট ছোট চালা ঘর আছে, গোয়াল ঘর আছে। আর আছে মস্ত উঠান। এই উঠানে ধান মাড়াই ও শুকানো হয়। এই উঠানটাও এখন পাকা করে ফেলা হবে। কাঁচা উঠান লেপে নিয়ে ধান শুকানোর চেয়ে পাকা উঠানে ধান শুকানো অনেক সুবিধা জনক। বাড়ীর সামনের খণ্ডটি খোলা ঘাসের চত্বর। পাটের সময়ে এখানে পাট ও পাটশোলা শুকানো হয়। আখের সময়ে খুব বড় বড় উনুন তৈরী করে আখের রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরী করা হয়। আর বিকালবেলা ছেলে পিলেরা এই সামনের খণ্ডেই খেলাধূলা করে।

বাড়ী সম্বন্ধে গঙ্গাদের তিনবোনের মনেই একটা স্বপ্ন আছে, একটা জেদও

আছে। পিতা রাজচন্দ্র যে বাড়ী তৈরী করেছিলেন, তার চেয়েও জাঁকালো বাড়ী তৈরী করে খুড়তুতো ভাইদের দেখিয়ে দেবেন। কেমন বাড়ী হবে তার ছককাটা হয়ে গেছে। এখন যে দালান হচ্ছে তার অনুরূপ আরও দুটি দালান করে তিনভাইকে আলাদা করে দেওয়া হবে। যাতে করে ছেলেরা নিজ নিজ স্ত্রী পুত্র নিয়ে বেশ হাত পা ছড়িয়ে থাকতে পারে, আর ঠাকুর দালানের লাগোয়া আর একটি দালান করে তারা তিনবোন থাকবেন। অথিতি অভ্যাগতদের থাকার ব্যবস্থাও হবে ঐ দালানেই। বাড়ীটা তারা দালানময় করে তুলবেন। অন্ততঃ মাঝের খণ্ডে একটিও টিনের চালের ঘর রাখবেন না। একবার যখন কাজ শুরুকরে দিয়েছেন, তখন প্ল্যানমত সব কিছুই করবেন। তিনবোনের মনই আনন্দে টইটুম্বর। এমন পরিস্থিতিতেই অভাবনীয় অকল্পনীয় সেই চরম দুর্ঘটনাটি ঘটল। শৈলর গর্ভে তখন দ্বিতীয় সন্তান। সময়টা ছিল শীতকাল।

দক্ষিণের ঘরটির মাঝখানে কাঠের পার্টিশান দিয়ে দুইটি কোঠা করা হয়েছে। এককোঠায় স্ত্রীপুত্র নিয়ে দেবেন্দ্র থাকে আর অন্যটিতে থাকেন গঙ্গারা তিনবোন, পার্টিশানের মাঝখানে দরজা আছে। প্রয়োজনে ভিতর দিয়েই আসা যাওয়া করা যায়। আর ভিতরদিকে আসাযাওয়ার প্রয়োজনও আছে। কারণ দেবেন্দ্র ব্যবসার কারণে প্রায়ই বাড়ীর বাইরে থাকে। তাই গঙ্গা বউয়ের ও নাতির দেখাশোনার জন্য মাঝখানের দরজাটা সবসময় ভেজিয়েই রাখেন। কারণ শৈলর ব্যাপারে তিনি সবসময় সতর্ক। দুর্ঘটনার আগের দিনমাত্র দেবেন্দ্র ব্যবসার প্রয়োজনে বিহার অঞ্চল থেকে ঘুরে এসেছে। যাতাযাতেব ধকলে সে বেশ ক্লান্ত। তাই ঘটনার দিনটিতে ও সে সকাল সকাল রাত্রের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল। রাত্রের খাওয়া দাওয়া সেদিন একটু আগে আগে সেরে যাওয়ায় বাড়ীর অন্য সবাইও অন্যদিনের তুলনায় একটু আগেই শুয়ে পড়েছিল। শীতটাও সেদিন বেশী। দেবেন্দ্রের ঘুম এমনিতেই একটু পাতলা। সামান্য শব্দ হলেও তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। মাঝরাতে ঘরে ঘুমের মধ্যেই দেবেন্দ্র মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পেল। এবং আবছা অন্ধকারে একটা মানুষ যেন ঘরের দক্ষিণদিকে দ্রুত পায়ে চলে যাচ্ছে এমন মনে হল। দেবেন্দ্রের তন্দ্রা ছুটে গেল এবং সে উঠে বিছানায় বসেই টর্চ্চ জ্বালল এবং আশ্চর্য হয়ে দেখল তার খড়ম জোড়ার পাশে সরা দিয়ে ঢাকা একটা মাটীর ঘট। কোন মানুষ দেখতেপেল না, সরার উপরে একটা জ্বলন্ত টিকা ছিল। এই মাত্র জ্বালানো হয়েছে বলে কাল টিকাটা তার নজরে এল না। ব্যাপারটা তার কাছে

খুবই আশ্চর্য মনে হওয়ায় সে বিছানায় বসেই মাকে ডাকল। ছেলের ডাকে গঙ্গা মাঝের দরজা দিয়ে উঠে এলেন। সঙ্গে নবদুর্গাও এলেন। গুনমণিরও ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু শীতের মধ্যে লেপ ছেড়ে উঠে আসতে আলস্যবোধ করাতে তিনি আর উঠলেন না। কি আর হবে? হয়ত তীর্থের সামান্য একটা অসুখ বিসুখ করেছে। তার চোখে আবার একটু ঘুম লেগে গেল।

গঙ্গা এবং নবদুর্গা এসে জিনিসটা দেখলেন। দেবেন্দ্র বিছানায় বসেই বস্তুটা সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছিল। দরজার দিকের খাটে শৈল ছেলে নিয়ে এমন অঘোরে ঘুমাচ্ছে যে ঘরের কথাবার্তায়ও তার ঘুম ভাঙ্গল না। গঙ্গা ও নবদুর্গা আলো জ্বেলে তন্নতন্ন করে ঘরটা দেখলেন। কিন্তু ঘরের দরজা জানালা ঠিকঠাক বন্ধই আছে।ঘরে লোক প্রবেশের কোন ফাঁক দেখতে পেলেন না। অথচ জিনিসটা কেমন করে ঘরে এল? তিনজনে মিলে এই আলোচনা করতে লাগলেন। এ সময়ের মধ্যে টিকেটা বেশ জ্বলে উঠেছে কিন্তু সেদিকে কারোর চোখ গেল না। দেবেন্দ্র বিছানায়ই লেপ মুড়ি দিয়ে বসে আছে আর গঙ্গাও নব ঘটটার কাছে বসে জিনিষটার মধ্যে কি থাকতে পারে এবং এটা কোনপথে ঘরে এল, এ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। অথচ ঘরের দক্ষিণদিকে যে বিরাট সিঁধ কাটা হয়েছে, তা তাঁদের নজরে এল না। বস্তুটা কি হতে পারে এবং কে বা কারা কিভাবে কেন ওটা ওখানে রেখে গেল সেটাই আলোচনা হচ্ছিল। এটা কোন মারণ-উচাটনের বস্তু বলেই সন্দেহ হতে লাগল। নীলমণির ব্যাপারে এ ধরনের মাবণ-উচাটনের ব্যাপার গঙ্গার ভালই জানা আছে। নবদুর্গার অবশ্য সেসব ঘটনা মনে নেই। কেউ যাতে ঘটটা স্পর্শ না করে এজন্য সবাই সবাইকে সতর্ক করলেন। ভোর হলে ওঝা গুণীনের সন্ধান করতে হবে এ ধরনের কথাবার্তা চলতে লাগল। এতসব কথাবার্তায় শৈলরও ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘট দেখে সে শিউরে উঠল এবং চকিতে তার মনে হল ব্যাপারটায় নিশ্চয় ভাশুরঠাকুর জড়িত আছেন। তবে মুখে কিছু বলল না। নানা কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ টিকার ধিকধিক আগুনটার প্রতি নজর পড়ল নবদুর্গার। তিনি আরও আশ্চর্য হয়ে বললেন, "দেখ দেখ দিদি, সরার উপর একটা টিকা জ্বলছে।" এই বলে দিদির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কিছু না ভেবেই জ্বলন্ত টিকাটা আঙ্গুল দিয়ে একটু ঠেলে দিলেন। একথাই নবদুর্গার শেষ কথা। তার মুখের কথা মুখেই রইল। বিকট শব্দে ঘটের মধ্যস্থিত বোমা ফেটে গেল। ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন হয়ে গেল, বারুদের গন্ধে বাড়ী ভরে গেল,বোমা ফাটার বিকট শব্দে সমস্ত গ্রাম

কেঁপে উঠল। ঘুমভাঙ্গা সমস্ত গ্রামবাসী যে যেভাবে পারে ছুটে এল, ঘটনার বীভৎসতা দেখে সব যেন থ হয়ে গেল। একটু সম্বিৎ ফেরার পরও ঘরের মানুষগুলোকে উদ্ধার করার জন্য এগুতে পারল না। কারণ বিকট ধোঁয়ায় সমস্ত বাড়ী এমন আচ্ছন্ন যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু বোমার ঘরটায় হঠাৎ হঠাৎ আগুনের ফুলকি দেখা যাচ্ছে। মানুষ হায় হায় করতে লাগল। ঘরের একটি মানুষকেও প্রাণে বাঁচানোর কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না।

বিপদে মানুষের স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধিভ্রংশ হয় কিন্তু আশ্চর্যেরব্যাপার এই যে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে দেবেন্দ্রের যেন বুদ্ধি খুলে গেল। আর গায়েও যেন এল অসুরের বল। তড়িৎ গতিতে এই বিকট ধোঁয়া ও ঘুষ ঘুষে আগুনের তাপের মধ্যেই পিছনে যে একটা ছোট দরজা ছিল সেটা হাতড়ে হাতড়ে খুলে ফেলল। বোমাটা ফেটেছিল গঙ্গামণি ও নবদুর্গার উপরেই। তাই তাদের শরীর বোমার ভিতরের কুঁচি বিঁধে রক্তাক্ত ও আগুনে ঝলসানো। সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। ধোঁওয়ার মধ্যে যদিও কিছুই দেখা যাচ্ছিল না তবু দেবেন্দ্র মা মাসীর অবস্থা অনুমান করতে পারছিল। তাই দরজাটা খুলেই সে অজ্ঞান মা মাসীকে কোনমতে পাঁজাকোলে করে উঠানে নিয়ে এল। গ্রামের লোকেরা তৎক্ষনাৎ অজ্ঞান গঙ্গা ও নবকে নিয়ে পূবের ঘরটায় শুইয়ে দিল। পূবের ঘরটা বেশ দূরে ছিল বলে নিরাপদ ছিল। তাছাড়া গ্রামবাসীরা অন্যঘরগুলিতে অবিরাম জল দিচ্ছিল যাতে ঐ ঘরগুলোতে আগুন না ধরে। মা মাসীকে বাইরে আনতে আনতেই ঘরে আগুন ধরে গেছে। ধোঁয়ায় ও আগুনে মিলে ঘরের মধ্যে এমন একটা বীভৎস অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে কল্পনা করা যায় না। দেবেন্দ্রর শুধু মা মাসীর উদ্ধারের কথাটাই মনে ছিল, শৈল বা তীর্থের কথা সেই মুহূর্তে তার মনেই রইল না। আর জিনিষপত্রের কথাতো চিন্তার বাইরে। গুণমণি অবশ্য নিজেই কোনমতে বেরিয়ে এসেছিলেন।

ধোঁয়া ও আগুনের মধ্য দিয়ে শৈল বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তার কাপড়ে আগুন ধরে গেছে। নিজের প্রাণের কথা শৈল ভাবছে না গর্ভস্থ সন্তানকে বাঁচানোর জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ভাগ্যগুণে সে সেই খোলা ছোট দরজাটা একটু দেখতে পেয়ে কোনরকমে বেরিয়ে এল। তার শাড়ী সেমিজ- তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। শৈলর উপস্থিত বুদ্ধি বরাবরই বেশী। তাই গর্ভস্থ সন্তানকে বাঁচানোর তাগিদে সে লজ্জা বিসর্জন দিয়ে প্রায় পাঁচশো লোকের চোখের সামনে

একটানে জ্বলন্ত শাড়ী সেমিজ খুলে ফেলে দিয়ে সম্পর্ণ নগ্নঅবস্থায় দৌড়ে গিয়ে পূবের ঘরে উঠে সামনে ভাগ্নে অবনীর একটা ধূতি দেখতে পেয়ে দ্রুত গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মেঝেতেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল। গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণ বাঁচানোটাই শৈলর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাই লজ্জা বিসর্জন দিতে সে বিন্দুতম দ্বিধা বোধ করেনি। পরবর্তী সময়ে শৈলকে এজন্য কেউ এতটুকু নিন্দে মন্দ করেনি। বরং তার উপস্থিত বুদ্ধি ও আপৎকালীন সময়ে লজ্জাসংকোচ বিসর্জনের জন্য বিস্তর প্রশংসাই করেছে।

ধোঁয়া কমেছে, কিন্তু আগুনের বেগ বেড়েছে। দেবেন্দ্রের ঘর দাউ দাউ করে জ্বলছে। এমন সময় দেবেন্দ্র লক্ষ্য করল যে তীর্থকে বের করে আনা হয়নি। দরজার কাছের খাটটিতে শৈল তীর্থকে নিয়ে ঘুমিয়েছিল। দেবেন্দ্রের ধাবণা ছিল, শৈল তীর্থকে নিয়েই বেরিয়েছে। কিন্তু শৈলরতো গর্ভস্থ শিশুর রক্ষা ছাড়া সে সময়ে অন্য চিন্তা ছিল না। তাই তীর্থ রয়ে গেছে ঘরেই। তীর্থের গায়ের লেপ জ্বলছে। তার খাটের পাশের কপাট জ্বলছে। দেবেন্দ্র পাগলের মত সেই জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে গেল তীর্থকে বের করে আনতে। কিন্তু লোকেরা তাকে ধরে ফেলল। এই আগুনে তীর্থ নিশ্চয়ই দগ্ধ হয়ে গেছে। যে গেছে সেতো গেছেই, যে আছে তাকে বাঁচানো দরকার ভেবে উপস্থিত লোকেরা তাকে ধরে রাখল। কিন্তু দেবেন্দ্র তখন ঘোর উন্মাদ। এক ঝটকায় লোকের হাত ছাড়িয়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিল সেই জ্বলন্ত আগুনে। শৈলরও তখন জ্ঞান ফিরেছে। তীর্থকে বের করা হয়নি বলে সে তখন আকাশ ফাটানো চীৎকার শুরু করে দিয়েছে। আর উন্মাদ দেবেন্দ্র জ্বলন্ত আগুনে হাত দিয়ে লেপের তলা থেকে টেনে বের করে আনল তিন বছরের শিশু তীর্থকে। কনুই পর্যন্ত দেবেন্দ্রের দুই হাত পুড়ে গেল। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য লীলা . গায়ের লেপখানা অর্ধেক জ্বলে গেছে. কিন্তু তীর্থের গায়ে আগুনের এতটুকু আঁচ লাগেনি। ঘুম ভেঙ্গে এত লোক এবং এই বিকট কাণ্ড দেখে সে 'মা মা' বলে কেঁদে উঠল। তীর্থের কান্না শুনে দৌড়ে বেরিয়ে এল শৈল এবং তাকে কোলে তুলে ঘরে চলে গেল। স্বামীর কি অবস্থা তা দেখার মত কোন মানসিকতা সে মূহুর্তে তার আর রইল না। এমন বিপদে দিশাহারা হওয়াতো খুবই স্বাভাবিক।

এতক্ষণ ধরে দেবেন্দ্র উণ্মাদের মত অমিত বিক্রমে এই ভয়ঙ্কর বিপদের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করে চলছিল। কিন্তু তীর্থকে বের করে আনার পর সে আর

পারল না আগুনে পোড়া দুই হাতের জ্বালায় এবং মনের উত্তেজনায় সে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল উঠানে। লোকেরা যথাসাধ্য শুশ্রুষা করে তার চৈতন্য সম্পাদন করল এবং তাকে পূবের ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিল।

কিছু হলেও জিনিষপত্র উদ্ধারের ও আগুন নেভানোর জন্য গ্রামবাসীরা আপ্রাণ চেষ্টা করল। কিন্তু এই প্রলয়ংকরী বিভীষিকার মধ্যে কিছুই করতে পারল না। শুধু চারিদিকে হৈ হট্টগোল। কেউ কারো কথা শুনছে না। সমস্ত জিনিষপত্র সহ দেবেন্দ্রের ঘর জ্বলছে। কড়িবরগা সব আলগা হয়ে যাচ্ছে। দরজা জানালা পুড়ে দড়াম দড়াম শব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ছে। চালের টিন খুলে গিয়ে সশব্দে এখানে সেখানে ছিটকে পড়ছে। সে যে কি ভয়াবহ দৃশ্য তা বর্ণনা করা যায় না। আগুনের লেলিহান শিখায় সমস্ত গ্রামের আকাশ রক্তিম।

অবশেষে সেই কালরাত্রি প্রভাত হল। রাত্রি আর দিনের মধ্যে অনেক তফাৎ। রাত্রের বিভীষিকা দিনের আলোতে একটু কম মনে হয়। ভোরেও আগুন জ্বলছে। মনে হচ্ছে রায় বাড়ী যেন এক মহাশ্মশানে পরিণত হল। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পরদিন সকাল বেলায়ই মহেশ তার বাসাবাড়ী থেকে বাড়ীতে পৌঁছল। মা মাসীর অবস্থা দেখে সে যারপর নাই বিষাদগ্রস্ত হল। কিন্তু এতবড় দুর্ঘটনাটা যে কিভাবে ঘটে গেল এ নিয়ে সে তেমন বিচলিত হল না। অবশ্য মা মাসীর গুরুতর অবস্থার জন্য অন্য বিষয়ের গুরুত্ব মনে না আসাই স্বাভাবিক। ঘটনার দুই দিন পরে কোলকাতা থেকে শচীন্দ্রও এসে পৌছল। মা মাসীর অবস্থা দেখে সে স্ত্রীলোকের ন্যায় রোদন করল এবং কে বা কারা এই শত্রুতা করেছে এ নিয়েও সে তোলপাড় করতে লাগল। এ ব্যাপারে সে মহেশের মত নির্বিকার রইল না।

ক্ষতবিক্ষত দগ্ধ গঙ্গা ও নবর চেহারা বীভৎস আকার ধারণ করেছে। দুইজনেই অচেতন। তবে গঙ্গার মাঝে মাঝে একটু আধটু জ্ঞান ফিরে। কিন্তু নবদুর্গার এতটুকু জ্ঞান নেই। তাঁর আঘাতের পরিমাণও গঙ্গার চেয়ে বেশী, তাঁদের চিকিৎসা শুশ্রুষার যথাসম্ভব ব্যবস্থা হয়েছে। তবে বাঁচার কোন সম্ভাবনাই নেই। সমস্ত গ্রামের লোক হায় হায় করতে লাগল। পাশাপাশি শয্যায় মরণোন্মুখ দুইবোন শায়িত। দুই শয্যার মাঝখানে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে অবিশ্রাম বিলাপ করে চলেছে গুণমণি। আর শয্যাপার্শ্বে বসে কেঁদে চলেছে শচীন্দ্র। মহেশের মুখ দুঃখ বেদনায় এমন বিবর্ণ যে তার মুখের দিকে তাকানো যায় না। দেবেন্দ্র যেন পাথর হয়ে গেছে। তার চোখে জল নেই, মনে ভাব নেই। পট্টিবাঁধা পোড়া দুইহাত নিয়ে সে

নিঃশব্দে এঘর ওঘর করছে। দুইচোখ তার রক্তজবাব মত লাল। ভাবনা চিন্তার সব শক্তিই সে হারিয়ে ফেলেছে। কতবড় ঝড় য়ে তার উপর দিয়ে গেছে তার প্রত্যক্ষদর্শী গ্রামবাসী। ভাইয়েরাতো আর ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল না যে ঠিকঠাক বুঝতে পারবে।

দেবেন্দ্রেকে সপরিবারে খুন করার জন্যই যে কোন অজ্ঞাত শত্রু এই নৃশংস কাজ করেছে গ্রামের সবার কাছেই তা স্পষ্ট। কিন্তু দেবেন্দ্রের এই বিষম শত্রুটি কে? দেবেন্দ্রতো নির্বিরোধী মানুষ। তারতো এমন শত্রু থাকার কথা নয়। শরীকদের সঙ্গে বিষয়সংক্রান্ত যে গোলমাল ছিল তাতো কবেই মিটে গেছে। খুবই রহস্যজনক ব্যাপার। গ্রামের সব মানুষের মুখে শুধু এই আলোচনা এবং এই জঘন্য অপরাধীকে খুঁজে বের করে তার উপযুক্ত সাজার জন্য সবার মনেই দারুণ উত্তেজনা। মহেশ মস্ত উকীল। সে নিশ্চয়ই ঘটনার তদন্ত করে শীঘগিরই অপরাধীকে সনাক্ত করে ফেলবে। মহেশ উকীলের যথেষ্ট এলেম আছে। সে লাগলে না পারে কি?

ছোট গ্রাম। অল্প সংখক মানুষের বাস। জনাকীর্ণ শহরতো নয় যে অপরাধীকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে। কাজেই অপরাধীকে চিহ্নিত করা কোন শক্ত কাজ নয়। কিনতু মহেশ এ ব্যাপারে মোটেই উৎসাহ দেখাচ্ছে না দেখে গ্রামবাসীরা কিছুটা বিস্মিত। মহেশ শুধু বিষন্ন মুখে চিন্তাকুল মন নিয়ে অজ্ঞান মা মাসীর শিয়রে ঠায় বসে আছে। হয়ত মা মাসীর দুর্দশায় তার মন এতটাই আকুল যে আসল বিষয়ে সে মন দিতে পারছে না।

শচীন্দ্রের প্রতিক্রিয়া আবার ভিন্নরূপ। একদিকে সে মা মাসীর এই দুরবস্থার জন্য যেমন শোকে মুহ্যমান, তেমনি কোন দুরাত্মা নিষ্পাপ নির্বিরোধী মেজদাদাকে খুন করার জন্য এই জঘন্য প্রয়াস নিয়েছে তাকেও হাতে নাতে ধরার জন্য বদ্ধ পরিকর। কিন্তু সে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল যে এ ব্যাপারে বড়দাদার যেন তেমন উদ্যোগ নেই। অথচ বড়দাদা খুবই দাপুটে মানুষ। অন্যায়ের মোকাবিলায় তিনি সদাপ্রস্তুত। অথচ এই ভীষণ ব্যাপার নিয়ে তিনি যেন মাথা ঘামাচ্ছেন না। এতে শচীন্দ্র খানিকটা দমে গেল। পুলিশ অবশ্য পরদিনেই প্রাথমিক তদন্ত করে গেছে। কিন্তু যার ব্যাপার সে যদি সক্রিয় না হয়, তবে পুলিশ ততটা সক্রিয় হবে কেন? এসব চিন্তার উপরে বড় চিন্তা হল মা মাসী। তাঁদের অবস্থাদ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। গঙ্গামণির মাঝে মাঝে চৈতন্য হয়। দু'একটা কথাও মাঝে মধ্যে বলেন। কিন্তু ছোটমাসীর একবারের জন্যও জ্ঞান ফিরে আসেনি। এমন অঘটন মানুষের

জীবনে কখনও ঘটে না।

এই জঘন্য দুষ্কর্মের তদন্তে মহেশ ততটা আগ্রহী না হলেও অভাবনীয়রূপে অন্য একজন এ ব্যাপারে সঠিক তদন্তের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। সে হল গঙ্গামনির ভাইপো প্রসন্ন উকীল। প্রসন্ন বুদ্ধিমান, নীতিবান এবং ডাকসাইটে উকীল। গ্রামে তার যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। তাদের দুইপরিবারের মধ্যে বিষয় সংক্রান্ত কলহ বিবাদ থাকলেও তারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাই নিজের পিসীদের এই করুণ পরিণতি সে কোনক্রমেই সহ্য করতে পারছিল না। একই বংশের লোক তারা,তাদের ধমনীতে একই রক্তধারা বইছে। তাছাড়া দুই বাড়ীর মধ্যে শত্রুতা থাকলেও পিসতুতো ভাই দেবেন্দ্র অমায়িক স্বভাবের জন্য বরাবরই তার স্নেহের পাত্র। নির্বিরোধী দেবেন্দ্রেকে সপরিবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্যই যে ভয়াবহ বোমা নিক্ষেপের ঘটনা, তা সবার কাছেই স্পষ্ট। এই অন্যায়ও প্রসন্ন সহ্য করতে পারছে না।

আর হত্যার উদ্দেশ্যে বোমার ব্যবহারটাও যথেষ্ট বুদ্ধিমান লোকের মস্তিষ্ক প্রসূত। গ্রামের লোক খুনখারাবির জন্য লাঠিসোঁটা, দাঁ, বল্লম ইত্যাদিই ব্যবহার করে থাকে। বোমার ববেহার জানে না। কিন্তু গ্রামের বাইরে দেবেন্দ্রের এমন বুদ্ধিমান শত্রু কে আছে যে বোমার দ্বারা তার প্রাণহানির চেষ্টা করবে? আর করলেও গ্রামের লোকের সঙ্গে যোগসাজস না করে বাইরের লোক তা পারবে না। তাই গ্রামের মধ্যে একটু চেষ্টা করলেই অপরাধীর সন্ধান পেতে দেরী হবে না। প্রসন্ন অপরাধীকে ধরা এবং তার উচিত সাজার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। প্রসন্ন কোন কাজে হাত দিলে কখনও ব্যর্থ হয় না। ক্রোধে দুঃখে প্রসন্নর মাথায় যেন আগুন জ্বলছিল। সে এর একটা হেস্তনেস্ত করবেই। কার কেন এই দুঃসাহস সে এটা দেখে নেবে। তাই দুষ্কৃতিকারীকে সনাক্ত করতে এবং উপযুক্ত সাজার ব্যবস্থা করতে সে বদ্ধপরিকর। পিসীদের এই শোচনীয় পরিণতি এবং নির্বিবাদী দেবেন্দ্রের প্রতি এই প্রাণঘাতী প্রয়াস যে নিয়েছে, তার উপযুক্ত সাজা না হওয়া পর্যন্ত প্রসন্নর মন শান্ত হবে না। কি মনে করে যে প্রসন্ন হঠাৎ এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হয়ত ন্যায়ের দেবতা তাঁর উপর ভর করেছেন।

ঘটনার তদন্তে দারোগা পুলিশ এল এবং এটা স্বাভাবিক। কে কারা এই কাজ করেছে, কার প্ররোচনায় করেছে, এসব পুলিশী তদন্ত শুরু হল। দেবেন্দ্রেকে

খুন করাই যে এই দুষ্কর্মের আসল উদ্দশ্য তাতে কারো কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অথচ গ্রামে সজ্জন দেবেন্দ্রের এমন শত্রু আছে এটা ভাবনার অতীত। তাই সবার মনে এক প্রশ্ন দেবেন্দ্রের এতবড় শত্রু কে এবং কেন ?

বহুলোকের আবাস শহর নয়, ছোট গ্রাম, লোকসংখ্যা সীমিত এবং প্রত্যেবে প্রত্যেকের পরিচিত। তাই কথা বড় একটা গোপন থাকে না। তার উপর তদন্তে নেমেছে স্বয়ং প্রসন্ন, যার দাপটে বাঘে-গুরুতে এক ঘাটে জল খায়। কাজেই কার প্ররোচনায় কে এই কাজটি করেছে, তা একরকম প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ভয়ে কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলছে না ঠিকই, তবে কানঘুষো চলছে যথারীতি। পুলিশই বা কি করে দেখা যাক। অবশ্য সত্য উদ্ধারের জন্য প্রসন্ন উকীল প্রকাশ্যেই উঠে পড়ে লেগেছে। তার ক্ষমতা আছে। সে করতেই পারে। অন্যরা চুপচাপ থাকাটাই সমীচীন মনে করছে। আর ব্যাপারও বড় সাংঘাতিক। সর্ষের মধ্যেই যে ভূত লুকিয়ে আছে। ঘটনার মূলে আছে গঙ্গারই জ্যেষ্ঠপুত্র মহেশ। বাইরের কোন শত্রু নয়। পারিবারিক আক্রোশের কারণেই এই ভয়ানক কান্ড। কিন্তু কেন এই আক্রোশ সেটাই বুঝা যাচ্ছে না। সমস্ত গ্রামবাসী দমবন্ধ করে তদন্তের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে। ভয়ে বিস্ময়ে সমস্ত গ্রামবাসী স্তব্ধ।

দেবেন্দ্রকে সপরিবারে নিকেশ করে দেওয়ার জন্য বিস্তর টাকা দিয়ে মহেশ গ্রামের ডাকাবুকো গুণ্ডা অভয় নমঃশূদ্রকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছে।অভয়ের লোহার মত শক্ত পাথর কালো শরীর, মনটাও তেমনি কঠিন। টাকা পেলে এমন কোন দুষ্কর্ম নেই যে সে করতে পারে না। এসব করে সে কয়েকবারই পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। বিস্তর মার খেয়েছে, জেল খেটেছে, কিন্তু তার স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। অকাজ - কুকাজ করার জন্যই সে জন্মেছে। গ্রামের লোক যথাসম্ভব তাকে এড়িয়েই চলে। প্রসন্নের চাপে অভয় সব স্বীকার করেছে।

বোমা দিয়ে সপরিবারে দেবেনঠাকুরকে উড়িয়ে দেওয়াই মহেশ ঠাকুরের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পাশেই যে মাঠাকুরুণরা আছেন, তাদের যে ক্ষতি হতে পারে এটা মহেশঠাকুরের মাথায়ও আসেনি,অভয়ের নিজের মাথায়ও আসেনি। এই ভুলটার জন্যই আজ মাঠাকুরুণদের এই দশা। এজন্য তার মনে বড়ই আফসোস হচ্ছে। জীবনে কুকর্মতো সে কম করেনি। কিন্তু কোনকালেই তার মনে এরকম আফসোস অনুতাপ হয়নি। এই আফসোসের কারণেই সে সবকিছু সহজেই প্রসন্ন ঠাকুরকে বলে দিল। নইলে তার কাছ থেকে কথা বার করা এত সহজ হত না।

তবে প্রসন্ন উকীলও সহজ ব্যক্তি নয়। কথা কি ভাবে আদায় করে নিতে হয় সে তা জানে। শুধু অভয়ের মুখের কথা নয়,আরও ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণসহ প্রসন্ন ঘটনার সব তথ্য উদ্ধার করে ফেলেছে।

দুঃখে ক্রোধে ঘৃণায় আগুন জ্বলল প্রসন্নর মাথায়। মহেশ ভাই হয়ে কেন দেবেন্দ্রকে শেষ করে দিতে চেয়েছে, এ নিয়ে সে আপাততঃ তেমন মাথা ঘামাল না। তার একমাত্র লক্ষ্য পিসীদের এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের উপযুক্ত বিচার। বড়পিসী গঙ্গামণি মহেশের মা, দেবেন্দ্র তার সহোদর ভাই। ছেলে হয়ে সে যদি মাকে খুন করে,ভাই হয়ে ভাইকে হত্যার উদ্যোগ নেয় তবে এর প্রতিকারের যথার্থ অধিকার দূর সম্পর্কিত আত্মীয়ের ততটা নেই। এর প্রতিকারের যথার্থ অধিকার দেবেন্দ্র ও শচীন্দ্রের। কিন্তু ছোটপিসী নবদুর্গা ? তার এই নিমর্ম পরিণতির প্রতিকারের যথার্থ অধিকারতো তার আছে। তাই প্রসন্ন ছেড়ে দেবেনা। মহেশকে সে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে ছাড়বে। এতবড় অন্যায় সে সহ্য করবে না কিছুতেই। এতে রায় পরিবারের কলঙ্ক হবে। তা হউক। তাতে প্রসন্নর কি এসে যায়। যে যেমন কর্ম করে তাবে সেরকম ফল পেতেই হবে। মহেশ যে এতটা অমানুষ প্রসন্ন তা স্বপ্নেও ভাবেনি। দেবেন্দ্রের প্রতি মহেশের আক্রোশের কারণ নিয়ে তার মাথাঘামানোর দরকার নেই। মামলা শুরু হলে আপনিই সব বেরিয়ে পড়বে। বড়পিসী গঙ্গামণি যখন কুসন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন, তখন তার বিষফল ভোগ করা ছাড়া তার অন্য উপায় নেই। দেবেন্দ্র শচীন্দ্রও ভাই বলে এবং পারিবারিক কেচ্ছা কলঙ্ক এড়াবার জন্য টাকাপয়সা দিয়ে মামলা ধামাচাপা দিতে পারে। কিন্তু প্রসন্ন ছাড়বে না। কারণ ছোটপিসী নবদুর্গা কেন কুলাঙ্গার বোনপোর বলি হবেন ? ওরা মামলা না লড়লে প্রসন্ন বাদী হয়ে নবদুর্গার জন্য মামলা লড়বে। ছোটপিসীর উপর তার অধিকার ওদের চেয়ে অনেক বেশী। তবে সে উকীল মানুষ, মাথা ঠান্ডা করে চলতে জানে। তাই এখনই মুখ খুলল না। পুলিশের তদন্তের অপেক্ষায় রইল।

মহেশ মনে মনে বড় ফাঁপরে পড়ে গিয়েছে। যে দেবেন্দ্র-শৈলকে নিকেশ করে দেওয়ার জন্য সে এতবড় ঝুঁকি নিয়েছিল, ভাগ্যের পরিহাসে তারা পুত্রসহ দিব্যি বেঁচে গেল। আর বলি হল গর্ভধারিণী জননী আর পরমস্নেহশীলা জন্মদুঃখিনী মাসী। তার এই পাপের বোঝা নামানোর পৃথিবীতে কোন জায়গা নেই। শৈল তার জীবনের এক দুষ্টগ্রহ। শৈলর প্রতি তৃষ্ণায় বিতৃষ্ণায় ক্রোধেও অপমানের জ্বালায় দিশাহারা হয়েই সে এমন একটা ভয়াবহ কাজ করে ফেলেছে।

একই ঘরে এই বোমাবিস্ফোরণে যে মা মাসীদের জীবন হানি ঘটতে পারে সে জ্ঞান তখন তার হয়নি। তবু ভাগ্য কিঞ্চিৎ ভাল যে সেজমাসী কোনরকমে বেরিয়ে যেতে পেরেছিলেন। শৈলর জন্যই আজ তার এই অধঃপতন। অপরূপা শৈলর রূপের আড়ালে নিশ্চয় কোন ডাকিনীশক্তি লুকিয়ে আছে। নইলে তার মত একজন শক্তপোক্ত পুরুষ বার বার এই নারীর নিমিত্তে নাজেহাল হবে কেন? মা মাসীর জন্য তার অন্তর বেদনায় অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাইরের অন্তরের এই জ্বালা প্রকাশের কোন উপায় নেই। তাছাড়া অন্য দুশ্চিন্তারও অন্ত নেই। তদন্তে যদি প্রকৃতষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে পড়ে তবেতো আর রক্ষা নেই। মানসম্মানতো পরের কথা। জেলতো হবেই ফাঁসী হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। তবে অভয়টা বেশ শক্তলোক। মনে হয় না বেফাঁস কিছু বলবে। আর টাকাওতো তাকে কিছু কম দেওয়া হয়নি। তবু দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। সময় মন্দ হলে অনেক কিছুই হতে পারে। তার মনে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ও পরিতাপের ঝড় বইছে। মনের এই অবস্থার মধ্যে মাঝেই মাঝেই চোখের সামনে ভেসে উঠেছে সরযূর ও কতকগুলি অবোধ ছেলেপিলের নিষ্পাপ মুখ। এমন হচ্ছে কেন? মহেশ কি ধরা পড়ে যাবে? তার কি ফাঁসি হবে? আতঙ্কে ভয়ে তার ভিতরে একটা থরহরি কম্প। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হল ওবাড়ীর প্রসন্ন নাকি ব্যাপারটার আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। প্রসন্ন যে তাদের দুর্ঘটনার ব্যাপারে নাক গলাতে আসতে পারে তা মহেশ ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি। ওরাতো চিরকাল তাদের বিপদআপদ বেশ উপভোগই করে এসেছে। হঠাৎ এ ব্যাপারে প্রসন্ন এগিয়ে আসাতে মহেশ বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। প্রসন্নকেতো সে ভালভাবেই জানে। একই কোঁটে ইদানীং তারা দু'জনেই ওকালতী করছে। প্রসন্ন বড় শক্তলোক। সে দিনকে রাত আর রাতকে দিন করতে পারে। সে যখন কোঁটে সওয়াল শুরু করে তখন তার মুখের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্য! এ পর্যন্ত প্রসন্নর কোন মক্কেলকে মামলায় হেরে যেতে সে দেখেনি। এহেন প্রসন্ন যদি পিছনে লাগে, তবে বিপদ অনিবার্য। এখন ভরসা দেবেন্দ্র-শচীন্দ্র। মা মাসীরতো যা হবার হয়েছে। পারিবারিক কলংকের ভয়ে ওরা মামলা ধামাচাপা দেবে বলেই মহেশের বিশ্বাস কিন্তু সেও উকীল। তাই মামলার ঘোরপ্যাঁচ ভালই বোঝে। দেবেন্দ্র শচীন্দ্র ধামাচাপা দিলেও প্রসন্ন ছোট মাসীর জন্য বাদী হয়ে মামলা লড়তে পারে। এমন বিপদ হতে পারে আগে বুঝলে সে কাজটা এভাবে করত না। এখন তার সামনে জীবন-মরণ

সমস্যা। তার উপর মা মাসীর জন্য আছে অনুশোচনার যন্ত্রণা। তবে সে খুবই শক্ত মানুষ। বাইরে তার মনোভাবের এতটুকু প্রকাশ নেই।

আসল তথ্য জেনে গেছে দেবেন্দ্র - শচীন্দ্রও। তাই তারা একেবারে দিশেহারা। জেনেছেন গুণমণিও। তিনিও বিভ্রান্ত, হতভম্ব। এখন শোক তাপের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই দুরপনেয় কলঙ্ক চাপা দিয়ে পারিবারিক মান রাখা ও মহেশের জীবন রক্ষা করা। কিন্তু কিভাবে? দুই ভাই ও মাসী মিলে অনেক রকম পরামর্শ করে চলেছে। কিন্তু কোন কূল কিনারা দেখতে পাচ্ছে না। গুণমণি জীবনে কোন সমস্যার মোকাবিলা করেননি। যা কিছু এর আগে ঘটেছে সবকিছুর সমাধান দিদি গঙ্গাই করেছেন। কিন্তু এখনত আর দিদিকে পাওয়া যাচ্ছে না। চির নির্ভর সেই দিদি বিকৃত শরীর নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। গুণমণির হৃদয় বোনদের শোকে খানখান হয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধি যেটুকু ছিল তাও যেন নষ্ট হয়ে গেছে। কি সর্বনাশ করে বসেছে মহেশ। শৈলকে কেন্দ্র করেই যে মহেশের এই কুকীর্তি তা অবশ্য বাড়ীর লোকেরা আঁচ করে নিয়েছে। শচীন্দ্রতো মাঝে মাঝে খুব রেগে যাচ্ছে। বলছে " যা হবার হোক। যে যেমন তার তেমনি সাজা হওয়াই দরকার। আর কলংকের কথাই বা ভেবে কি হবে। কলংকের কি বাকী আছে কিছু? লোক জানাজানিতো হয়েই গেছে। সামনাসামনি মুখ ফুট কেউ কিছু বলছে না এই যা।" কিন্তু এটাতো নেহাৎ রাগের কথা। কোন কাজের কথা নয়। এমনিতে লোকজানাজানি হওয়া আর প্রকাশ্যে আদালতে পারিবারিক কেচ্ছাকাহিনী উঠা এক কথা নয়। তাছাড়া বড় কথা হল মহেশের জীবনের প্রশ্ন। অপরাধ প্রমাণ-হলে ফাঁসিও হয়ে যেতে পারে। তাই উপায় একটা বের করতেই হবে। কিন্তু আর এক মহামুস্কিল হয়ে দাঁড়িয়েছেন ওবাড়ীর প্রসন্নদাদা। তিনিতো অপরাধীকে সনাক্ত করে তার উপযুক্ত সাজার জন্য অগ্নিমূর্তি ধারণ করে লেগে গেছেন। যে তার পিসীদের এই ভয়াবহ অপমৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে তাকে তিনি ছেড়ে দেবেন না। প্রসন্নদাদা খুবই শক্ত মানুষ। তিনি যা মনে করেন তা না করে ছাড়েন না। অভয় প্রসন্নদাদার কাছে সব স্বীকার করেছে। কোথায় কে বোমা তৈরী করে দিয়েছে, অভয়ের হাতে কে বোমা পৌছে দিয়েছে এবং কার্যসিদ্ধির জন্য কাকে কতটাকা দেওয়া হয়েছে, ইত্যাদি সব খবরই নাকি প্রসন্নদাদা সংগ্রহ করে ফেলেছেন। তবে পুলিশ কতটুকু কি করে দেখার জন্য তিনি চুপ করে আছেন। এসব খবর বিভিন্নসূত্রে দেবেন্দ্র শচীন্দ্রর কানেও আসছে। তাছাড়া প্রসন্নদাদা নিজেই দেবেন্দ্রকে বলেছেন

"অমার পিসীদের হত্যাকারীকে আমি উচিত শিক্ষা না দিয়ে কিছুতেই ছেড়ে দেব না। তবে শুধু তুই আমার পাশে থাকিস্ দেবু।" প্রসন্নদাদার এটুকু কথাই যথেষ্ট। কারণ তিনি মুখে যা বলেন কাজেও তা করেন। প্রসন্নদাদাকে ঠেকানোর কোন উপায় দেখছে না দেবেন্দ্র। এদিকে বেদনায় বিতৃষ্ণায় উদ্‌ভ্রান্ত শচীন্দ্রও বড়ই অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। শচীন্দ্র কেবলই বলছে, "আমি এসব নোংরামি থেকে মুক্তি চাই মেজদাদা। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। মা মাসীতো যাত্রা করেই রয়েছেন। এই সময়টুকু থেকে আমিও তল্পি গুটাব। আর কোনদিন এমুখো হবো না। থাক বিষয় সম্পত্তি পড়ে। আমি ত আর তোমার মত সাধুসন্ন্যাসী নই যে সুখদুঃখ ন্যায় অন্যায় সমান জ্ঞান করব। তবু তোমাকে ওবলি মেজদাদা। তুমিও পুত্র পরিবার নিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাও। এমন ভাইয়ের সংস্পর্শে থাকা মহাপাপ।"

শেষ পর্যন্ত হাল ধরতে হল গুণমণিকেই। তিনি শচীন্দ্রকে তিরস্কার করে বললেনে,"এই ঘোর বিপদে তুই এসব কি বলছিস শচী। তোর এসব সহ্য হচ্ছে না আর আমাদের বুঝি খুব ভাল লাগছে? মাথার উপরে যদি খাঁড়ার ঘা পড়েই যায়, তখন সহ্য না করে আর উপায় কি? এখন এই সমুহ বিপদ থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যাবে সেসব চিন্তা না করে কি সব আগড় বাগড় কথা বলছিস। দূরে চলে গিয়ে কি মানসন্মান বাঁচাতে পারবি তুই? রক্তের সম্পর্ক কি মুছে ফেলা যায়? কাজেই মাথা গরম না করে কি উপায় করা যায় সেই চিন্তা কর।" গুনমণির এই তিরস্কারে শচীন্দ্র খানিকটা ধাতস্থ হল। কিন্তু রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় কারোর মাথায়ই আসছে না। গুণমণি ভাবছেন এই ঘোর সমস্যার সমাধান যিনি করতে পারতেন তিনিতো আজ মৃত্যুপথ যাত্রিনী। তার সঙ্গেত আর পরামর্শ করা যায় না। তবু অনেক ভেবেচিন্তে গুণ বললেন," মেজদিদির কিন্তু মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে আসে আর কি একটা কথা বলার জন্য আমাকে কাছে ডাকে। কথা বললে কষ্ট হবে মনে করে আমি তাকে থামিয়ে দেই। কিন্তু এখন ভাবছি, কষ্ট হলেও দিদি কি বলতে চাইছে তা শুনে নিতে হবে আর সুযোগ পেলে আসল কথাটার আভাসও তাকে দিতে হবে। অবশ্য বুঝি মৃত্যুকালে এমন একটা কথা শুনলে তার ভীষণ কষ্ট হবে। তবে যত কষ্টই হউক, যাবার বেলায় তার কুপুত্রের কুকীর্তিটা জেনে যাওয়াই ভাল। আর বলা যায় না, এ ব্যাপারে দিদি কিছু সমাধানের কথা বলতেও পারে। যদি ভাগ্যগুণে দিদি এ ব্যাপারে কিছু নির্দেশ দেয়, তবে এটাকে ঈশ্বরের নির্দেশ মনে করেই সেভাবেই চলতে হবে।"একথা বলে গুণ হাউ

হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। দেবেন্দ্র শচীন্দ্রের চোখও শুষ্ক রইল না।

কিছু সময় পরে তিনজনে মিলে গঙ্গার শয্যাপার্শে গিয়ে উপস্থিত হল। পাশের শয্যায় অজ্ঞান নবদুর্গা। গঙ্গার পায়ের কাছে শুষ্ক মুখে বসে আছে মহেশ। বেশীর ভাগ সময়েই সে তাই থাকে। তার নাওয়া খাওয়া ঘুম নেই বললেই চলে। পায়ের শব্দে চোখ মেলে চাইলেন গঙ্গা। আবার তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করলেন। মহেশ উপস্থিত থাকলে তিনি বড় একটা চোখ খুলেন না। শুধু গুণকে একলা পেলে কি যেন বলতে চান। গুণর মনে হয়, মৃত্যু যন্ত্রণার চেয়ে বড় একটা যন্ত্রনা দিদির মনে। দিদিত অসাধারণ বুদ্ধিমতী , আসল ব্যাপারটা হয়ত দিদির ধারণায় এসে গেছে। গুণ আগে এতটা তলিয়ে ভাবেননি। এখন মনে হচ্ছে দিদি হয়ত তার ধারণার কথাটাই গুণকে গোপনে জানিয়ে যেতে চান। দিদির এখন বেশ চেতনা আছে দেখে কথা বলার আগ্রহ নিয়ে তার শিয়রে বসল গুন। গঙ্গা গুণের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু মহেশের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই তিনি চোখ বন্ধ করলেন। তার বন্ধ চোখ দিয়ে জল গড়াল। গঙ্গার অসুবিধাটা গুণ ঠিকই বুঝতে পারলেন। তাই মহেশকে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বললেন,"মহী, তুই যদি এভাবে অনাহারে অনিদ্রায় ঠায় বসে থাকিস্ তাহলেতো তুইই ওদের আগে চলে যাবি। আমার হয়েছে সবদিক থেকে জ্বালা। তাই বলছি, গায়ে মাথায় একটু জল ঢেলে যাহোক কিছু মুখে দে। আমার সঙ্গে আয়"- বলে তার হাত ধরে টানলেন। । পরিস্থিতি মহেশকে ভিতরে ভিতরে ভ্যাবাচ্যাকা করে দিয়েছিল। নিজেকে বড়ই আশ্রয়শূন্য মনে হচ্ছিল। তাই মাসীর কথায় স্নেহের স্পর্শ পেয়ে সে আর দ্বিরুক্তি না করে মাসীর সঙ্গে বেরিয়ে গেল এবং মাসীর নির্দেশমত স্নান করতে পুকুরঘাটে গেল। গুণ ক্ষীরোদাকে মহেশের ভাত বেড়ে রাখতে বলে ছুটে এলেন রোগীর ঘরে।

গুণমণি ফিরে আসার আগেই শচীন্দ্র বিনা ভূমিকায় মাকে আসল ঘটনার সামান্য আভাস দিল। কারণ ভূমিকা ফাঁদার মত সময় সুযোগ তো নেই। গঙ্গার সব সময় জ্ঞান থাকে না। তাছাড়া মহেশ বেশীর ভাগ সময়ই বসে থাকে মায়ের শয্যাপার্শ্বে। তার সামনে তো আর কথাটা বলা যায় না। আর এমন মুমুর্ষ রোগীর কাছে এত ভয়ঙ্কর ঘটনা স্পষ্ট করে বলাও অনুচিত। কারণ এই ভয়ঙ্কর কথা শুনে রোগী হার্টফেলও করতে পারে। কাজেই খুব ভেবেচিন্তে শচীন্দ্র কথাটা খোলাখুলি না বলে আভাসমাত্র দিল। এমন সময় গুণমণি রোগীর কাছে এসে

বসলেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এরকম একটা ভীষণ কথা শুনে গঙ্গামণি এতটুকু চমকালেন না বা বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। খুব ক্ষীণস্বরে বললেন, "মাটীর ঘটটা দেখেই ওটা কার কাজ আমি অনুমান করতে পেরে ছিলাম। আমি ঘটটাকে দেখে মারণ-উচাটনের ব্যাপার ভেবেছিলাম। সে যে থেমে থাকবে না, অনেক কিছু করার চেষ্টা করবে তাও আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম আমার সন্তান আমি ভালই চিনি। তাই সবসময় সাবধান থাকার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এতটা যে করে ফেলবে ভাবতে পারিনি।" তারপর ঘটনার পরে প্রথম জ্ঞান হওয়ার পরেই শরীরের যন্ত্রণার চেয়ে এর ফলাফল কি হতে পারে সে চিন্তাই মনে বড় হয়ে উঠেছিল।" গঙ্গার দুই চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল। একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন, "আমার সময় বেশী নেই। তাই যাবার বেলায় আমি তোদের বলে যাচ্ছি, যা হবার তাতো হয়েছে। এখন মহেশ যাতে ধরা না পড়ে, আমার বংশে যেন কলংকের কালি না লাগে, তোরা সেই ব্যবস্থা করিস। একথাই গুণকে বলার জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছি। এবার তোরাই নিজে থেকে বলায় আমার শেষ ইচ্ছাটা তোদের জানাতে পেরে বড়ই নিশ্চিন্ত হলাম। আর দেবুকে বলছি, অনেক কিছুই তো সহ্য করেছিস, আমার মুখ চেয়ে এটাও সহ্য করে যা বাবা। আর আমার এ অবস্থার জন্য কোন দুঃখ করিস না তোরা। কুসন্তানের মা হলে তাকে এমন শাস্তিই পেতে হয়। কিন্তু নব? তাকে কেন আমার পাপের ফল ভোগ করতে হল? এ প্রশ্নের উত্তর খুজে পাচ্ছিনা। এই একটা দুঃখই নিয়ে যাচ্ছি। আর কোন দুঃখ আমার নেই।" একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে ক্লান্ত গঙ্গা চোখ বন্ধ করলেন, দেবেন্দ্র বলল, "তুমি বলার আগেই আমরা সত্য ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কিন্তু ভীষণ মুস্কিলে ফেলে দিয়েছেন ও বাড়ীর প্রসন্নদাদা। যে তার পিসীদের এ হাল করেছে সেই অপরাধীকে তিনি কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না। তিনি ঘটনার সব প্রমাণও সংগ্রহ করে ফেলেছেন, প্রসন্নদাদার জেদ বড় সাংঘাতিক। তাই আমাদের কুলের নাগাল পাওয়ার কোন উপায় দেখছি না। অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণায় গঙ্গার চেতনা আবার লোপ পেয়ে যাচ্ছিল। তবু এরমধ্যেই জড়ানো গলায় বললেন, "প্রসন্নকে আমারসঙ্গে দেখা করতে বলিস, "একথা বলেই গঙ্গাচুপ করলেন। আরও কিছু বলার জন্য ডাকাডাকি করেও দেবেন্দ্র তার সাড়া পেল না।

মৃত্যুপথযাত্রিনী পিসী ডেকেছেন শুনে প্রসন্ন প্রায় ছুটতে ছুটতে পিসীর শয্যাপার্শ্বে এসে উপস্থিত হল। গঙ্গা তার আগুনে পোড়া. চামড়া উঠা দুই হাত দিয়ে প্রসন্নর হাত জড়িয়ে ধরলেন,''বাবা প্রসন্ন তুই আমার ভাইপো, আমার বংশের জন। আমি আশা করি তুই আমার কথা অমান্য করবি না। তুইতো সবই জেনেছিস বুঝেছিস। এটাই আমার আর নবর বিধিলিপি। যা হবার হয়েছে। এখন তোর কাছে আমার অনুরোধ তুই আমার মহেশের প্রাণ আর তোর পিসীর বংশের মান বাঁচিয়ে দে। এই বিষম সংকট থেকে আমার সন্তানকে,আমার পরিবারকে একমাত্র তুইই রক্ষা করতে পারিস। কুসন্তান হলেও কুমাতা কখনও হয়না এটাতো বিশ্বাস করিস। তাই আমি আমার কুলাঙ্গার সন্তানের প্রাণ বাঁচানোরচিন্তায় অস্থির হয়ে আছি। শারীরিক যন্ত্রণার বোধ আমার নেই। কিন্তু যে ভীষণ অপকর্ম সে করে ফেলেছে, তাতে তাঁর বাঁচার কোন উপায়ই দেখছিনা। ভেবে দেখলাম, এই ঘোর বিপদ থেকে এই পরিবারকে রক্ষা করতে একমাত্র তুইই পারিস। তুই আমাকে কথা দিলে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারি। তোর কাছে এটা আমার অন্তিম অনুরোধ। আমি তোর কাছে আমার সন্তানের জীবন ভিক্ষা চাইছি''কথাগুলো বলে গঙ্গা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

মৃত্যুপথযাত্রিনী পিসীর এই করুণ আবেদনে প্রবল প্রতাপী প্রসন্ন চোখের জল সামলাতে পারল না। বেদনায়,করুণায়, শ্রদ্ধায় তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। সে শৈশবে মাতৃহীন,মাতৃস্নেহ কাকে বলে সে বলে জানে না। সন্তানের জন্য মায়ের হৃদয়ে কত ত্যাগ, কত ক্ষমা জমে আছে এই প্রথম যেন প্রসন্ন তা উপলব্ধি করতে পারল। স্বয়ং ঈশ্বরও পাপী সন্তানের জন্য দণ্ডবিধান করেন। ব্যতিক্রম শুধু মা। মাতৃহৃদয়ের তুলনা নেই। মা কেমন হয়, মাতৃহীন প্রসন্ন পিসীকে দেখে তা অনুভব করল, অভিভূত হল। মাতৃহৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধায় তার হৃদয় আপ্লুত হল। সে গঙ্গার চরণে মাথা লুটিয়ে বাস্পরুদ্ধ স্বরেবলল,''তুমি নিশ্চিন্ত হও পিসী। তোমার শেষ কথা রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করব আমি। ন্যায়ের চেয়ে মায়ের হৃদয় আজ আমার কাছে অনেক বড় বলে মনে হচ্ছে।'' গঙ্গা নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করলেন। প্রসন্নর চোখের জলে তার দগ্ধ চরণ ভিজে গেল। গুণমনি ছাড়া এদৃশ্য আর কেউ দেখল না। এরপর প্রসন্ন যেমন ছুটতে ছুটতে এসেছিল, তেমনি ছুটতে ছুটতেই পিসীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর থেকে সে সম্পূর্ণ অন্য মানুষে রূপান্তরিত হল এবং অন্য নীতি নিয়ে ঘটনা সামলানোর জোর চেষ্টা করতে লাগল। দেবেন্দ্র

শচীন্দ্রও খানিকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সন্দেহমূলে পুলিশ গ্রামে ধরপাকড় শুরু করেছে। সমস্ত গ্রাম তটস্থ। কে কখন দোষী সন্দেহে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় বলা যায় না। অভয় নমঃশূদ্র দাগী আসামী। সন্দেহবশে পুলিশ প্রথমেই তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। কারণ কুকর্মে তার জুড়ি নেই। অভয়ের দু'চারজন সাগরেদও ধরা পড়েছে। জেরা করেতো আর এসব লোকের কাছ থেকে কথা আদায় করা যায় না। তাই পুলিশকে উত্তম মধ্যমের পন্থাই নিতে হল। অভয় ধরা পড়ায় দেবেন্দ্র শচীন্দ্র প্রমাদ গুনছে। পুলিশের মারের চোটে সে যদি মহেশকে জড়িয়ে দেয় তবেই সর্বনাশ। তবে সে খুব শক্ত লোক। মারধরকে সে মোটেই পরোয়া করে না। মহেশের কাছ থেকে সে টাকাও খেয়েছে বিস্তর। ভবিষ্যতে আরও টাকা পাবার একটা চুক্তিও মহেশের সঙ্গে তার হয়েছে। কি ভাবে কি হয়েছে ইত্যাদি তথ্য শুধু যে প্রসন্নই সংগ্রহকরেছে তা নয়। দেবেন্দ্র শচীন্দ্রর কাছেও সে সব তথ্য যথাসময়েই পৌঁছেছে। গ্রামের বিশিষ্ট পরিবার বলে তাদেরও কিছুটা প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। এখন অভয়ের কথাবার্তার মধ্যেই মহেশের বাঁচন-মরণ নির্ভর করছে। তবে একটা ভরসা এই যে প্রসন্নদাদা পিসীর অনুরোধে তার সিদ্ধান্ত পালটে নিয়েছেন। মহেশকে বাঁচানোর জন্যই এখন তিনি তদ্বির তদারক করবেন। প্রসন্নদাদা একে ঝানু উকীল আবার থানার দারোগা পুলিশের সঙ্গেও তার ভাল আতাঁত আছে। এখন প্রসন্নদাদাই একমাত্র ভরসা। এদিকে রোগীণীদের অবস্থাও এখন যায় তখন যায়। দেবেন্দ্র-শচীন্দ্রের এখন পাগল হওয়ার মত অবস্থা।

মহেশের মানসিক অবস্থাও অবর্ননীয়। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে হত্যা করতে গিয়ে সে মা মাসীর হন্তারক হল। আর একটু ভেবেচিন্তে আটঘাট বেঁধে কাজটা করা উচিত ছিল। সে মাতৃহত্যার পাপে পাপী। এর উপরে আছে জন্মদুঃখিনী সরলা স্নেহশীলা ছোটমাসী। কি কুক্ষণেই যে মহেশ এই কাজে হাত দিয়েছেল তা এখন ভেবে পাচ্ছে না। কত কাঁচা কাজ যে সে করেছে, এখন সে বুঝতে পারছে। কিন্তু তখন যে কেন মাথায় এসব চিন্তাগুলো আসেনি তা ভেবে এখন নিজের উপরই রাগ হচ্ছে। নিজেকে নিজেই ধিক্কার দিচ্ছে। অথচ তার এই নিদারুণ সমস্যা নিয়ে কারোর সঙ্গে পরামর্শ করার এতটুকু উপায় নেই। মা মাসীর জন্য তার হৃদয়ে অনুতাপের আগুন জ্বলছে। এর উপর এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে তার পুলিশের হাতে ধরা পড়ার বিলক্ষণ ভয় আছে। ব্যাপারটা মোটামুটি

জানাজানি হয়ে গেছে। গ্রামের লোক সবাইতার দিকে সন্দেহের ও ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। মুখে কিছু না বললেও এসব স্পষ্ট বুঝা যায়। ঐ দুর্দান্ত প্রসন্নটা জল ঘোলা করেছে বলেই ঘটনাটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তাদের পরিবারের ব্যাপারে প্রসন্ন যে নাক গলাতে আসবে তা মহেশ ভাবতেই পারেনি। আসলে তার ভাগ্যই খারাপ। শৈলর জন্য তার অপমানত কম হল না। এখন প্রাণমান দুইই যাবার অবস্থা হয়েছে। মৃত্যুপথযাত্রিনী গঙ্গা যে সত্য ঘটনা জেনেছেন এবং মহেশকে বাঁচানোর জন্য যে প্রসন্নকে অনুরোধ করেছেন, মহেশ তা জানে না। তাই প্রসন্নকে নিয়ে তার চিন্তার সীমা নেই। এখন ভরসা একমাত্র দেবেন্দ্র। সে ব্যাপারটা জেনে শুনেও সত্যটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। দেবেন্দ্র উচ্চ মনের মানুষ একথা স্বীকার করতেই হয়। যে তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে, তাকেই বাঁচানোর জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। দেবেন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠে। মহেশের মনটাই কি এরূপ নীচ ছিল? তার মনে কি উদারতা ছিল না?দেবেন্দ্রের প্রতি কি তার স্নেহ ছিল না? সবই ছিল। কিন্তু তার হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলো নষ্ট করে দিয়েছে ঐ ডাকিনী শৈল। এই দুঃসময়েও শৈলর প্রতি প্রতিশোধস্পৃহায় তার বুকের রক্ত টগবগ করে। এমন অবস্থায় কোন মানুষই স্বাভাবিক থাকতে পারত না। শুধু মহেশের মত মানুষ বলেই এই ভীষণ অন্তর্দহন চেপে রাখতে পারছে। এদিকে অভয়টা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। পুলিশের মারের চোটে সে যদি আসল কথা বলে দেয়, এ নিয়েও আছে দারুণ উৎকণ্ঠা। অভয় অবশ্য ধরা পড়লেও মহেশের নাম বলবে না এমন কথা দিয়েছিল। এজন্য অভয়কে সে অনেক টাকা দিয়েছে। অভয় অপরাধ জগতের মানুষ। অনেকবার সে পুলিশের হাতে মার খেয়েছে, জেল খেটেছে। কিন্তু তার স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। খুবই শক্ত লোক সে। টাকা পেলে সে সব করতে পারে। কাজেই মারপিট করে যে পুলিশ তার কাছ থেকে কথা আদায় করতে পারবে এমন মনে হয় না। এমনিতে কানাঘুঁষোয় জানাজানি হলেও কোন প্রমাণ না পেলেতো তাকে পুলিশ নাগালের মধ্যে পাবে না। কিন্তু চিন্তা হচ্ছে ঐ প্রসন্নটাকে নিয়ে। আসল দোষীকে হাতেনাতে ধরে তার উপযুক্ত শাস্তির জন্য নাকি সে উঠে পড়ে লেগেছে। পিসীদের জন্য নাকি তার দরদ উথলে উঠেছে। সব গোষ্ঠী মিলে পিসীদের বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করার সময়, জাল দলিল করে সম্পত্তি ঠকিয়ে নেওয়ার সময় কোথায় ছিল এই দরদ? সবই মহেশের কপাল। তবে যদি সে এ যাত্রায় রক্ষা পেয়ে যায়, তবে সেও

এই ধূর্ত প্রসন্নটাকে দেখে নেবে। মোটেই ছেড়ে দেবে না। বুদ্ধিতে সেও প্রসন্নর চেয়ে মোটেই কম নয়। এসব নানা চিন্তার মধ্যেও ধরা পড়ার আতংকটা তার মনকে ঘিরে থাকে। বাইরে অবশ্য তার এই উৎকণ্ঠার প্রকাশ ঘটেনা। শোককাতর মুখ নিয়ে সে সবসময় মা মাসীর শয্যাপার্শ্বে বসে থাকে। বোমা ফাটার চতুর্থ দিনে বিকাল সাড়ে চারটায় নবদুর্গা মারা গেলেন। তার দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটল। আর তার এই অপমৃত্যুর জন্য নিমিত্ত হয়ে রইল বোনপো মহেশ। পাশাপাশি শয্যায় শায়িত থেকেও গঙ্গামণি নবদুর্গার মৃত্যুর ব্যাপারটা টের পেলেন না। কারণ সে সময়ে তার চেতনা ছিল না। অতি সন্তর্পনে গঙ্গার পাশের শয্যা থেকে নবদুর্গার মৃতদেহ বাইরে নিয়ে আসা হল। মেয়েরা যাতে শব্দ করে না কাঁদে এজন্য দেবেন্দ্র শচীন্দ্র সতর্ক রইল। কারণ কান্না শুনলে গঙ্গার হার্টফেল হতে পারে। এসব ব্যাপারেও মহেশের কোন ভুমিকা নেই। বাইরে এসে মাসীর মৃতদেহের পাশে সে করুণ মুখে নীরবে বসে রইল। গুণমণির প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল। আর্ত চীৎকার বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তাই নিরুপায় গুণ মুখে গামছা বেঁধে নবর মৃতদেহের উপর পড়ে আছাড় পিছাড় করতে লাগলেন। সে এক দৃশ্য। বর্ণনার অতীত। বাইরের চাপা গণ্ডগোল অস্পষ্টভাবে আচ্ছন্ন গঙ্গার কানে যাচ্ছিল এবং তার চেতনাও ধীরে ধীরে ফিরে আসছিল। মায়ের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল শচীন্দ্র। গঙ্গা চোখ খুললেন। কিন্তু পাশের শয্যায় নবকে দেখতে পেলেন না। তার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। শচীন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন,"নব কোথায়?" শচীন্দ্র বলল, "তোমাদের শরীর বেশী খারাপ বলে ছোটমাসীকে পাশের ঘরে নিয়ে গেছি।" একটা কান্নার ভাব ফুটে উঠল মৃত্যু পথযাত্রিনী গঙ্গার মুখে। বললেন, "মিথ্যে বলিস না আমি বুঝে গিয়েছি, নব চলে গেছে।" বলেই তিনি চোখ বন্ধ করলেন। বন্ধ চোখ থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। তারপর স্বগতোক্তির মত বললেন,"তোকে একা ছেড়ে দেব এমন কথাতো ছিল না নব। একটু সময় অপেক্ষা কর বোন, আমিও আসছি।" বলেই চুপ করলেন। শচীন্দ্র আর কিছু বলার মত কথা খুঁজে পেল না। গঙ্গাও আর কোন কথা বললেন না,তার বন্ধ চোখও আর খুলল না, দ্রুত তার অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল। ঠিক সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গামণি ইহজগতের সব বন্ধন ছিন্ন করে একান্ত স্নেহের বোন নবর অনুসরণ করলেন। গঙ্গামণি বালবিধবা ছোটবোনটিকে চিরদিন কাছে কাছে, চোখে চোখে রেখেছেন। মৃত্যুতেও এর ব্যতিক্রম হল না। অল্পসময়ের ব্যবধানে দুইবোনই চলে

গেলেন। কান্নার রোলে সমস্ত বাড়ীখানা যেন ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। এই যুগল মৃত্যুর করুণ দৃশ্য দেখার জন্য সমস্ত গ্রামখানিও ভেঙ্গে পড়ল রায়বাড়ীতে। বাড়ীর লোকের, গ্রামের মিলিত বিলাপধ্বনি আশেপাশের গ্রামের লোকের কানেও পৌঁছে গেল এবং সেখান থেকেও ছুটে আসতে লাগল লোকের পরে লোক। এমন অপকীর্তি, এমন অপমৃত্যু আর কোথাও কি সংঘটিত হয়েছে এই রায়বাড়ী ছাড়া? এতবড় পাপের বোঝা নামাবার কোন স্থান নেই এই বায়বংশের। যারা আসল ঘটনা কিছুটা জানে,তাদের অন্তর ছি ছিক্কারে ভরে উঠল।

রাজচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যা চলেছেন শ্মশানের পথে। রাজচন্দ্রের সাধের দৌহিত্র তার কন্যাদের কি ভীষণ করুণ মৃত্যু উপহার দিয়েছে, স্বর্গবাসী রাজচন্দ্র তা জানতে পারলে নিশ্চয়ই স্বর্গে বসেও অশ্রুপাত করবেন। শ্মশানের পথে কান্নার রোল আরও বর্দ্ধিত হল। এমন মৃত্যু এ গ্রামে কেন পাঁচ গাঁয়ের কোন লোকই কোনদিনই দেখেনি, এমন কান্না কেউ কোনদিন কাঁদেনি। চেনা অচেনা কত লোক যে সামিল হল এই কান্নায়, এই মহাযাত্রায়, তার হিসেব করা যায় না। গঙ্গামণি ও নবদুর্গা বাঁশের মাচায় শুয়ে, মানুষের কাঁধে চড়ে চলেছেন পাশাপাশি। গঙ্গা মায়ের মৃত্যুলগ্নে মাকে কথা দিয়েছিলেন যে নবকে কখনও কাছছাড়া করবেন না। কথা রেখেছেন গঙ্গা। শুধু জীবনে নয়, মরণেও নবকে তিনি সঙ্গে নিয়েই চলেছেন। হৈমবতী কি স্বর্গে বসে দেখতে পাচ্ছেন ঘটনাটা? কথা রেখেছে বলে গঙ্গাকে কি তিনি আশীর্বাদ করছেন?

ধীরে চলেছেন অনন্তপথের দুই যাত্রিনী। পিছনে ধীরে চলেছে ক্রন্দনমুখর মহামিছিল। এই ভীষণ মৃত্যু দেখে কাঁদল সবাই। মানুষ কাঁদল,পশু কাঁদল, পাখী কাঁদল,আকাশ কাঁদল, বাতাস কাঁদল, পৃথিবী কাঁদল। কাঁদল না শুধু একজন। সে দেবেন্দ্র। তাকে বাঁচাতে গিয়েই তো মা মাসী প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু সেই ভীষণ মূহুর্তে তার সর্ব ইন্দ্রিয়ই যেন বিকল হয়ে গেল। চক্ষু তার অশ্রু ঝরাল না। হৃদয় তার বেদনায় মথিত হল না, কণ্ঠ তার আওয়াজ ফুটাল না,দেবেন্দ্র পাথর হয়ে গেল। অথচ সেই সবচেয়ে বেশী কাঁদতে চেয়েছিল।

বোমার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জোর তল্লাসী শুরু হয়ে গেছে। মা মাসীর জন্য শোক করার সময় নেই। মাথার উপর খাঁড়ার মত ঝুলে রয়েছে সত্য উদঘাটনের ভয়। পুলিশের তল্লাসী কখন কোনদিকে মোড় নেয় এ নিয়ে তিন ভাইয়ের মনেই বিষম দুশ্চিন্তা। এদিকে অভয় পুলিশের কাছে সব সত্য ঘটনা বলে দিয়েছে। শুধু

তাই নয়, কার্য হাসিল হলে আরও টাকা দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি মহেশ তাকে লিখিতভাবে দিয়েছে, মহেশের নিজহাতে লেখা সেই কাগজও সে পুলিশের কাছে দাখিল করেছে। তাই আর রক্ষার উপায় নেই। মহেশ ধরা পড়ে যাবে। দেবেন্দ্র শচীন্দ্র কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একমাত্র ভরসা প্রসন্নর কাছে গঙ্গার অন্তিম অনুরোধ। কিন্তু প্রসন্নদাদাতো সে অনুরোধ নাও রাখতে পারেন। এতবড় অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে কার না বিবেকে বাধে। তাছাড়া ব্যাপারটা যেভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে সেটা সামাল দেওয়াও বড়ই কঠিন ব্যাপার। তবে ভাগ্য অনুকূল হলে সবই হয়ে যায়, প্রসন্ন কিন্তু কথা রেখেছে। পিসীর অন্তিম অনুরোধ স্মরণ করে সে ঘটনা সামাল দেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পুলিশের উপর মহলে প্রসন্নর যথেষ্ট জানাশোনা ও প্রভাব আছে। তার পরামর্শে ও ব্যবস্থাপনায় বিস্তর টাকা ঢেলে অবশেষে পুলিশের মুখ বন্ধ করা হল। এত টাকা খরচ হল যে ঘরের টাকায় কুলাল না। কালীর চরের বিশ বিঘা উর্বর জমি জলের দরে বিক্রী হয়ে গেল। মহেশ অভয়কে কার্য হাসিলের পরে টাকা দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি পত্র লিখে দিয়েছিল,প্রসন্ন সেই কাগজ পুলিশের উপর মহলে পৌছতে দিল না। পর্যাপ্ত টাকা দিয়ে বড়দারোগার কাছ থেকে সেই কাগজ হস্তগত করে ছিঁড়ে ফেলে দিল। প্রসন্নর অক্লান্ত চেষ্টায় এবং বিস্তর টাকার জোরে মহেশ ধরা পড়তে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল না। সমস্ত দায়টাই পড়ল অভয়ের ঘাড়ে। হয়ত এটা গঙ্গার আত্মার আশীর্বাদ।

বিচার বস্তুটাও অনেক সময় প্রহসনে পরিণত হয়। সমাজের নীচুতলায় যাদের অবস্থান বিচারে তাদেরই সাজা হয়। আর সমাজের উঁচুতলার লোকেরা বিশেষ ধরণের অন্যায় অপরাধ করলেও বিচারে তারা রেহাই পেয়ে যায়। ভদ্রলোকের ভদ্রবুদ্ধির সঙ্গে স্থূলবুদ্ধির ছোটলোকেরা কোনমতেই এটে উঠতে পারে না। তাছাড়া অর্থও প্রভাব প্রতিপত্তির জোরও ভদ্রলোকেরই বেশী। এক্ষেত্রেও তাই হল। ছোটলোক অভয়ের সাজা হল আর নাটের গুরু হয়েও মহেশ পার পেয়ে গেল।

অভয় যেহেতু স্বীকার করেছে যে সেই দেবেন্দ্রর ঘরে বোমা রেখেছে, তখন শাস্তিত তার প্রাপ্যই। কিন্তু কার প্ররোচনায় সে কাজটা করেছে এসব ব্যাপার দিব্যি ধামাচাপা পড়ে গেল। বাদী দেবেন্দ্র ভাইকে নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্য জোর বিবৃতি দিল, দেবেন্দ্রর বক্তব্য হল রায়দের কালীরচরের জমির ভাগচাষী

ছিল অভয়। কিন্তু ফসল নিয়ে ভাগচাষী অভয়ের সঙ্গে তাদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল। অভয় দাগী আসামী। নাশকতা মূলক কাজে তার জুরি নেই। তাই সে দেবেন্দ্রকে খুন করে মহেশকে ফাঁসিয়ে দেবার মতলবে একাজ করেছে। অভয়ের উপদ্রবের ভয়ে রায়রা কালীর চরের উর্বর জমি জলের দরে বেচে দিতে বাধ্য হয়েছে।

দেবেন্দ্রের পক্ষে সাক্ষীসাবুদের অভাব হল না। টাকার বিনিময়ে অনেক মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করা হল। ঝানু উকীল প্রসন্ন দেবেন্দ্রের পক্ষে সওয়াল করল। ফলে দেবেন্দ্র মামলা জিতে গেল। অভয় এবং তার সাগরেদরা দোষী সাব্যস্ত হল এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে অপরাধের তুলনায় শাস্তি কমই হল। কারণ এক্ষেত্রে অপরাধীর ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হল না। কিন্তু এও প্রসন্নরই কারসাজি। কারণ প্রসন্নতো জানে আসল অপরাধী কে? অভয়তো যন্ত্রমাত্র। শুধু পিসীর অন্তিম অনুরোধ রাখতে গিয়ে তাকে এই অন্যায় কাজটা বিবেকের বিরুদ্ধে করতে হয়েছে। কাজেই নিজের বিবেক কিঞ্চিৎ সাফ রাখার জন্যই সে অপরাধের তুলনায় অভয়ের লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। প্রসন্নর ক্ষমতা অপরিসীম। হাকিম পর্যন্ত রায় লিখতে গিয়ে গোপনে প্রসন্নর পরামর্শ গ্রহন করে থাকেন। কাজেই প্রসন্ন অভয়ের লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীতে মিথ্যার শক্তি বোধ হয় সত্যের চেয়ে অনেক অনেক বেশী। তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সত্য মিথ্যার চাপে মাথা তুলতে পারে না।

এই বোমার মামলায় অভয় পুলিশের হাতে চূড়ান্তভাবে নিগৃহীত হল এবং বিচারে তার দীর্ঘমেয়াদী জেল হল। আর রায়রা প্রকাশ্য কলঙ্ক থেকে অব্যাহতি পেল বটে কিন্তু তাদের অর্থভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। গ্রামে তাদের সামাজিক মর্যদাও অনেক নীচে নেমে গেল। পিসীর অন্তিম অনুরোধ রক্ষার দায়ে প্রসন্ন মহেশকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে আনলেও পরবর্তী সময়ে তার মন ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় বিষিয়ে উঠল এবং রায়দের সঙ্গে মোটেই সংশ্রব রাখল না। রায়পরিবারের এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় শুধু মহেশ নয়। গোটা রায়পরিবারের প্রতিই সে এবং তার পরিবারের সবার মন ঘৃণা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। রায়পরিবারে কোন মানুষই নেই। মহেশ পাষণ্ড, আর দেবেন্দ্র শচীন্দ্রতো ক্লীব। তাদের এই ঘৃণা বিতৃষ্ণা ধীরে ধীরে শত্রুতায় পর্যবসিত হল এবং তাদের প্রভাবে গ্রামের অন্যরাও প্রভাবিত হতে লাগল। শুধু এইটুকু যথেষ্ট নয়, এই বোমার ঘটনাকে কেন্দ্র করে

ভবিষ্যতের জন্য রায়দের ভাগ্যে অনেক রকম দুঃখ বিপর্যয় জমা হতে থাকল।

রায়দের পারিবারিক এই কেচ্ছাকাহিনী কানাঘুঁষোয় গ্রামের অনেকেই জেনে ফেলেছে। প্রকাশ্যে কেউ কিছু না বললেও ভদ্রশ্রেনীর লোকেরা তাদের খুবই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। সবাই মিলে তাদের একঘরে করবে এমন ঘোঁট পাকানোও চলছে। প্রসন্ন ও তার পরিবারের লোকেরা আগের মতই শত্রুতার নানা ছুঁতো খঁজছে। উড়ে এসে জুড়ে বসা এই জঘন্য রায়পরিবারকে নীলগঞ্জ গ্রাম থেকে উৎখাত করার জন্য তারা ফিকির আঁটছে। তাই প্রজাদের উসকে দিয়ে নানা অবাঞ্ছিত মামলা মোকদ্দমাশুরু করে তারা রায়দের ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। এমন কি গুনমণিকে পর্যন্ত তারা এই দুরাচারী বোনপোদের সংশ্রব ছেড়ে তাদের কাছে চলে যাবার পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু গুনমণি তাদের পরামর্শ কানে তোলেন নি। এই দুর্দিনে তিনি কি বোনপোদের ছেড়ে যেতে পারেন? গুনমণির ঠাঁই সবত্রই আছে। ভাইপোদের কাছে কেন? শ্বশুরবাড়ীতেই তো দেবর ভাশুরের ছেলেরা সবাই তাকে মাথায করে রাখতে চায়। কাজেই গুণ ওদের কথায় পাত্তা দেননি।

সদ্যসংঘটিত দুর্ঘটনা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা,অর্থহীনতা ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে রায়পরিবার বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া মনের দিক থেকেও অশান্তি যথেষ্টই আছে। যে কাজ মহেশ করেছে তারপরতো দেবেন্দ্রের তার সঙ্গে একত্রবসবাস করা উচিতই নয়। শৈলও মহেশের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার জন্য উদগ্রীব। মামলার রায় হওয়ার পরে প্রসন্নদাদাও তাকে মহেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কিন্তু দেবেন্দ্র তাঁর পরামর্শ না শোনায় তিনি যে খুব বিরক্ত তাও বুঝতে পারে দেবেন্দ্র। কিন্তু পরিস্থিতিটা এমনই জটিল যে দেবেন্দ্র ঠিক নিজের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। আর বিপন্ন মহেশও দেবেন্দ্রকেই আঁকড়ে ধরেছে। দেবেন্দ্র সরে গেলে এই মুহূর্তে তার টিকে থাকা দায় হবে। তাই এতসব ঘটনার পরেও দেবেন্দ্র প্রাণঘাতী ভাইকে আগলে আছে। বাহ্যিক আন্তরিক উভয়দিকেই দেবেন্দ্রের এক অসহনীয় অবস্থা। পারিবারিক এসব ঝামেলা শচীন্দ্রকে ততটা স্পর্শ করতে পারে না। কারণ তার দূরে থাকার সুবিধা আছে। অথচ এতবড় ঘটনার পর দেবেন্দ্রেরই তো সরে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সে তা পারছে না। স্বজন যদি দুর্জন হয়, তাকে ফেলে দেওয়ার কথা দেবেন্দ্র চিন্তা করতে পারে না

তার মানসিক গঠনটা সাধারণ মানুষের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের বলেই সে এভাবে জড়িয়ে পড়ে চূড়ান্ত কষ্ট ভোগ করছে। এটাই তার চরিত্র ও বিধিলিপি। যে যাই বলুক্ পরিস্থিতিটা একটু স্বাভাবিক না হলে দেবেন্দ্রের পক্ষে সরে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রবৃত্তি অনুসারে মহেশ তার কাজ করেছে। শচীন্দ্রও ঝামেলা এড়িয়ে নিজের শান্তি বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছে। ওরা যা পারে দেবেন্দ্র তা পারে না। । এটাই দেবেন্দ্রের জীবনে চরম ট্রাজেডী।

অভয় নমঃ জেলের ঘানি টানছে। পুলিশের হাতে শারীরিক নির্যাতনও তার যথেষ্ট হয়েছে। এতে তার দুঃখ নেই। অপরাধ করলে সাজাতো হবেই। কিন্তু সে পুলিশের কাছে সত্য কথাই বলেছিল। কিন্তু তার সত্য কথার যে কোন মূল্যই রইল না, এটাই তার দুঃখ ও রাগের কারণ। মিথ্যার জোরে আসল অপরাধী কেমন পার পেয়ে গেল। এটাকে কি বিচার বলে? তবে অভয় মোটেই ছেড়ে দেবে না। সঠিক বিচারটা সে নিজেই করবে। জেলের ভিতর বসে বসে সে রাগে ফুঁসছে। জেল থেকে বেরিয়েই সে বিচারটা করবেতো ছাড়বে। এতে যদি তাকে আবার,পুলিশ ধরে এনে ফাঁসীকাঠেও ঝুলিয়ে দেয়, তাতেও তার কিছুই এসে যাবে না। জন্মালে মরতে তো একদিন হবেই। মরণকে অভয় মোটেই ভয় পায় না। তবে অন্যায় অবিচারের প্রতি শোধটাতো সে নিয়ে যেতে পারবে। সে ছোটজাত, অপরাধমূলক কর্ম তার পেশা। ভদ্দরলোক বাবুদের মত বিদ্যেবুদ্ধি তার নেই। তবে তার হিম্মৎ আছে। পাথর কালো তার গায়ের রং, লোহার মত শক্ত তার শরীর, আর মনটাও তার পাথরের মতই শক্ত। ভয় কাকে বলে সে জানে না। আর বয়সেও সে নবীন। সে মারতেও পারে, মরতেও পারে। অপরাধ জগতে সে বিচরণ করে। তাই তথাকথিত ন্যায়নীতিবোধ তার নেই। সে ভাড়াটে গুণ্ডা। অন্যের কার্য হাসিল করে দিয়ে সে দু'পয়সা কামায়। এতে তার পাপটা কোথায়? তার নিজের মত করে তারও একটা নীতিবোধ আছে। অবশ্য প্রত্যেক মানুষেরই তা থাকে। পুলিশের কাছে সে যে সত্য কথাটা বলে দিয়েছিল, সেটা মোটেই মার খাওয়ার জন্য নয়। মেরেপিটে কেউ তার কাছ থেকে কথা আদায় করে নেবে, এমন আদমী সে নয়। অমন মারধোরকে সে পরোয়াই করে না। টাকার বিনিময়ে সে কাজ করে। তাই টাকার জন্যই সে মহেশঠাকুরের কাজটা হাতে নিয়েছিল। কিন্তু তার কৃতকর্মের ফলটা যে মাঠাকুরুণদের পেতে হবে তা সে জানত না। একই ঘরে যে মাঠাকুরুণদেরও বাস, একথা মহেশঠাকুর তাকে আগে বলেনি।

আগে জানলে সে কর্ম্মটি করতো না। সে খুনখারাবি করে, মানুষের ঘরে আগুন লাগায়, আরও অনেক কিছুই করে কিন্তু সে কখনও অবলা জীব স্ত্রীলোকের উপর কোন হামলা করে না। স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করাটা মোটেই যথার্থ মরদের কাজ নয়। অভয় তাই মনে করে। অথচ তারই কর্ম্মের জন্য মাঠাকুরুণদের দশা দেখে তার মনে বড়ই অনুতাপ জেগেছিল। এই অনুতাপের কারণেই সে পুলিশের কাছে সত্য প্রকাশ করেছিল।

দাগী আসামী বলে গ্রামের লোক সবাই অভয়কে এড়িয়েই চলত। কিন্তু রায়বাড়ীর মাঠাকুরুণরা তাকে কেন জানি বড়ই স্নেহের চোখে দেখতেন। সে কোনদিন রায়বাড়ীতে গেলে গঙ্গাঠাকুরুণ তাকে না খাইয়ে ছাড়তেন না। আর নবঠাকুরুণের চেহারাখানাতো ঠিক দুগ্গাপিতীমের মতন। তেনাকে দেখলে দেবতাজ্ঞানে আপনিই মাথাটা তেনার ছিচরণে লুটিয়ে পড়ত। আর টাকার লোভে সে কিনা এমন সোনার পিতীমে মাঠাকুরুণদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল। অনুশোচনায় দগ্ধ অভয়ের নিজের উপরে যেমন রাগ হল তেমনি রাগ হল মহেশঠাকুরের উপর। মহেশঠাকুর কেন যে নিজের সাধুসন্ত নিরীহ ভাইকে খুন করতে চাইল, তা আজও তার মাথায় আসছে না। অবশ্য কে কি জন্য কি করে এটা তার ভাবার ব্যাপার নয়। টাকা পেয়ে কার্য হাসিল করে দেওয়াই তার কাজ। এখানেও সে তাই করেছিল। কিন্তু ফল অন্যরকম হয়ে যাওয়ায় অনুতপ্ত অভয় মহেশঠাকুরের এই হীনকাজের সাজা হওয়ার জন্য সে পুলিশের কাছে সত্য কথা বলেছিল। কিন্তু ফল হল উল্টো। যে দেবেন ঠাকুরের ভালর জন্য সে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গল, সেই দেবেন ঠাকুরই সব জেনে শুনেও ভাইকে বাঁচানোর জন্য ঝুরিঝুরি মিথ্যে বলে তাকেই ফাঁসিয়ে দিল।

দেবেন ঠাকুরতো সাধুসন্ত মানুষ। তাকে দেখলেই অন্তরে কেমন একটা ভক্তি-ছেদ্দার ভাব জাগে। সাত বছর নিরুদ্দেশ থেকে দেবেনঠাকুর অনেক ধম্মকম্ম করে এসেছে। তাই গ্রামের অন্যান্য মানুষের মত অভয়ের মনেও দেবেনঠাকুরের প্রতি খুবই ভক্তিছেদ্দার ভাব ছিল। কিন্তু এখন দেবেনঠাকুরের ব্যবহারে তার মনে সেই ভক্তিভাবতো নেইই- বরং ঘৃণা বিতৃষ্ণার ভাব জেগে উঠেছে। সাধুমানুষ হয়ে দেবেনঠাকুর কিভাবে এত মিথ্যে কথা বলতে পারল সে ভেবেই পায় না। আসলে দেখতেই দেবেনঠাকুর সাধুসন্তের মত ভিতরে ভিতরে মস্ত শয়তান। সাত বছর নিরুদ্দেশ থেকে ধম্মকম্ম করেছে না ডাকাতি করে বেড়িয়েছে, সেটাই বা

জানছে কে? অভয় এখন দেবেনঠাকুরের চরিত্তিরটা ঠিক ধরে ফেলেছে। দেবেনঠাকুর শুধু শয়তানই নয়, একটা হদ্দ ছেঁচড়া। যে তোকে খুন করতে চেয়েছিল, তাকেই তুই তোয়াজ করছিস্। সাধু হয়ে তোর নিজের খুনী ভাইকে বাঁচানোর জন্য ঝুরি ঝুরি মিথ্যে কথা বলছিস্। তোকে দেখলেতো মনে হয়, স্বপ্ন থেকে স্বয়ং ভগবান বুঝি নেমে এয়েছেন। কিন্তু ভিতরে যে তোর মধ্যে একটা আস্ত শয়তান থানা গেঁড়ে বসে আছে তা টেরই পাওয়া যায় না। তাছাড়া মানুষ হিসাবেও দেবেনঠাকুরটা মেয়েমানুষেরও অধম। পুরুষের রক্ত যদি ছিটেফোঁটাও থাকত ওর শরীরে, তবে কি এতবড় অন্যায়টা সে এভাবে ছেড়ে দিত? অবশ্যই বদলা নিত। অবশ্য দেবেনঠাকুর কেন, বেশীর ভাগ ভদ্দরলোকেই যেন আধা মেয়েমানুষ। দুবলা জীব মেয়েমানুষ যেমন বলের অভাবে বাঁকাপথে চলে ভদ্দরলোকদের চলনটাও তেমনি। তবে মহেশঠাকুরটার যত দোষই থাক, হিম্মৎ আছে। শত্রু ভাইকে সে সোজাসুজি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। কোন বাঁকাপথ ধরেনি। অবশ্য ভদ্দলোকদের স্বভাবচরিত্তির নিয়ে তার এত ভাবাভাবির কোন দরকার নেই। তার এখন সবচেয়ে বেশী রাগ ঐ মেনিমুখো মিথ্যুক দেবেনঠাকুরটার উপর। জেল থেকে বেরিয়েই সে ওটাকে নিকেশ করে দেবে। খুনি ভাইয়ের প্রতি পীরেতের ফলটা তাকে পেতেই হবে। দেবেনঠাকুরকে খুন করে যদি তার ফাঁসীও হয়, তাতে তার এতটুকু দুঃখ হবে না। অভয় নমঃ আর যাই হউক, খাঁটি মরদ। খাঁটি মরদের মরণ-ভয় থাকে না।

বোমার দুর্ঘটনায় রায়দের মানসিক, আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক অনেক ক্ষতি যেমন হল, তেমনি তাদের সামাজিক মানও অনেক নীচে নেমে গেল। গ্রামের লোক তাদের খুব হেয় চোখে দেখতে লাগল। তাছাড়া অভয়ের দলবল রায়দের উপর প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে উঠল। আজ রায়বাড়ীর গোয়াল থেকে গরু চুরি হয়, কাল ক্ষেতের ফসল জোর করে কেটে নেওয়া হয, কোনদিন বা রায়দের খড়ের গাদায় আগুন লাগে, কোনদিন বা তাদের টিনের চালে দুমদাম শব্দে অনবরত ঢিল পড়ে। তাছাড়া দেবেন্দ্রের প্রাণনাশের চেষ্টাও চলে। চোস্ত লাঠিয়াল আলতাফ মিঞাকে সঙ্গে নিয়ে তাকে চলাফেরা করতে হয়। একা চললে তার উপর হামলা হতে পারে। এত সতর্কতার মধ্যেও একদিন সন্ধ্যার পরে স্টেশন থেকে বাড়ী আসার পথে অন্ধকারে আচমকা কে যেন দেবেন্দ্রের মাথা লক্ষ্য করে লোহার ডাণ্ডা তুলে ধরে। লাঠিয়াল আলতাফ মিঞা তড়িৎগতিতে ডাণ্ডা ধরে ফেলে

এবং অল্পের জন্য দেবেন্দ্রের প্রাণ রক্ষা হয়। এসব উপদ্রবের জন্য ফৌজদারী মামলা লেগেই থাকে। ফলে অর্থব্যয় ও হয়রানি দুইই হয়। এসব কার্যকলাপের পিছনে প্রসন্নদের মদত আছে। এরকম নিত্য উপদ্রব পেতে পেতে অসহ্য হয়ে রায়পরিবার হয়ত নীলগঞ্জ ছেড়ে তাদের স্বগ্রামে ফিরে যাবে। রায়দের গ্রাম থেকে উৎখাতের উদ্দেশ্যেই এ ধরনের নিত্য উপদ্রব করা হচ্ছে।

সামাজিক দিক দিয়েও রায়দের হেনস্তার অন্ত নেই। সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজ তাদের একঘরে করেছে। মজুমদারদের দুর্গামণ্ডপে ব্রাহ্মণদের এক সভায় সাব্যস্ত হয়েছে যে গ্রামের ব্রাহ্মণদের কোন উৎসব অনুষ্ঠানে রায়দের নেমতন্ন করা হবে না এবং রায়বাড়ীর কোন অনুষ্ঠানেও ব্রাহ্মণরা তাদের বাড়ীতে পাত পাড়বে না। এ ব্যাপারে গ্রামের সব ব্রাহ্মণরাই যে একমত ছিল তা নয়। কিন্তু মজুমদারদের চাপে সবাইকে এটা মেনে নিতে হয়েছে। গ্রামের অব্রাহ্মণ হিন্দুরাও মজুমদারদের প্রভাবে ও ভয়ে রায়বাড়ীতে বিশেষ ঘেঁষে না। শুধুমাত্র গ্রামের মুসলমান প্রজারা বুক দিয়ে রায়দের রক্ষাণাবেক্ষণ করছে এবং তাদের আন্তরিক সহযোগিতাতেই রায়রা গ্রামে টিকে আছে। বাইরে যেমন উপদ্রব অশান্তি, অপমান তেমনি রায়পরিবারের ভিতরেও শান্তির লেশমাত্রও নেই। থাকার কথাও নয়। একমাত্র মহেশের কারণে পারিবারিক বিশ্বাস ভালবাসা বিনষ্ট হয়ে গেছে। এবারের ঘটনার জের মা মাসীর উপর দিয়ে গেলেও ভবিষ্যতে যে দেবেন্দ্রের জীবন আবার আত্মজনের দ্বারা বিপন্ন হবে না তার বিশ্বাস কি! বাড়ীতে যে যার মত হাল ছেড়ে বসে আছে। মহেশের মানপ্রাণ বাঁচানোর জন্য দেবেন্দ্র এতটাই ব্যতিব্যস্ত ছিল যে নিজের কথা ভাবার অবকাশ পায়নি। এখন সে ঝামেলা চুকে যাওয়ায় সে সব কিছুই ভাবতে পারছে। কাজেই সংসারের সব ব্যাপারেই সে এখন একান্ত নিস্পৃহ ও উদাসীন। এ সংসারে আর মূহুর্তও তার থাকার ইচ্ছে নেই। কিন্তু এমনই একটা পারিবারিক ব্যারিকেড় যে সে সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যেতেও পারছে না। শচীন্দ্র এমনিতেই আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। তাই যথাসম্ভব সে ঝামেলা এড়িয়েই চলে। তাছাড়া সে এখানে থাকে না বলে এই নিত্য ঝামেলা তাকে স্পর্শ করে না। তবে মহেশ যেমন ঝামেলা সৃষ্টি করেছে। তেমনি অসাধারণ ধৈর্যের সঙ্গে একা সবরকম প্রতিকূলতার মোকাবিলা করছে। লোকচক্ষে পারিবারিক এই ভাঙ্গন প্রকাশের সে কোন সুযোগ দিচ্ছে না।

মামাসীর শ্রাদ্ধ শান্তির কিছুদিন পরেই অন্তঃসত্ত্বা শৈলকে দেবেন্দ্র বাপের

বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। শৈলর এ অবস্থায় তার বাপের বাড়ীতে তাকে দেখাশোনার মত কোন লোক নেই। কিন্তু ভাগ্যগুণে শৈলর এক দূরসম্পর্কের পিসী এসেছেন পিতৃমাতৃহীন ভাইপোদের একটু গুছিয়ে দেবার জন্য। শৈলর এই পিসীর আপাততঃ সংসারে কোন দায় নেই। বউ ছেলে নিয়ে তার জমজমাট সংসার। তিনি ধনীর গৃহিণী। তবু এই দূর সম্পর্কের ভাইটির প্রতি তার বরাবরই খুব টান ছিল। তাই তিনি ভাইয়ের অর্বতমানে ভাইপোদের দেখাশোনার জন্য এসেছেন। শৈলর শ্বশুরবাড়ীর এই বিপদের কথা শুনে তিনিই ভাইপোকে পাঠিয়ে শৈলকে নিজের কাছে আনিয়ে নিয়েছেন। এতে দেবেন্দ্র শৈল সম্বন্ধে খুবই নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। ঈশ্বর যেমন বিপদ দেন, তেমনি বিপদ উদ্ধারের জন্য লোকও জুটিয়ে দেন। নইলে শৈলর এই পিসীরতো এখন শৈলদের বাড়ীতে আসার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাছাড়া এই যে মহেশ পিতৃতুল্য বড়ভাই হয়ে তার প্রাণনাশের উদ্যোগ নিয়েছিল, এটাওতো নিশ্চয়ই ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট। নইলে মহেশ ভাই হয়ে এমন নির্ম্মম নিষ্ঠুর কাজে প্রবৃত্ত হবে কেন? সবই আসলে ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হয়। মানুষ নিমিত্তমাত্র। দেবেন্দ্রের যদি এধরনের ঈশ্বর বিশ্বাস না থাকত তবে যে ধরনের অন্যায় অবিচার তার উপর হয়েছে, তাতে সে নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যেত।

বাপের বাড়ীতে যথাসময়ে শৈলর দ্বিতীয় পুত্রসন্তানের জন্ম হল। শৈলর পিসী তীর্থের নামের সঙ্গে মিলিয়ে নবজাতকের নাম রেখেছেন পবিত্র। পবিত্রের জন্মের পর শৈলর শরীর খুবই ভেঙ্গে পড়েছে। শিশুটিও খুব দুর্বল হয়েই জন্মেছে। এই দুর্বল শিশুর খুব যত্নের দরকার। শৈল নিজেও সুস্থ নয়, এদিকে পিসীকেও এবার চলে যেতে হবে। আর শৈল বাপের বাড়ীতে আছেও বেশ কিছুদিন ধরে। পিসী চলে গেলে দুই শিশুসন্তান নিয়ে বাপের বাড়ীতে থাকার তেমন সুবিধেও নেই। আর শৈলর থাকার ইচ্ছেও নেই। শ্বশুরবাড়ীর এই জঘন্য পরিবেশে যেতেও সে খুবই অনিচ্ছুক। তাই সে দেবেন্দ্রকে ধরে বসল, যে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এখান থেকে দূরে চলে যেতে। এতে যদি একবেলা খেয়েও থাকতে হয় তাতেও শৈল রাজী। এতবড় ঘটনার পর আর কোন ভরসায় এখানে পড়ে থাকা? সুখে সম্পত্তির আয়ের ভাত খাওয়া বড় না জীবনের নিরাপত্তা বড়? শৈলর যুক্তি অকাট্য। ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার কোন রাস্তা নেই। তাছাড়া দেবেন্দ্রেরও শৈলকে নিয়ে মহেশের সঙ্গে এক পরিবারভুক্ত হয়ে থাকার বিন্দুতম ভরসা বা ইচ্ছে নেই। কিন্তু মুস্কিল হল যে পারিবারিক পরিস্থিতিটা এতই জটিল যে চট করে দূরে কোথাও

চলে যাওয়া যায় না। অথচ শৈলকেও দুইদুইটি শিশুসন্তানসহ বাপের বাড়ীতে ফেলে রাখার মত পরিস্থিতি নেই। দাদা মহেশের স্বভাবচরিত্রের অবশ্য এখন আমূল পরিবর্তন হয়েছে।সেএখন দেবেন্দ্র অন্তপ্রাণ। কিন্তু তবুও ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। স্ত্রীপুত্রের থাকার ব্যাপার নিয়ে দেবেন্দ্র মহাসমস্যায় পড়ে গেল।

শচীন্দ্র এমনিতে পারিবারিক সমস্যায় জড়ায় না বটে, তবে মাঝে মাঝে কোন কোন জটিল সমস্যার সহজ সমাধান করে ফেলে। এক্ষেত্রেও আগ বাড়িয়ে শচীন্দ্রই সমস্যাটার সমাধান করল। ছুটিতে বাড়ী এসেই সে মেজ বউঠানের খোঁজ খবর করল এবং দেবেন্দ্রকে স্পষ্ট করেই বলল,"মেজদাদা এতদিন ধরে যে মেজবউঠানকে তুমি বাপের বাড়ীতে ফেলে রেখেছ তা কি ঠিক হচ্ছে?" দেবেন্দ্র আমতা আমতা করে বলল,"সেতো ঠিকই। কিন্তু শৈলর যে এবাড়ীতে আসার একেবারেই ইচ্ছে নেই, এটাই মুস্কিল।"একথা শুনে শচীন্দ্র একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল, বলল, " সে ইচ্ছে হবেই বা কেন? হওয়া তো মোটেই উচিত নয়। এতসবের পরে কোন বিশ্বাসে, কোন ভরসায় মেজবউঠান আমাদের এই জঘন্য একান্নবর্তী পরিবারে বাস করতে আসবেন? তুমি অন্য ব্যবস্থা কর।" দেবেন্দ্র বলল, "কি যে ব্যবস্থা করব তাই ভেবে পাচ্ছি না। এই শত্রুতা ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমি যদি দূরে কোথাও চলে যাই তবেতো দাদার একার পক্ষে তা সামাল দেওয়া সম্ভব হবে না। তাই আকাশ পাতাল ভাবছি।" শচীন্দ্র বলল,"এত ভাবাভাবির কি আছে? তুমি মহকুমা শহরে বাসাভাড়া করে বউঠানকেনিয়ে থাক। প্রয়োজনে বাড়ী এসে যা করার করবে। আর দাদা তার পরিবার নিয়ে চলে আসুন বাড়ীতে। বাড়ী থেকেই তাকে কোর্টে যাওয়া আসা করতে হবে। যত ঝঞ্ঝাটতো তিনিই পাকিয়েছেন, তাই এটুকু কষ্ট তাকে করতেই হবে। যা তিনি করেছেন, তাতে আমাদের মত ভাই বলেই তিনি পার পেয়ে গেলেন।" দেবেন্দ্র বলল, "দাদাতো রাজী নাও হতে পারেন।" শচীন্দ্র বলল,"সে দায়িত্ব আমার। এখন তুমি এতে রাজী আছ কিনা তাই বল।" দেবেন্দ্র বলল, আমি রাজী থাকব না কেন? এ ব্যবস্থা হলেতো আমি রক্ষা পেয়ে যাই।"

মহেশ কোর্ট থেকে এলে শচীন্দ্র বিনা ভূমিকায় মহেশের কাছে তার প্রস্তাব রাখল। বলল, "দাদা, আপনিতো বেশীর ভাগ বাড়ীতেই থাকেন। তবে শুধু শুধু শহরে একটা বাড়ী ভাড়া করে বড় বউঠানওছেলে পিলেদের ফেলে রেখেছেন কেন। আপনি বাসা উঠিয়ে দিয়ে ওদের বাড়ীতে এসে আপনিস্থায়ীভাবে বাড়ীতে

থাকুন এবং বাড়ী থেকেই কোর্টে যাওয়া আসা করুন। আর মেজদাদা শহরে বাসাভাড়া করে থাকুক। প্রয়োজনে সেখান থেকে এসে বাড়ীর কাজকর্ম করতে কোন অসুবিধা হবে না। মেজদাদার উপর দিয়ে ঝড়ঝঞ্ঝাতো আর কম গেল না। তাই বাড়ী থেকে একটু দূরে থাকা মনের দিক থেকে খুবই দরকার। আর মেজবউঠানই আর কতদিন বাপের বাড়ী পড়ে থাকবেন ? সবদিক ভেবেই আপনাকে একথা বলছি।'' শচীন্দ্র কোনদিন বড়দাদাকে এমন স্পষ্ট কথা বলেনি। মেজবউঠানের যে আর মহেশের সঙ্গে একই বাড়ীতে বসবাস উচিত নয়, তার কথার মধ্যে তেমন একটা প্রচ্ছন্ন ইংগিত ছিল। কিন্তু বুদ্ধিমান মহেশ কথাটা তেমন গায়ে না মেখে বলল,'' এটাতো খুবই ভাল কথা। দেবুর মন যাতে ভাল থাকে সেই ব্যবস্থা করা উচিত। আমি কালই ওদের বাড়ীতেনিয়ে আসবার ব্যবস্থা করব। দেবু যাতে ভাল থাকে, তুই যাতে ভাল থাকিস সেটা করাইতো আমার কর্তব্য।'' শচীন্দ্র মনে মনে বলল,''দেবুর প্রতি আপনি যে কর্তব্য করেছেন, এমন কর্তব্য যেন পৃথিবীতে আর কেউ কোনদিন না করে।'' মুখে বলল,''তবে এই কথাই রইল বড়দাদা। আমি মেজদাদাকেও বাসা ঠিক করতে বলে দেব।'' বলে সে মহেশের ঘর থেকে বেরিয়ে দেবেন্দ্রের কাছে গিয়ে তাকে শহরে বাসা ঠিক করে অবিলম্বে চলে যেতে বলল। শচীন্দ্রের এই ব্যবস্থাপনায় একটা বড় সমস্যার সমাধান হল। শচীন্দ্র মাসী গুণমণিকেও কথাটা জানাল। গুণমণি এখনও শোক সামলে উঠতে পারেননি। তাই কোন কিছুতেই তার কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। শচীন্দ্রের কথা শুনে বললেন,'' আমার মাথার ঠিক নেই। আমি কি বলব। তোমরা যা ভাল বুঝ তাই কর। অবশ্য মেজবউয়ের আর এ বাড়ীতে আসার প্রশ্ন উঠে না। একজনের কারণে সংসারে আজ জীবননাশ, সংসারনাশ, সর্বদিকে সর্বনাশ হল। '' শচীন্দ্র আর একথার কি উত্তর দেবে । সে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

দেবেন্দ্র কিশোরগঞ্জে বাসা ভাড়া করে তীর্থপবিত্রসহ শৈলকে নিয়ে এল। নূতন বাসায় এসে শৈল খুবই খুশী। জীবনে এই প্রথম স্বামী সন্তান নিয়ে নিজের মত করে সংসার করার সুযোগ পেল সে। স্নেহলতা বরাবরই আলাদা থাকে এবং নিজের মত সংসার করে। সরযূও অনেকবারই স্বামী সন্তান নিয়ে আলাদা সংসার পেতেছে। আবার বাড়ীতেও থেকেছে। কিন্তুর শৈলর জীবনে সে সুযোগ আর আসেনি। তাই শৈল খুব খুশী হওয়াই স্বাভাবিক দেবেন্দ্রও বাড়ী ছেড়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। একটা অনাবিল শান্তির পরিবেশ তাদের এই বাসাবাড়ীতে। এমন

শান্তিস্বস্তি দেবেন্দ্র শৈল জীবনে আর কোনদিন পায়নি।

মহেশ এই কিশোরগঞ্জের কোর্টেই ওকালতী করে। সকালে বাড়ী থেকে কোর্টে আসে, কাজ সেরে বিকালে বাড়ী চলে যায়। প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে দেবেন্দ্রের বাসায়ও আসে। কখনও কখনও খাওয়া দাওয়া ও করে। তার ব্যবহার খুবই আন্তরিক। দেবেন্দ্রকে এখন সে মোটামুটি তোয়াজ করেই চলে। এই ভীষণ কুকর্মটা করে মনে হয় তার স্বভাবের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে শৈলর প্রতি তার ব্যবহার আশ্চর্যজনক ভাল । অতীতকে সে যেন একেবারে ভুলে গেছে। শৈলকে এখন সে বৌমা বলে ডাকে। দাদার এই সুমতিতে দেবেন্দ্র বড়ই শান্তি অনুভব করে। তার মনে দাদার প্রতি পূর্বের শ্রদ্ধা ধীরে ধীরে ফিরে আসতে শুরু করে। কিন্তু মহেশের এই সুব্যবহার শৈলর কৃত্রিম বলে সন্দেহ হয়। কিন্তু বুদ্ধিমতী শৈল স্বামীর কাছেও এই সন্দেহের কথা প্রকাশ করে না। মহেশ দেবেন্দ্র হাজার হোক পরস্পরের ভাই। রক্তসম্পর্কিত ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বাস ও ভালবাসা এমনভাবেই জড়িয়ে থাকে যে আঘাতের পর আঘাত আসলেও তা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় না। অবিশ্বাস ও ঘৃণা বিতৃষ্ণার কারণ ঘটলেও পরবর্তীকালে ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটলে তা চাপা পড়ে যায়। মহেশের বর্তমানের প্রিয় আচরণে দেবেন্দ্রের মনে যে তার পূর্ব-আচরণ ধীরে ধীরে চাপা পড়ে যাচ্ছে, শৈল সেটা ভালই বুঝতে পারে। দেবেন্দ্রের দৃষ্টিতো রক্তসম্পর্কের পর্দায় ঢাকা. কিন্তু শৈল রক্তসম্পর্কিত ব্যক্তি নয়। তাই তার দৃষ্টি স্বচ্ছ। তাই মহেশের বর্তমান ভালমানুষীর অন্তরালে নূতন কোন দুরভিসন্ধি লুকিয়ে আছে বলেই সে মনে করে। এজন্য সে মহেশ এলে খুবই সতর্ক থাকে। তাছাড়া এখন সে মহেশ থেকে বেশ নিরাপদ দূরত্বে আছে, তাই ভাবনাচিন্তার প্রয়োজনও তেমন নেই।

বোমার বীভৎস ঘটনার পর প্রায় বছর দুই কেটে গেছে। সময়ের ব্যবধানে সব কিছুই ক্রমে থিতিয়ে যায়। তাই রায়পরিবারে এখন গঙ্গামণি ও নবদুর্গার মৃত্যুর শোকও অনেকটা প্রশমিত। দেবেন্দ্রের মন মানসিকতাও অনেকটা স্থিতাবস্থায় এসেছে। কিন্তু বাইরের উপদ্রব বেড়েই চলেছে। প্রসন্নদের প্ররোচনায় গ্রামের প্রায় সব হিন্দুই রায় পরিবারের শত্রু। এই প্রবল বৈরিতার শক্তহাতে মোকাবিলা করছে মহেশ। তার যেমন বুদ্ধি তেমনি মনের জোর। সে ভেঙ্গে গেলেও মচকায় না। সংসারের যাবতীয় কর্তব্য কর্মে সে যথেষ্ট সচেতন। বুদ্ধিবিভ্রমে পড়ে ভীষণ একটা অপকর্ম করে ফেলে সে যেন এখন একটা ভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে।

তাই পরিবারের সবার মনে তার প্রতি যে ঘৃণা-বিতৃষ্ণা জমেছিল সেটাও ক্রমে ক্রমে অপসারিত হচ্ছে। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা তার অন্তরের সব মালিন্য ধুয়ে মুছে সাফ করে তার মধ্যে যেন একটা শুদ্ধি এনে দিয়েছে। প্রবৃত্তির তাড়নায় ভুল করে একটা মারাত্মক অপকর্ম করেছে ঠিকই। কিন্তু অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে সে এখন পরিশুদ্ধ হয়েছে। সে এখন সবসময়ই শান্ত, ধীর স্থির আর বিশেষ করে দেবেন্দ্রের প্রতি খুবই স্নেহশীল। তাই পরিবারে তার হারানো মর্যাদা ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। গোটা পরিবারটা আবার আগের মতই মহেশ-নির্ভর হয়ে উঠছে।

বাইরে মহেশকে স্থির শান্ত মনে হলেও ভিতরে সে বড়ই অস্থির, মোটেই শান্ত নয়। তার অর্ন্তজগতে চলছে বিরাট আলোড়ন। মহাসাগরের তরঙ্গরাজি নিরন্তর তার বুকে আছড়ে পড়ছে। কত কষ্টে সে যে তার অন্তরের এই বিক্ষোভ ভিতরে চেপে রেখে বাইরে এতটা শান্তভাব বজায় রাখছে, সেটা একমাত্র সেই জানে। তারই কৃতকর্মের জন্য মা মাসীর শোচনীয় মৃত্যুতে তার অন্তর জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। আর বড়ভাই হয়ে সে দেবেন্দ্রকেই বা খুন করতে যাবে কেন? শৈশবে পিতৃহীন ছোট ভাই দুটির প্রতি তার কি কোন স্নেহের অভাব ছিল? কিন্তু তবু সে তার একান্ত স্নেহের কনিষ্ঠ ভাইকে খুনের প্রয়াস নিয়ে মহাপাপের ভাগী হয়েছে। তার এই মহাপাপ প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও বাইরে তার কোন শাস্তি হয়নি বটে। অনুশোচনার যে দুঃসহদহনে সে ভিতরে ভিতরে ছাই হয়ে যাচ্ছে তা কি জেল ফাঁসীর চেয়ে নেহাৎ কম? বিদ্যাবুদ্ধি, বিচার বিবেচনা, বিত্তচিত্ত সব কিছু তার থাকা সত্ত্বেও সে আজ একটা অধঃপতিত জীবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কার জন্য তার এই অধঃপতন? শৈল নামে এক ডাকিনী স্ত্রীলোকের জন্য। শৈল তার জীবনে এক ভয়ঙ্কর দুষ্টগ্রহ। কি কুক্ষণেই না এই দুষ্টগ্রহটা তাদের বাড়ীতে প্রবেশ করেছিল। শৈলর জন্য তার মুখে চুনকালি পড়েছে। মাতৃহত্যার পাপে তার অনন্তনরকের পথ প্রশস্ত হয়েছে। অথচ এই শৈল সতীসাধ্বী সেজে তারই বাড়ীতে, তারই চোখের সামনে সুখেশান্তিতে দিন কাটাচ্ছে। সে অনেক ভেবে দেখেছে এই শৈল যতদিন পৃথিবীতে থাকবে ততদিনই সে অশান্তির আগুনে জ্বলে পুড়ে মরবে। আসলে চোখ ধাঁধানো রূপের আড়ালে শৈলর মধ্যে এক ডাকিনীর বাসা। এই ডাকিনী শক্তিই আজ তাকে এই অধঃপাতের পথে টেনে এনেছে। ভবিষ্যতে আরও কি ঘটবে কে জানে। তাই শৈলর অস্তিত্ব যদি

পৃথিবী থেকে মুছে ফেলা যায়, তবেই তার সবজ্বালার অবসান ঘটবে। তার শান্তির আর অন্য কোন উপায় নেই। শৈল তার জীবনে বিরাট এক অভিশাপ। শৈলকে পাওয়ার চেয়ে তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার দিকেই এখন তার মন বেশী ঝুঁকে পড়েছে।

গঙ্গামণি ও নবদুর্গার মৃত্যুর পরে চুপিসারে আর এক অঘটন ঘটল রায়পরিবারে। সেটা হল বিষপ্রয়োগে শৈলর মৃত্যু এবং এরও মূলে মহেশ। তবে এ ব্যাপারে কোন লোক জানাজানি হল না। ঘটনাটা পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। লোকে জানল অসুস্থ হয়েই মারা গেছে রায়বাড়ীর মেজবউ শৈল।

দ্বিতয় সন্তানের জন্মের পর থেকেই শৈলর শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। দীর্ঘদিন ধরেই সে সূতিকারোগে ভুগছিল। স্বাভাবিক খাওয়া দাওয়া করা ডাক্তরের বারণ ছিল। পুরাণ চাউলের ভাত আর লংকাছাড়া জীয়ল মাছের ঝোল ছিল শৈলর পথ্য। তাই সবার জন্য রান্নাবান্না সেরে নিজের জন্য শৈলকে আলাদা রান্না করতে হত। অসুস্থ শরীরে ঘকন্নার কাজ, বাচ্চাদের যত্ন ইত্যাদি কাজ করতৈে শৈলর বড়ই কষ্ট হত। কিন্তু মুখে কিছু বলত না। চালিয়ে নিত কোনরকমে। এভাবেই দিন চলছিল। এমন সময়টাতেই লবঙ্গ এল বাপের বাড়ীতে। সে প্রায়ই আসে। কারণ সে ধনীর গৃহিণী, শ্বশুরবাড়ীতে তার কোন দায়দায়িত্ব নেই। একটি মাত্র ছেলে তার। সে ছেলেও ঠাকুরমার কাছেই মানুষ। মার কাছে বড় একটা ঘেষেঁনা। তাই লবঙ্গ হামেশাই বাপের বাড়ীতে চলে আসে। স্বামী বা শ্বশুর শাশুড়ী কোন আপত্তি করেন না। লবঙ্গ যেমন সুন্দরী তেমনি মেজাজী ও স্পষ্ট কথার মানুষ। অন্যায় দেখলে সে কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। তবে কাজকর্মে খুবই চটপটে এবং খুবই কর্তব্যপরায়ণ। বাপের বাড়ীতে এসেই সে শুনল, শৈলর শরীর ভাল যাচ্ছে না। শৈলর প্রতি লবঙ্গের একটা বিশেষ স্নেহ আছে। কারণ শৈলকে সেই পছন্দ করে ঘরে এনেছে। তাই লবঙ্গ শৈলকে দেখতে দেবেন্দ্রের বাসায় এসে উপস্থিত হল। শৈলর শারীরিক অবস্থা দেখে তার সেবাযত্নের জন্য লবঙ্গ কিছুদিন ভাইয়ের বাসায় থেকে যেতে মনস্থ করল। লবঙ্গর এই ইচ্ছার কথা শুনে দেবেন্দ্রও খুব খুশী। শৈলর যে একটু সেবাযত্ন ও বিশ্রামের প্রয়োজন এটা সেও বুঝে। কিন্তু কোন ব্যবস্থা করতে পারছে না। এর মধ্যে সুন্দরদিদি নিজে থেকে এই দায়িত্ব নেওয়ায় দেবেন্দ্র খুবই নিশ্চিন্ত বোধ করল। শৈলকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য লবঙ্গ বাচ্চাদের যত্ন এবং হেঁশেলের সব দায়দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিল এবং খুব

যত্নের সঙ্গে শৈলর ওষুধ পথ্য খাওয়ার ব্যবস্থা করল।

লবঙ্গের সেবাযত্নে ও বিশ্রামে দিনসাতেকের মধ্যেই শৈল বেশ খানিকটা সেরে উঠল। শৈলকে খানিকটা সুস্থ দেখে দেবেন্দ্র খুশী হয়ে দিদিকে বলল, ''তোমার হাতে যাদু আছে সুন্দরদিদি! এই অল্পকয়দিনের মধ্যেই দেখছি তোমাদের বউ বেশ তরতাজা হয়ে উঠেছে।'' লবঙ্গ স্নেহের সুরে ধমক দিয়ে বলল, '' ছি!, এভাবে বলচিস কেন? দৃষ্টি লাগবে না? আর তোরা কি রে দেবু, অমন সুন্দর বউটা রোগে রোগে কালি হয়ে যাচ্ছে, তোদের কোন লক্ষ্যই নেই, সত্যিই তোরা বড় বেআক্কেলে। তবে আমি যখন এসে পড়েছি তখন ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ না করে যাব না। আচ্ছা এখন কি খাবি বল। লুচি করে দেব কি? আর লুচিটুচি করতে ইচ্ছে হয় না। বউ খাবে না আমরা খাব এটা আমার ভাল লাগে না।'' দেবেন্দ্র হেসে বলল,''একি কথা বলছ সুন্দরদিদি। ও রোগের জন্য খেতে পারছে না বলে আমরা খাব না? ভাল হয়ে গেলেতো খেতে পারবেই। তাছাড়া ভালমন্দ খাওয়াতো এখন হয়ই না। ওর শরীর খারাপ থাকাতে তেমন কিছুতো করতেই পারে না।'' ঘোমটার আড়াল থেকে শৈলও বলে উঠল,''আমার জন্য ভাববেন না সুন্দরদিদি। আপনি লুচিহালুয়া করুন দু'জনে খাবেন। হালুয়াতো তীর্থও একটু খেতে পারে।'' আবার সুন্দরদিদির স্নেহের মুখঝামটা। ''তীর্থ কি খাবে না খাবে সে আমি দেখব। তোকে বলতে হবে না কিছু'' বলে লবঙ্গ হাসতে হাসতে খাবার তৈরীর জন্য রান্নাঘরে গেল। সুন্দরদিদির শৈলর প্রতি এই স্নেহে দেবেন্দ্রেব অন্তর খুশীতে ভরে গেল আর শৈলর চোখে জল এসে গেল। দেবেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বলল,''আমার নিজের বোন নেই। সুন্দরদিদি বোধ হয় গতজন্মে আমার বোন ছিলেন। এ জন্মে তোমার বোন হয়ে জন্মেছেন'' শুনে দেবেন্দ্র কোন উত্তর না দিয়ে শুধু হাসল। এভাবেই তিনজনের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্কের মধ্য দিয়ে দেবেন্দ্রের ছোটবাসাবাড়ীটা একটা শান্তির নীড় হয়ে উঠল। দিনগুলি কাটছিল বড় সুখে শান্তিতে।

সেদিন ছিল একটা জরুরী ফৌজদারী মামলার তারিখ। মহেশ বাড়ী থেকে বেশ সকালেই না খেয়ে রওনা হয়ে এসেছিল। কোর্টে যাবার তাড়া ছিল বলে লবঙ্গ তাড়াতাড়ি রান্না সেরে দাদা এবং ছোটভাই দেবুকে খাইয়ে দিয়েছিল। দুইভাই খেয়ে দেয়ে যথাসময়ে কোর্টে রওনা হয়ে গেল। ওরা খেয়ে দেয়ে চলে যাবার পর লবঙ্গর হাতে কোন কাজ ছিল না। তাই সে উঠানের এক কোনে

লংকা বেগুনের যে কয়টা গাছ ছিল, সেই গাছগুলোর নীচের আগাছা পরিস্কার করে দিচ্ছিল। তরকারী বাগান করার দিকে লবঙ্গর খুব ঝোঁক। হাতে কাজ না থাকলে সে গাছের পরিচর্যা করে। আগাছা পরিস্কার করতে করতে হঠাৎ চোখ তুলে সে রান্নাঘরে দাদাকে দেখতে পেল। এ বাড়ীর বেটাছেলেরা রান্নাঘরে বড় একটা যায় না। খাবার সময় খাওয়ার ঘরে এসে খাওয়া সেরে বাইরের ঘরে বা শোবার ঘরে চলে যায়। তাই লবঙ্গ খুবই অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এল এবং বলল,"আপনি ফিরে এলেন কেন বড় দাদা?" লবঙ্গর চোখে পড়ল বড়দাদার হাতে একটা ছোট শিশি। মহেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল,"এই ওষুধটা খেয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম। ইদানীং এই ওষুধটা খাওয়ার পরে না খেলে হজম হয় না। তাই ওষুধ খেতে জলের জন্য ফিরে এসেছি। এখনই চলে যাব।" লবঙ্গ বলল,"জলের জন্য নিজে কষ্ট করতে গেলেন কেন? আমাকে ডাকলেই তো আমি জল দিতাম।" মহেশ সস্নেহে হেসে বলল,"এমনিতে তুই আমাদের জন্য বড় বেশী পরিশ্রম করছিস্। তাই রান্নাবান্না সেরে একটু বিশ্রাম করছিস ভেবে আর তোকে ডাকিনি। আর একটু খানি জল গড়িয়ে খাওয়া কি কোন কষ্ট।" এই বলে রান্নাঘরের কোণে যে একটা আগাছার জঙ্গল ছিল, সেই জঙ্গলে হাতের শিশিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দ্রুত চলে গেল। লবঙ্গ এতে আর কিছু মনে করল না। শৈলর মত এত তলিয়ে ভাববার অভ্যাস লবঙ্গর নেই। বরং ভাইয়ের বাড়ীতে এসে সে যে এত খাটাখাটুনী করছে, এটা বড়দাদার নজরে পড়ায় এবং প্রশংসায় সে বেশ খুশীই হল। লবঙ্গ প্রশংসা করলে বড়ই খুশী হয়। বিপরীত ঘরের দরজার পাশে বসে শৈল পবিত্রকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। ব্যাপারটা শৈলর চোখেও পড়েছিল, আর ভাইবোনের কথাগুলোও তার কানে গিয়েছিল। সে কিন্তু ব্যাপারটা লবঙ্গর মত সহজ মনে নিল না। কারণ ভাশুরঠাকুরকে সে জীবনেও জল গড়িয়ে খেতে দেখেনি। তাই তার মনে একটু খটকা লাগল।

দুপুরে শৈল ও লবঙ্গ রোজই একসঙ্গে খায়। সেদিনও দু'জনে একসঙ্গে খেতে বসেছে। শৈল দু'একগ্রাস খেয়েই বলল,"সুন্দরদিদি,মাছের ঝোলটা কেমন তিতকূটে লাগছে। খেতে পারছি না।"লবঙ্গ মনে মনে বেশ রেগে গেল। কারণ সে তার কোন কাজের নিন্দা সহ্য করতে পারে না, তাই বলল,"আমিতো আর তোমার মত ভাল রান্না করতে পারি না। তাই বোধহয় তিতকূটে লাগছে। কাল থেকে তোমার ঝোলটা তুমিই করে নিও। আমার রান্না তোমার মুখে রোচে না।"

একথায় শৈল খুব দুঃখ ও লজ্জা পেল। সুন্দরদিদি খারাপ রান্না করে এমনভাবে কথাটা সে বলেনি, তাই খুব খারাপ লাগা সত্ত্বেও সে নীরবে কষ্ট করে খেয়ে নিল। যদি ফেলে দেয় তবে সুন্দরদিদির রাগ আরও বেড়ে যাবে।

এক ঘন্টা সময়ও পার হল না। শৈলর রক্তবমি ও রক্তদাস্ত শুরু হল। পেটে অসহ্য ব্যথা। বেশ কয়েকবার বমিদাস্ত হওয়ার পর শৈল একেবারে নেতিয়ে পড়ল। অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে লবঙ্গ চাকর পাঠিয়ে ভাইদের খবর দিল। কোর্টের কাজ শেষ হয়নি বলে মহেশ আসতে পারল না। তবে দেবেন্দ্র তৎক্ষনাৎ চলে আসল। অবস্থা দেখে দেবেন্দ্র দ্রুত ডাক্তার নিয়ে এল। ডাক্তার যখন এলেন, তখন শৈলর অবস্থা আরও খারাপের দিকে। সে আর বাইরে যেতে পারছে না, বিছানায়ই অবিরাম দাস্তবমি হচ্ছে। ভীত বিভ্রান্ত লবঙ্গ সব পরিস্কার করছে এবং আপ্রাণ শুশ্রুষা করছে। ডাক্তার রোগীকে ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন,"অসুখ নয়, কি বলব, মনে হচ্ছে মারাত্মক বিষের ক্রিয়া। খাদ্যে বিষাক্ত কিছু মিশে থাকবে এমনই মনে হচ্ছে।" শুনে দেবেন্দ্র হতভম্ব হয়ে গেল। খাদ্যে কি করে বিষ মিশতে পারে ? আর ডাক্তারের কথায় লবঙ্গর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কারণ রান্নাবান্নাতো সেই করেছে। খেতেও সেই দিয়েছে। তাই সে মহাফাঁপরে পড়ে গেল। তার শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল।

মুস্কিল আসান করল অর্ধ-চৈতন্য শৈল। ডাক্তারের কথাটা তারও কানে গিয়েছিল। তার চোখ দিয়ে অবিরাম জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল। সে তার কাঁপা কাঁপা হাত দিয়ে দেবেন্দ্রের হাত জড়িয়ে ধরল এবং জড়ানো গলায় বলল,"ভাশুরঠাকুর-একটা শিশি" আর কিছু বলতে পারল না। তার জিহ্বা ক্রমে অসার হয়ে যাচ্ছে। শরীরে খিঁচুনীর লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। তার শিথিল হাত দুটো দেবেন্দ্রের হাত ছেড়ে দিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ল।

লবঙ্গ রীতিমত কাঁপছিল। রান্না যখন সে করেছে দায়টাতো তার ঘাড়েই পড়বে। ভাল করতে এসে কি ভীষণ কলংকের ভাগী হতে যাচ্ছে সে। কেন যে মরতে সে এখানে এসেছিল আর কেন যে সেবাযত্ন করে শৈলকে সুস্থ করার দায়িত্ব নিয়েছিল ? আতংকে লবঙ্গ পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাচ্ছিল না। শৈলর কথায় সে চমকে উঠল এবং নিজেকে দায়মুক্ত করার একটা উপায়ও দেখতে পেল। তাছাড়া শৈলর একটিমাত্র কথায় তার মনেও বড়দাদার প্রতি একটা সন্দেহ উঁকি দিল। সুন্দরী শৈলর প্রতি মহেশের মোহ এবং ঢাকার বাসার কাণ্ডকীর্তি

সবই লবঙ্গর জানা। দুপুরে বড়দাদার রান্নাঘরে যাওয়া ও হাতের শিশি দেখে তখন কিছু মনে না হলেও এখন ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক মনে হল। তাছাড়া ব্যাপারটায় নিজে জড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে সে খুবই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই শৈলর কথার প্রসঙ্গ ধরে সেও মহেশের ঐ শিশির কথাটা গরগর করে দেবেন্দ্রকে বলে দিল। শৈল হাজার হোক পরের মেয়ে। তার ভালমন্দের চেয়ে যে নিজের দাদার মানমর্যাদাটা তার কাছে বড় হওয়া উচিত, সেকথা সেসময় সে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী হয়েও মাথায় রাখতে পারল না। সে নিজেই আগাছার জঙ্গল থেকে খুঁজে পেয়ে শিশিটা এনে দেবেন্দ্রের হাতে দিল। শিশির তলায় সামান্য একটু ওষুধও ছিল। শিশিটা নিয়ে দেবেন্দ্র তৎক্ষনাৎ ছুটল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, ''এতো মারাত্মক বিষ। এ বিষ আপনার বাড়ীতে এল কি করে? আপনার সঙ্গে কি কারো শত্রুতা আছে? এটাতো কেউ কিনে এনে খাবারের সঙ্গে মিশিয়েছে। এ বিষ খেলেতো মানুষ সচরাচর বাঁচেনা। আপনার রোগীর জন্য কিছুই করার নেই।'' কথাগুলো বলে ডাক্তার একটু থমকে গেলেন। একটু সময় চুপ করে থেকে ভাবলেন, ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের নয়। পুলিশী হাঙ্গামা হতে পারে। তাহলেতো ডাক্তার হিসেবে তাকেও পুলিশী হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে হবে। তার কাজ চিকিৎসা করা। অযথা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়াতো ঠিক হবে না। তাই তিনি বললেন, ''দেখুন, শুধু আমার উপর নির্ভর করবেন না। আমার অনুমান সঠিক নাও হতে পারে। আপনি বরং আপনার রোগীকে অন্য একজন ভাল ডাক্তার দেখান। আমি আপনার রোগীর জন্য কোন ওষুধও দেব না. আপনার কাছ থেকে কোন ফিও নেব না। কিছু মনে করবেন না। আমি চিকিৎসা করি কিন্তু কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না। আর চিকিৎসক হিসাবে আপনাকে এও বলে দিচ্ছি যে আপনার রোগীর অবস্থা খুবই আশংকাজনক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি অন্য একজন ডাক্তারকে রোগী দেখান।'' দেবেন্দ্র যা বুঝার বুঝে নিয়েছে। তার হৃদপিণ্ডটা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কোনরকমে বাসায় ফিরে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য দেবেন্দ্র ঘরের চৌকাঠে মাথা ঠুকতে লাগল। কপাল ফেটে অঝোরে রক্ত ঝরতে লাগল। লবঙ্গ কিছুতেই সামলাতে পারছে না। সে একা। মহেশ খবর পাঠিয়ে গিয়েছে যে সে বাড়ী চলে যাচ্ছে। কাল সকালে আসবে। এদিকে রোগীরও প্রায় শেষ অবস্থা। লবঙ্গ দু'চোখে সর্ষেফুল দেখছে। এত আতান্তরে লবঙ্গ জীবনে পড়েনি। সে রোগীকে দেখবে, না শিশুদের দেখবে না দেবেন্দ্রকে সামলাবে। এমন

সময় কি বুঝে পাঁচবছরের তীর্থ বাবাকে জড়িয়ে ধরে আর্তকান্না জুড়ে দিল। ছেলের কান্নায় দেবেন্দ্রের সম্বিৎ ফিরল। যে শিশু নিশ্চিন্ত মাতৃহীন হতে চলেছে সেই শিশুর পিতামাতা উভয়ের দায়িত্ব এখন তার একার। তাই তাকে তো ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। সে স্থির হল, শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে তাকে শান্ত করল। দেবেন্দ্রকে প্রকৃতিস্থ দেখে লবঙ্গ যেন অকূলে একটু কূল পেল।

তীর্থকে কোল থেকে নামিয়ে ধীর স্থির দেবেন্দ্র শান্তভাবে বসল মৃত্যুপথযাত্রিনী স্ত্রীর শিয়রে। সুন্দরী শৈলর সুন্দর মুখ বিষে নীল হয়ে গেছে। নিজের অজান্তেই চোখ বন্ধ করল দেবেন্দ্র। শৈলর বিষজর্জর নীলমুখের দিকে তাকাতে পারছে না সে। কিন্তু কি আশ্চর্য! বন্ধ চোখের সামনে ভেসে উঠল শৈলর বিষজর্জর নীলমুখ নয়, ভাগ্যহীন শিশুসন্তানের মুখ নয়, পাপিষ্ঠ মহেশের মুখ নয়, শ্রীগুরুর প্রসন্নবদন। মন চলে গেল হরিদ্বারের সেই ঝুপড়িতে, গুরুর চরণ প্রান্তে। দেবেন্দ্রর মন প্রশান্ত হল এবং প্রস্তুত হল আসন্ন বিয়োগব্যথার বোঝা মাথায় তুলে নিতে।

শেষ রাতের দিকে শৈল মারা গেল। তার বড় সাধের সংসার প্রাণপ্রিয় স্বামী সন্তান ছেড়ে তাকে অকালে চলে যেতে হল। রূপ তার কাল হল। শৈলর মৃত্যুতে কান্নার রোল উঠল না। দেবেন্দ্র প্রস্তরবৎ হয়ে শৈলর চলে যাওয়া দেখল,পাঁচবছরের শিশু তীর্থ মৃত্যু বোঝেনা। কিন্তু একটা কিছু বোঝে, তার শিশুমন বিস্ময়ে ভয়ে নির্বাক, সারারাত তার ঘুম নেই। বাপের কোলে মাথা গুজেই রাত কাটাল সে। তাকে কিছুতেই ঘুঁম পাড়ানো গেল না। পবিত্রতো নেহাৎ শিশু। তার কোন অনুভূতি নেই। সে শান্তিতেই ঘুমিয়ে আছে। তার যে কি সর্বনাশ হল সে জানে না। শুধু খুব মৃদুস্বরে একটানা ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করে যাচ্ছে লবঙ্গ। তার এই বিলাপের সুর ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রকৃতির বুকে যেন একটা আক্ষেপ জাগিয়ে তুলছে। শৈলকে সেই পছন্দ করে ঘরে এনেছিল। আর কার্যকারণে সেই উপস্থিত থেকে শৈলকে পৃথিবী থেকে বিদায় করল। লবঙ্গর বিলাপের মধ্যে এই আক্ষেপটাই বিশেষ করে প্রকাশিত হচ্ছিল।

যথসময়ে খবর গেল বাড়ীতে। মহেশসহ পুরুষদের অনেকে এসে পৌছল শেষকৃত্যের প্রয়োজনে। শৈল সূতিকারোগে ভুগছিল ঠিকই। কিন্তু এমন করে হঠাৎই যে চলে যাবে তা কেউ ভাবেনি। মেয়েদের মধ্যে শৈলর জন্য তেমন শোকতাপ দেখা গেল না। শুধু গুণমণির মনটাই হু হু করতে থাকল।

সূর্য যখন সবেমাত্র প্রভাতী কিরণ বিকীরণ করতে শুরু করেছেন আকাশে, পাখীরা যখন কলকাকলীতে জাগাতে শুরু করেছে জগতকে, ফুলেরা যখন সবেমাত্র ফুটে উঠেছে গাছে গাছে। সেই সময়টাতে সুন্দরী শৈল রওনা হল শ্মশানের পথে। পিছনে পড়ে রইল তার সাধের সংসার তার প্রাণপ্রিয় স্বামীসন্তান। শৈল ভালবেসেছিল, ভালবাসা পেয়েছিল, স্বামীসন্তানের মধ্যে জীবনের পূর্ণতার স্বাদ পেয়ে সুখের জীবন গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে কিছুই ধরে রাখতে পারল না। সব পেয়েও অপ্রাপ্তির বেদনা নিয়ে তাকে চলে যেতে হল। তার ভুবন ভুলানো রূপ তাকে অকালে কালের কবলে ছুঁড়ে দিল। শৈলর চলার পথ কারো অশ্রুজলে পিচ্ছিল হল না। শুধু একটি হৃদয়ে এক সমুদ্র অশ্রুজল জমাট বেঁধে বরফে পরিণত হল।

সিঁদুরে আলতায় বেনারসী শাড়ীতে লবঙ্গ শৈলকে চমৎকার ভাবে সাজিয়ে দিয়েছে। বিয়ের কনের মত চন্দন এঁকে দিয়েছে কপালে। ভাগ্নে অবনী কি মনে করে নিয়ে এসেছে সকালে ফুটে ওঠা হরেক রকমের তাজা ফুল। লবঙ্গ নিপুন হাতে শৈলকে ফুলসাজে সাজাল। অগুরু ছিটিয়ে দিল সারা গায়ে। খুলে দিল শৈলর দীর্ঘ কালো কেশ। দীর্ঘ কেশপাশ ছড়িয়ে পড়ল মাথার চারিদিকে। এই সাজে চমৎকার মানিয়েছে সুন্দরী শৈলকে। সাজগোজতো শৈলর বরাবরই খুব পছন্দ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকের এই অপরূপ সাজ সে চোখ মেলে দেখল না।

চিতা জ্বলল, সুন্দরী সীমন্তিনী শৈল চিতায় উঠল। আগুনের লেলিহান শিখা তার তনুদেহখানি ঘিরে ধরল। দেবেন্দ্র সহ্য করতে পারল না। চোখ বন্ধ করল। কিন্তু কি আশ্চর্য! তার বন্ধ চোখের সামনে ভেসে উঠল কালো দুটি চোখ, সে চোখ দুটোতে তীব্র ভর্ৎসনা। সে চোখ শৈলর চোখ। দেবেন্দ্র স্পষ্ট শুনতে পেল, চোখদুটো যেন বলছে,"দূরে কোথাও চলে যেতে অনেক করে বলেছিলাম তোমাকে। কিন্তু তুমি শুননি সেকথা। যদি শুনতে তবে আর এমনটা হত না। আজ দুটি অবুঝ শিশু মাতৃ হীন হল, সেটা কার দোষে? তোমার দোষে, তোমার দোষে।" অথচ শৈল জীবনে দেবেন্দ্রকে ভর্ৎসনাতো দূরের কথা, সামান্যতম মুখের কথাও বলেনি। চোখদুটো হঠাৎ মিলিয়ে গেল। আর দেবেন্দ্রর অন্তরের অন্তস্থলে ঝংকৃত হতে থাকল দুটি শব্দ। "তোমার দোষে, তোমার দোষে।"নিজের অন্তর থেকে উৎসারিত এই দুটো শব্দ শুনতে শুনতে একসময় সে সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়ে

লুটিয়ে পড়ল। ব্যাপারটা অন্য কেউ লক্ষ্য না করলেও অবনী ঠিকই লক্ষ্য করল। সে দৌড়ে এসে অজ্ঞান দেবেন্দ্রের সেবা শুশ্রুষা করতে লাগল এবং দীর্ঘসময় পরে একসময় দেবেন্দ্রের চৈতন্য ফিরে এল। চৈতন্য ফিরে আসার পর কোনমতে অবনীর গায়ে ভর দিয়েবসে দেবেন্দ্র শূন্য দৃষ্টিতে চিতার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশের দিকে নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

চিতা জ্বলছে, সুন্দরী শৈল পুড়ছে, কামান্ধ মহেশ দেখছে। এতদিন ধরে শৈলর রূপের আগুনে জ্বলে পুড়ে সে খাক হয়েছে। আজ তারই দেওয়া বিষের কারণে শৈলর রূপ চিতার আগুনে পুড়ে কয়লা হচ্ছে। এতদিন পরে মহেশ শৈলর উপর যোগ্য প্রতিশোধ নিয়েছে, নিতে পেরেছে। মহেশ যথার্থ পুরুষ। তাই ঈপ্সিত কোন নারী তার বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে ধরা না দিয়ে পৃথিবীতে টিকে থাকবে তা হতে পারে না। শৈলর দেহের সঙ্গে সঙ্গে মহেশের উদ্দাম কামপ্রবৃত্তি ও পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছে। মহেশের অশান্ত মন এতদিন পরে ধীরে ধীরে শান্ত হচ্ছে। কিন্তু মন শান্ত হলেও ঠিক শান্তি অনুভব করতে পারছে না সে। একটা পরিতাপের আর পাপবোধের জ্বালা মনের কোণে কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে। এ জীবনে বোধ হয় এই কন্টক যন্ত্রণা থেকে তার নিস্কৃতির উপায় নেই। মহেশের এসব ভাবনা চিন্তার মধ্যেই একসময় চিতার আগুন নিভল। সোনার প্রতিমা শৈল পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আর মহেশের মনে দীর্ঘদিনের প্রজ্বলিত কামাগ্নিও নির্বাপিত হল। শৈল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে দেখে মহেশের কেন জানি মনে হল, শৈল মরে গিয়েও যেন বিজয়িনী, আর মহেশ পরাজিত, পাপবোধের তাপে তাপিত, ঘৃণিত। শৈলর প্রাণতো মহেশের কাম্য ছিল না,তার কাম্য ছিল, শৈলর পরিশীলিত মন আর তার তিলোত্তমা সদৃশ শরীর। কিন্তু মহেশ তা পেল না। শৈল প্রাণের বিনিময়ে মহেশের জন্য রেখে গেছে পাপ আর পরাজয়ের গ্লানি।

শৈলর মৃত্যুরহস্য জানাজানি হয়নি। তাই পুলিশী হাঙ্গামার কোন প্রশ্নই নেই। দেবেন্দ্র এ ব্যাপারে মুখ খোলেনি। কারণ সত্য প্রকাশ করলেও তা প্রমাণ করা সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া সে সম্পূর্ণ একা। পাশে দাঁড়ানোর মত কেউ নেই। শ্মশান ঘাট থেকেই বাড়ীর লোকজন চলে গেছে। তাকে কেউ সহানুভূতিসূচক কোন কথাও বলেনি। সাহায্য সহায়তা দূরের কথা। শুধুমাত্র অবনী তার সঙ্গে বাসায় এসেছে এবং সাধ্যমত সাহায্য সহায়তা করছে। আর আছে সুন্দরদিদি। তাই দেবেন্দ্র শৈলর মৃত্যু নিয়ে ঘাটাঘাটি করল না। কারণ শৈলকেতো আর

ফিরে পাওয়া যাবে না। মাঝখান থেকে তাকেই নাকাল হতে হবে। আর তাতে শিশুগুলির দুর্দশা আর ও বাড়বে। অন্যায় অবিচার পাওয়া তার ভাগ্য। তার জীবনটাই একটা অভিশাপ। সুন্দরদিদি অবশ্য সবটাই দেখেছে, জেনেছে। তবে ঘটনার তৎক্ষণিক উত্তেজনায় মানুষের মুখ থেকে যেমন সত্য কথা বেরিয়ে আসে পরবর্তী সময় মানুষ পরিস্থিতি সাপেক্ষে সত্যকে এড়িয়েই যায়। লবঙ্গও যে মনে মনে বেশ একটু সাবধান হয়ে গেছে, তা স্পষ্ট বুঝা যায়। আর লবঙ্গ ভাইদের এসব নোংরামীতে জড়াবেই বা কেন? তাছাড়া মহেশ লবঙ্গর ভাই আর শৈল পরের মেয়ে। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই লবঙ্গ ভাইয়ের দোষত্রুটি চেপে যাওয়ার চেষ্টাই করবে। তাই দেবেন্দ্র মহেশের এতবড় পাপাচারের কোন প্রতিকার করতে পারল না। নিজের মনেই দগ্ধ হতে থাকল।

শৈলর শ্রাদ্ধশান্তি দেবেন্দ্র খুবই সংক্ষেপে কিশোরগঞ্জের বাসায়ই সারল। তারপর দেখা দিল আসল সমস্যা। এতদিন লবঙ্গর উপর নির্ভর করেই শিশুদু'টির লালনপালন চলছিল। কিন্তু লবঙ্গ বড়ই হাঁপিয়ে উঠেছে। সে আর থাকতে চাইছে না। আর থাকবেই বা কেমন করে? তারওতো নিজস্ব ঘর সংসার আছে। তাই লবঙ্গ দেবেন্দ্রকে কিশোরগঞ্জের বাসা তুলে দিয়ে বাড়ী চলে যেতে পরামর্শ দিল। বাড়ীতেতো লোকজন আছে। তারা অবশ্যই শিশুদুটিকে কিছু না কিছু দেখবে। দেবেন্দ্রর যদিও বাড়ীমুখো হওয়ার ইচ্ছে ছিল না, তবু নিরুপায় হয়েই লবঙ্গর পরামর্শমত কিশোরগঞ্জের বাসা ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতেই চলে আসতে হল।

সরযূ ও স্নেহলতা ছাড়া বাড়ীর অনেকেই শৈলর মৃত্যুর আসল কারণটা জেনেছে। লবঙ্গ এতবড় ঘটনাটা চাপতে পারেনি, চুপিচুপি প্রায় সবাইকে বলেছে। শুনে সবাই ঘটনাটা বেমালুম চাপা দিয়েছে। ঘটনার সত্যতা মনে মনে বুঝলেও মুখে কেউ কেউ সন্দেহও প্রকাশ করেছে। ডাক্তারের কথা সত্যি না ওতো হতে পারে। শৈলতো দীর্ঘদিন ধরে সূতিকারোগে ভুগছিল। সম্ভবতঃ ঐ রোগেই সে মারা গেছে। কাজেই অযথা অন্যরকম ভাবা মোটেই উচিত নয়। মহেশের সঙ্গে শৈলরতো একটা গোলমাল একসময় হয়ে ছিল। এজন্যও দেবু এরকম সন্দেহ করতে পারে। আসলে বিষটিষের কথা মোটেই ঠিক নয়। লবঙ্গর মুখে শোনা শৈলর মৃত্যুর ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করে মহেশের ভাইবোনেরা বেশ স্বস্তিবোধ করল। একমাত্র গুণমণি এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করলেন না। আর পাড়াপ্রতিবেশীদেরতো এ ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কোন প্রশ্নই নেই।

পোয়াতীকালে, প্রসবসময়ে, সূতিকারোগে ঘরে ঘরে আকছার বউ মরছে। বউয়ের মৃত্যু এমন কোন শোকতাপের ব্যাপার নয়। বউ মরলে ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে দিলেই ঝামেলা চুকে যায়। তাই অন্য ভাবনা কারোর মাথায়ই আসেনি। কাজেই পরিবারের লোকজনদের মধ্যেও শৈলর এই করুণ মৃত্যুটা বিশেষ কোন রেখাপাত করেনি। বরং শৈলর মৃত্যুটা মহেশের পক্ষে ভালই হয়েছে। শৈলর অলুক্ষণে রূপের টানে মহেশের মত একজন মানীজ্ঞানী লোকের এমন অধঃপতন হয়েছে। কই সরযূ, স্নেহলতাকে নিয়েতো এমন ঝামেলার সৃষ্টি হয়নি। শৈল মরেছে একদিকে ভালই হয়েছে। পরিবারের কেলেংকারীর কারণ দূর হয়েছে। অধিক সুন্দরী মেয়ে মোটেই ভাল নয়। রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডটাই তো ঘটল সুন্দরী সীতার জন্য। এখন মোটামুটি চেহারার একটা ভাল মেয়ে দেখে দেবেন্দ্রের আবার বিয়ে দিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। শৈলর মৃত্যুর ব্যাপারে গুণমণি ছাড়া পরিবারের অন্যাদের ভাবনাচিন্তা এই খাতেই বইল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল লবঙ্গর পরিবর্তন। প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও সে যেন এসব সমালোচনায় বেশী সোচ্চার। মানব চরিত্র সত্যিই বিচিত্র এবং স্ত্রীলোকের চরিত্র বোধ হয় আরও বিচিত্র। স্ত্রীলোকের অনুচিত সমলোচনায় স্ত্রীলোকেরাই মুখর হয়। স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের অন্যায় অবিচারকে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকই বেশী প্রশ্রয় দেয়। স্ত্রীলোকের দুঃখে আসলে স্ত্রীলোকদুঃখিত হয় না। এ এক আশ্চর্য মনস্তত্ত্ব। দেবেন্দ্র সব দেখে শোনে, আর শৈলর জন্য বেদনায় তার হৃদয বিদীর্ণ হয়।

দেবেন্দ্রের ভাঙ্গা সংসার জোড়া দেবার উদ্দেশ্যে তার দ্বিতীয়বার বিয়ের জন্য বাড়ীর সবাই উঠে পড়ে লেগে গেল। এ ব্যাপার সবচেয়ে বেশী আগ্রহী মহেশ। দেবেন্দ্রের আবার বিয়ে দিয়ে সে দেবেন্দ্রের মন থেকে শৈলর স্মৃতি মুছে দিতে চায়। এজন্যই দেবেন্দ্রের বিয়ের জন্য তার আগ্রহটা এতবেশী। সংসারে মেয়েরতো অভাব নেই। তাই মহেশ নিত্য নূতন সম্বন্ধ আনছে। কিন্তু দেবেন্দ্রের হৃদয়ে জুড়ে রয়েছে শৈল। তার পক্ষে দ্বিতীয়বার বিয়ে করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই দেবেন্দ্র কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হল না। ফলে বাড়ীর সবাই খুবই বিরক্ত হল এবং সেই বিরক্তির শিকার হল দেবেন্দ্রের দুই শিশু। বাড়ীর মেয়েরা দেবেন্দ্রের শিশুসন্তানদের দিকে ফিরেও তাকায় না। দেবেন্দ্রের শিশুর পরিচর্যা করার অভ্যাস একেবারে নেই। তাই সে খুবই মুস্কিলে পড়ে গেল। বাড়ীতে তার একমাত্র সহায়

গুণমণি। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। দুই দুইটি শিশুর লালনপালন করা তার পক্ষে অসম্ভব। তীর্থ একটু বড় বলে তিনি কোনক্রমে তীর্থের দেখাশোনা করেন। কিন্তু রুগ্ন শিশু পবিত্রকে যত্ন করার সাধ্য তার নেই। তাই পবিত্রকে নিয়ে দেবেন্দ্রে বড়ই বিপদে পড়ে গেল। পবিত্র নেহাৎ শিশু। তায় জন্মরুগ্ন। সে মাতৃগর্ভে আসার পর থেকেই একটার পর একটা বিপর্যয় শুরু হয়েছে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে তার মা অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে ঠিকমত মায়ের যত্নও পায়নি। তাই সে রুগ্ন ও ছিঁচকাঁদুনে। এখন এই মাতৃহীন শিশুকে রক্ষা করার চিন্তাই দেবেন্দ্রের বড় চিন্তা।

বাড়ীর পরিবেশ পরিস্থিতি ও দেবেন্দ্রের পক্ষে খুবই প্রতিকূল। দেবেন্দ্র ও তার সন্তানদের নিত্য ভাতজল কে যোগাবে এ নিয়েও মেয়ে মহল থেকে ঠেস দিয়ে কথা শুনানো হয়। যে সরযূ কোনদিন রা কাঁড়েনা, সে পর্যন্ত একদিন বলে বসল,''বিয়েতো করলেনা ঠাকুরপো' বউয়ের স্মৃতি আগলে বসে রইলে। কিন্তু চিরদিন তোমাদের ভাতজল কে যোগাবে বল। অন্তত এ চিন্তাটা মাথায় রেখে বিয়েটা করে ফেলা তোমার উচিত ছিল।'' সরযূর কথায় দেবেন্দ্রের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও ক্রোধের সৃষ্টি হল। শৈলত নিত্য এতবড় গোষ্ঠীর ভাতজল যুগিয়েছে,শৈল বেঁচে থাকতে সরযূ ও স্নেহলতা কয়দিন হেঁশেলে ঢুকেছে তা হাতে গোনা যায়। অন্যায় কথা ও আচরণ চিরদিন দেবেন্দ্র নীরবে সয়ে যায়। কিন্তু আজ আর তার সহ্য হল না। বলল,'' ন্যায্য কথাই বলেছ বউঠান। তবে শৈল বেঁচে থাকতে তোমাদের স্বামীপুত্রের ভাতজল সে কতদিন যুগিয়েছে। আর তোমরা কতদিন আমার ও ছেলেদের ভাতজল যুগিয়েছ সে হিসাবটা করলে আমি এখনও তোমাদের কাছে ঋণী হইনি।'' কথাটা রান্নাঘর থেকে স্নেহলতাও শুনল। দুইজায়ে পরামর্শ করেই কথাটা বলা হয়েছিল। কিন্তু দেবেন্দ্র যে এমন পাল্টা জবাব দেবে তা তারা ভাবতে পারেনি। দু'জনেই বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। এভাবে না বললেই হত। তীর্থতো কোনদিন ওদের ওখানে খেতে আসেনা। সে সবসময় গুণমণির সঙ্গে সঙ্গে থাকে, গুনমণির সঙ্গেই খায়। কাকী জেঠীর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য তার শিশুমনে রেখাপাত করে। তাই সে এদিকে মোটেই ঘেঁষেনা। পবিত্রতো দুধের শিশু। তার জন্য ভাতজল যোগানোর প্রশ্নই আসেনা। একমাত্র দেবেন্দ্রের জন্যই তাদের হাঁড়িতে এক মুঠো চাল দিতে হয়। কথাটা শুনলে হয়ত মহেশ শচীন্দ্রও খুবই বিরক্ত হবে। কিন্তু যা বলা হয়ে গেছে তাতো আর ফিরানো যায় না, তাই দুই জাই একটু অস্বস্তিতে পড়ে যায়।

দেবেন্দ্র সেজমাসী গুনমণির নিরামিষ ঘরে দু'বেলার পরিবর্তে একবেলো খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিল। কারণ নিরামিষ হেঁশেলে দু'বেলা রান্না হয় না। নিরামিষ রান্নার ভার মেজদিদি ক্ষীরোদার উপর। ভাইয়ের জন্য তাদের সঙ্গে দুটো ভাত ফুটানোর জন্য মেজদিদি বউঠানের মত এমন কথা জীবনেও বলতে পারবে না। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হল না। পবিত্রকে নিয়েই বড় রকমের সমস্যা সৃষ্টি হল। এমনিতে সে জন্মরোগা। তার মায়ের মৃত্যুর পর তার অসুখ বিসুখ আরও বেড়ে গেছে। বিশেষ করে পেটের রোগ তার লেগেই আছে। তার উপর আছে কাঁদুনে স্বভাব। ঘুমটা তার খুবই কম। স্ত্রীলোকের সাহায্য ছাড়া এ ধরনের শিশুর লালন পালন দেবেন্দ্রের সাধ্যের মধ্যে নয়। বাড়ীর মহিলারা শিশুটির লালনপালনের দায়িত্ব নিতে নারাজ। ক্ষীরোদার অবশ্য এ ব্যাপারে অন্তরে একেবারে অনিচ্ছা ছিল না। কিন্তু সে বাপের বাড়ীতে পড়ে থাকা মানুষ, এমনিতেই ভ্রাতৃবধূরা তাকে পাঁচকথা শুনায়। সে যদি দেবুর ছেলের দায়দায়িত্ব নেয়,তবে অনেক কথার সৃষ্টি হবে। তাই সেও এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করল না। অথচ এরকম অযত্নে থাকলে শিশুটিকে বাঁচানো দায় হবে। দেবেন্দ্র পবিত্রকে নিয়ে বড়ই অসুবিধায় পড়ে গেল। বিপন্ন দেবেন্দ্র অনেক বলে কয়ে শেষ পর্যন্ত বিধবা ভাগ্নী সুশীলাকে পবিত্রর লালনপালনের দায়িত্ব নিতে রাজী করাল এবং পবিত্রের খরচপত্রের জন্য একটু মোটা অংকের টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিল। সুশীলা দেবেন্দ্রর প্রতি সহানুভূতিবশতঃ যে দায়িত্বটা নিতে রাজী হয়েছে এমন নয়। স্বামীর মৃত্যুর পর সুশীর সংসারে বড়ই অনটন চলছে। পবিত্রর জন্য খরচের টাকাটা পেলে তার অভাব অনটনেরও একটা সুরাহা হবে। এই চিন্তা করেই সুশী রাজী হল এবং দেবেন্দ্র পবিত্রকে টাকা পয়সা সহ সুশীর বাড়ীতে রেখে এসে নিশ্চিন্ত হল।

দেবেন্দ্র সপ্তাহ বা পনের দিন অন্তর অন্তর পবিত্রকে দেখার জন্য সুশীর বাড়ীতে যায় এবং মাঝে মাঝে দু'চারদিন থাকেও। পবিত্রর জন্য তার মন বড়ই খারাপ লাগে। সুশী যত্নআত্তি করছে ঠিকই। ওষুধপত্রও ঠিকঠাক চলছে। পবিত্রর শরীরের কিছুমাত্র উন্নতি নেই। পেটের রোগটাও সারছে না। তার হাড়জিরজিরে শরীর নিয়ে সে যখন বড় বড় কালোচোখ মেলে বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তখন দেবেন্দ্রর মনটা বেদনায় ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। সে'ত দু'হাতে ছেলের জন্য টাকা খরচ করছে, সুশীও যত্নআত্তি কম করছেনা। সুশীর কাছে দেবেন্দ্র

খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু তার ভাগ্য মন্দ হলে সুশী আর কি করতে পারে। সুশী বলে, "মা-মরা শিশুর প্রতি মায়ের আত্মার একটা দৃষ্টি থাকে। এজন্য মা-মরা শিশু সহজে ভাল হয় না।" দেবেন্দ্র ভাবে হয়ত সুশীর কথাই ঠিক। নইলে সুশী এত যত্নআত্তি করা সত্ত্বেও পবিত্র কেন ভাল হয়ে উঠছে না। সুশী আরও বলে, "একটা কবচ তাবিজের খরচ দিয়ে যাও মেজমামা। দেখি কবচ তাবিজ দিয়ে ওর মায়ের দৃষ্টিটা ফিরাতে পারি কিনা।" দেবেন্দ্র সানন্দে সুশীর কথামত কবজ তাবিজের টাকা দিল এবং সুশীর প্রতি কৃজ্ঞতায় তার মন ভরে গেল। পবিত্রর জন্য করছে বটে সুশী, মায়ের মতই করছে। সুশীর ঋণ শোধ করার মত নয়। দেবেন্দ্র ভাবল পবিত্রকে এখান থেকে নিয়ে গেলেও সে সুশীকে খানিকটা আর্থিক সাহায্য করবে।

অনেকদিন পরে দেবেন্দ্র পবিত্র ভাল না হওয়ার যথার্থ কারণটা জানতে পারল। সুশীর ছোট জা শৈলর বাপের বাড়ীর গাঁয়ের মেয়ে। সেই দেবেন্দ্রের কাছে আসল ব্যাপার ফাঁস করে দিল। বলল, "জামাইদাদা, আপনি মিছে এতটাকা ঢালছেন। আপনার ছেলের জন্য কিছুই খরচ হয় না। বাজারের খোলা বার্লি খাইয়ে রাখা হয় আপনার ছেলেকে। একটু চিনি বা মিছরীও দেওয়া হয় না। ওষুধপত্রতো নয়ই। আপনি এখান থেকে ওকেনিয়ে যান। নইলে আপনার ছেলে বাঁচবে না। আপনি এলে একটু দুধ ও সামান্য ওষুধ কিনে এবং যত্নের ভান করে। অনেকদিন ধরে বলব বলব করেও সংকোচে বলিনি, এখন দেখছি না বললে ছেলেটা রক্ষা পাবে না। তাই বললাম। আপনি পাড়ার লোকদের কাছেও খোঁজখবর নিতে পারেন" খোঁজ করার উদ্দেশ্য দেবেন্দ্র পাড়ায় দু'একজনের বাড়ীতে গেল তারাও একই কথা বলল। সুশীর এই তঞ্চকতায় দেবেন্দ্র বড়ই মর্মাহিত হল এবং পরে কি হবে না ভেবেই পবিত্রকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যেতে মনস্থ করল। বাড়ীতে যত্নআত্তি না হউক দুধটুকু অন্ততঃ পেল কিনা তা সে নিজেই লক্ষ্য রাখতে পারবে। আর ওষুধপত্রও সে নিজেই খাওয়াতে পারবে। সুশী অবশ্য খুবই আপত্তি করেছিল এবং পবিত্রকে কোলে নিয়ে খুব মায়াকান্না কেঁদেছিল। কিন্তু দেবেন্দ্র মোটেই পাত্তা দেয়নি।

প্রায় বছর দেড়েক হয়ে গেল, শৈল মারা গেছে। এক বছরের পবিত্রর আড়াই বছর পূর্ণ হয়েছে। তীর্থও এরমধ্যে বেশ বড় হয়েছে এবং বেশ দুরন্ত হয়ে উঠেছে। গুণমণি তাকে সামলাতে হিমসিম খান। পবিত্রকে দেখার সুবিধা শক্তি তার নেই। ক্ষীরোদা মাঝেমধ্যে একটু আধটু দেখাশোনা করে, আর বাকীটা

অপটুহাতে দেবেন্দ্রকেই করে নিতে হয়। ছেলেদুটোকে নিয়ে দেবেন্দ্র বড়ই নাজেহাল হচ্ছে। নইলে তার আর কিসের চিন্তা? তার মনে এখন সুখদুঃখ যেন একাকার। বাড়ীর পরিস্থিতি অবশ্য এখন অনেকটা পালটেছে। সবচেয়ে বড় পরিবর্ত্তন দেখা যায় মহেশের ব্যবহারে। দেবেন্দ্রের প্রতি মহেশের ব্যবহার এখন খুবই আন্তরিক। ভাইপোদের খোঁজখবরও মাঝে মধ্যে করে। আর দ্বিতীয়বার দেবেন্দ্রের বিয়ে দিয়ে তার ভাঙ্গা সংসার জোড়া দিতে না পারার একটা আক্ষেপ যে তার মনে আছে, তাও তার আচার আচরণে প্রকাশ পায়। আসলে ভাইয়ের প্রতিতো কোনদিন তার মনে কোন বিদ্বেষ ছিল না। তার যত আক্রোশ সবই ছিল শৈলর উপরে। তাই ভাইয়ের শূন্য জীবন পূর্ণকরে তুলতে তার অন্তরিকতার অভাব নেই। কিন্তু দেবেন্দ্রের অমতের জন্য সে কিছুই করতে পারছে না।

শৈলর মৃত্যুর পরে শচীন্দ্রের ব্যবহারটা দেবেন্দ্রের মনে বেশ বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। এমনিতে সে একটু আত্মসর্বদ্ব ঠিকই। তবু মেজদাদা ও মেজবউঠানের প্রতি তার একটা টান ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার শৈলর মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রের এই বিপদে সে যে এতটা নিস্পৃহ থাকবে তা দেবেন্দ্র ভাবতে পারেনি। সে হয়ত ভেবেছে যদি সে দেবেন্দ্রের খোঁজখবরে আগ্রহী হয়, তবে হয়ত দেবেন্দ্র তীর্থপবিত্রকে স্নেহলতার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। দেবেন্দ্রের মনে হয় এটাই তার নিস্পৃহতার কারণ। শুধু তাই নয়। যে মহেশ বহুযত্নে ও অর্থব্যয়ে তাকে উচ্চশিক্ষা দিয়ে তার এই সফল জীবন তৈরী করে দিয়েছে তার প্রতিও শচীর এতটুকু শ্রদ্ধা বা কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। নিজের সংসার নিয়েই সে মেতে আছে। পূজা ও গরমের ছুটিতে নিয়মিত বাড়ী আসে বটে, কিন্তু বাড়ীর কোন সমস্যায় জড়ায় না। সন্তর্পণে গাঁ বাঁচিয়ে নিজেদের সুখসুবিধা ষোলআনা বজায় রেখে চলে যায়। এজন্য মহেশ মাঝে মধ্যে দুঃখ প্রকাশ করে। দেবেন্দ্র কিছুই বলে না।

দেবেন্দ্রের মন মানসিকতা দুই ভাই থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধরনের। বহুদিন সাধুসঙ্গ করে আসায় তার মন হিংসা দ্বেষ ও অহংকারমুক্ত। বিষয়ের মধ্যে থেকেও সে যথার্থ বিষয়ী নয়। একটা আধ্যাত্মিকচেতনা সবসময় তাকে বিষয় থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তাই সে নীরবে পরপর এতগুলো অঘটন সহ্য করেও ধীর স্থির থাকতে পেরেছে। শচীন্দ্র আত্মসর্বস্ব,অহংকারী,অনুদার ও আয়েসী। সে কিছুই দিতে জানেনা কিন্তু নিতে জানে ষোলআনা। কিন্তু মহেশ আবার অন্যরকম। সে পরিবার বৎসল,কর্তব্যপরায়ণ, পরিশ্রমী উদার ও কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু নারীর প্রতি তার উন্মত্ত

লিপ্সা তারএতসব সদ্‌গুণগুলিকে মূল্যহীন করে দিয়েছে। নারীর প্রতিতীব্র লালাসা তকে অধঃপাতের শেষ সীমায় নামিয়ে দিয়েছে। মহেশের জন্যই শৈলকে প্রাণ দিতে হয়েছে, আর সে বেঁচে মরে আছে। তবু দেবেন্দ্রের মহেশের প্রতি রাগ বা ঘৃণা ততটা হয় না যতটা করুণা হয়। কারণ কামপ্রবৃত্তির তাড়নায় সে নিজেকে যে নরকে পরিণত করেছে তা সে বুঝতে পারেনা। মহেশ বিদ্বান হলেও তার আত্মজ্ঞান নেই কিন্তু দেবেন্দ্র বিদ্বান নয়, কিন্তু তার মন আত্মজ্ঞানে শুদ্ধ ও সমৃদ্ধ। দেবেন্দ্রের যে কত উচ্চহৃদয় তা ভাই হয়েও মহেশ বা শচীন্দ্রের বোঝার ক্ষমতা নেই। দেবেন্দ্র উচ্চমনের মানুষ বলেই এত ঘটনার পরও ভাইয়ের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে। বাইরে দেবেন্দ্র সংসারী,অন্তরে বৈরাগী। এই ক্লেদাক্ত সংসার পরিবেশ ছেড়ে মন ছুটে যেতে চায় হরিদ্বারের সেই নির্মল পরিবেশে,গুরুসন্নিধানে। কিন্তু দুই পায়ের বেড়ী ঐ দুই মৃতহীন শিশু। ওদের মুখ চেয়ে মনের ইচ্ছাকে মনেই লয় করে দিতে হয়।

পবিত্রকে নিয়েই দেবেন্দ্রের যত সমস্যা, তীর্থকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই। সে খুবই চঞ্চল বটে, কিন্তু গুনমণি তাকে কোনরকমে সামলে নেন। ঠাম্মার খুব বাধ্য সে এবং ঠাম্মাকে খুবই ভালবাসে। আর সবচেয়ে ভাগ্যের কথা যে তার কোন অসুখবিসুখ নেই। ইদানীং দেবেন্দ্র তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। দুষ্ট হলেও স্কুলে যেতে বা লেখাপড়া করতে তার কোন আপত্তি নেই। স্কুল ও পড়াশুনায় অনেকটা সময় কেটে যাওয়ায় দুষ্টামীর সুযোগটাও একটু কম পায়। তাই তাকে নিয়ে ভাবতে হয়না। কিন্তু দেবেন্দ্রকে মুস্কিলে ফেলেছে পবিত্র। রোগে ভুগে ভুগে সে খুবই বদমেজাজী হয়ে গেছে। একবার কান্না শুরু করলে থামায় কার সাধ্য। তার সঠিক যত্নও দেবেন্দ্র করে উঠতে পারে না। একাজটা মেয়েরা যেমন পারে পুরুষরা তেমন পারে না। শিশুটার এত কষ্ট দেখেও বাড়ীর মহিলারা মুখ ফিরিয়ে থাকে। অভিমানে দেবেন্দ্রও তাদের সাহায্য চায় না। কিন্তু এভাবে চললে পবিত্রকে বাঁচানোই দায় হবে। ভেবে ভেবে হঠাৎ তার সেজদিদি সারদার কথা মনে পড়ল। সেজদিদি খুবই নরম মনের মানুষ। সর্বদা হাসিমুখ, কোন কটুকথা বলতেই জানে না। আর কেউ কোন অনুরোধ করলে সে শত অসুবিধা হলেও অনুরোধ রাখতে চেষ্টা করে। সেজদিদির শ্বশুরবাড়ীতে লোকজন বেশী। তাই কাজকর্মের চাপও বেশী। আর্থিক অবস্থাও খেয়েপড়ে থাকার মত। তেমন স্বচ্ছল নয়। তবু পবিত্রকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য রাখতে বলা যায়। সেজদিদি নিশ্চয়ই

তার অনুরোধ ঠেলে ফেলতে পারবে না। আর সেজদিদির হাতে পবিত্রর যত্নেরও কোন ত্রুটি হবে না। হাজার হোক পিসীতো। কিন্তু মুস্কিল হল সেজদিদির শ্বশুরবাড়ী বেশ দূরে। সেখানে গিয়ে কথার্বাতা বলে ব্যবস্থা করে ফিরে আসতে প্রায় আটদশদিন লেগে যাবে। এই কয়দিন পবিত্রকে দেখবে কে? অগত্যা দেবেন্দ্র এ ব্যাপারে মেজদিদি ক্ষীরোদার সঙ্গেই কথা বলল। মেজদিদিতো কোন ব্যাপারে কোন কথা বলে না। সবসময় মুখ ভার করে নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা কাজটুকু করে যায়। তাই মেজদিদিকে বলে কতটুকু সুবিধা হবে বলা যায় না। তবু দেবেন্দ্রকে বাধ্য হয়ে মনের কথাটা মেজদিদি ক্ষীরোদাকেই বলতে হল এবং আশ্চর্যজনকভাবে ক্ষীরোদার কাছ থেকে সাড়া এল যা দেবেন্দ্র আশা করতে পারেনি। ক্ষীরোদা বলল,"কথাটা মন্দ বলিসনি দেবু, পবিত্রকে সারদার কাছে দিলে ও খুবই যত্ন পাবে। একটা শিশু যে যত্নের অভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেকি আমি দেখছি না। কিন্তু আমি নিজে থেকে কিছুই করতে পারি না। আমি দুর্ভাগা। স্বামী ছিল অমানুষ. আর ছেলেটা হয়েছে অপদার্থ। লেখাপড়াও করল না। কাজেকর্মেও মন নেই। তাই আমার কোন দাম নেই। তোদের সংসারে পরিশ্রমতো কিছু কম করছি না কিন্তু তবু আমি খোঁটার ভাত খাই। এঁটো কলাপাতার মত তোদের সংসারের কিনারে পড়ে আছি।" বলে ক্ষীরোদা আঁচলে চোখ মুছল। তারপর বলল," তবে যাই করিস না কেন দেবু। একে ওকে ভর করে কি তোর সংসার চলবে? বিয়েটা করে ফেললে ভাল করতিস্। এ বিয়ে তো কোন উৎসব অনুষ্ঠান নয়, পায়ের তলায় একটু মাটি করে নেওয়া। ছেলেদুটোকে নিয়ে তো শূন্যে ভেসে চলছিস। যাক সারদার ওখানে গেলে দু'একদিনের মধ্যেই চলে যা। এ কয়দিন পবিত্রকে আমিই দেখব। এজন্য ভাবিস না। বউঠান অবশ্য ঠেস দিয়ে কথা বলবে। তা কি আর করা যাবে।"

মেজদিদি ক্ষীরোদার হাতে পবিত্রর দায়িত্ব দিয়ে দেবেন্দ্র সেজদিদির শ্বশুরবাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। শৈলর মৃত্যুর পর দেবেন্দ্র কোথাও যায়নি, যোগাযোগ কারোর সঙ্গে তেমন রাখেনি। তবে সেজদিদি সারদা দেবেন্দ্রের সবরকম খবরই রাখে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে তার দায়দায়িত্ব এত বেশী যে একবার গিয়ে যে এ বিপদে দেবেন্দ্রকে একটু দেখে আসবে সে সুযোগ কিছুতেই করে উঠতে পারছে না। তাই হঠাৎ দেবেন্দ্রকে আসতে দেখে সেজদিদি বড়ই খুশী হল। দু'একদিন সেজদিদির বাড়ীতে থেকে দেবেন্দ্র সেজদিদির কাছে তার আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত

করল। তার কথা শুনে সারদা বলল, ''একথা বলতে তুই এত কিন্তু কিন্তু করছিস কেন দেবু, পবিত্রতো আমারই ভাইপো। মাতৃহীন ভাইপোকে লালন পালন করাতো আমার অবশ্য কর্তব্য। আমি অনেক আগেই ওকে আমার কাছে নিয়ে আসার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু আমি এতদূরে আছি যে আমার কাছে ওকে নিয়ে আসলে তুই চট করে ওকে দেখতে আসতে পারবি না। তাছাড়া বাড়ীতে বউঠানরাতো সবাই আছে অসুবিধা হয়ত হবে না। বড় বউঠান অবশ্য এক এলেবেলে মানুষ। নিজের ছেলে মেয়েদেরই সামলে রাখতে পারে না। কিন্তু স্নেহলতারতো খুবই উচিত চিল পবিত্রকে ওর সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ওকে মানুষ করে তোলা। কোলকাতার বাসায় ওরতো ঠাকুরচাকরের সংসার। ওর নিজের তিন ছেলেমেয়ের সঙ্গে দিব্যি সে পবিত্রকেও লালনপালন করতে পারত। যাই বলিস দেবু আমাদের বাড়ীর মানুষগুলো যে কি ধাচেঁ গড়া ভাবলে রাগও হয় ঘেন্নাও হয়। তাছাড়া মেজদিদিই বা কি! সবসময় মুখ গোমড়া করে আলগা অলগা থাকে। অমন দুর্ভাগ্য কি আর মানুষের হয়না? আমিই বা কোন ভাল আছি। তোর ভগ্নিপতিতো তামাক টানা ছাড়া কুটোগাছটিও দু'ভাগ করেন না। আমার দেওর দূরের ইস্কুলে মাষ্টারীও করছে। আবার জমিজমার তদ্বিরও করছে। এতে কি দেওয়-জায়ের কাছে আমার মাথাটা নুয়ে থাকে না? এজন্য আমি বেশীর ভাগ হাঁড়ি ঠেলি। তাই বলে মেজদিদির মত মনে মুখে আষাঢ়ের মেঘ জমিয়ে রাখি না। সত্যি কিনা তুইই বল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি বাড়ীর কথাও ভাবি। বড়দাদা যে কি অশুভক্ষণে জন্মেছিলেন তা ঠাকুরই জানেন। অকীর্তি কুকীর্তিতো কম করলেন না। বড়দাদার জন্য তোর জীবনটা ছারেখারে গেলরে দেবু। মা মাসীতো গেলেনই। তাতেওতো যথেষ্ট হল না। শৈলর মত অমন রূপেগুণে অতুল্য বউটাকেও বেঘোরে প্রাণ দিতে হল। মেজবউয়ের জন্য চোখের জল আমি সার করেছি।'' একথা বলেই সারদা অঝোরে চোখের জল ফেলতে লাগল। দেবেন্দ্র বড়ই অবাক হল। কারণ বাড়ীতে গুনমণি ছাড়া শৈলর জন্য কাউকে একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলতে সে দেখেনি। শৈলর জন্য যত কষ্ট সবই একমাত্র তারই অন্তরে বরফ হয়ে জমে রয়েছে। সেজদিদির চোখের জলের উষ্ণতায় তার মনের জমা বরফ গলে চোখের কোন বেয়ে গড়াতে লাগল। শৈলর মৃত্যুর দেড় বছর পরে তার জন্য দেবেন্দ্রের চোখে প্রথম নামল জলেরধারা।

মানুষের কান্না স্বাভাবিকভাবেই একসময় থেমে যায়। সারদা-দেবেন্দ্রের কান্নাও একসময় থামল। শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছে সারদাই প্রথম কথা বলল, ''দেখ

দেবু দুঃখ কষ্ট বুকে নিয়ে ভেসে বেড়ালে জীবন চলে না। তোর সমস্যার সত্যিকারের সমাধান করতে হলে তোকে আবার বিয়েই করতে হবে। এখন তবু সেজমাসী আছেন। তাই চলে যাচ্ছে একরকম। কিন্তু তিনি না থাকলে খুবই মুস্কিলে পড়ে যাবি তুই। মনের দুঃখতো মনে থাকবেই। কিন্তু জীবনটাও তো চালিয়ে রাখতে হবে। যদি তোর মত থাকে তবে আমিই তোর বিয়ের ব্যবস্থা করব। আমার চেনাজানা ভাল মেয়ে আছে। এ ব্যাপারে বাড়ীর লোকের সঙ্গে কোন আলোচনা বা তাদের সহযোগিতার কোন দরকার আমি মনে করছি না। তুই অমত করিসনা দেবু, অনেক ভেবেচিন্তেই আমি কথাটা বলছি। বিয়ে শুধু বরকনের গাঁটছড়া বাঁধা নয়। বিয়ে হল পায়ের তলার মাটি।''সেজদিদির শেষের কথাটায় দেবেন্দ্রের মনে কেমন একটা দাগ কাটল। কারণ এখানে আসার আগমূহুর্তে মেজদিদিও ঠিক এ'কথাটাই বলেছিল। সে বলল,''মেজদিদিত এমনিতে কারোর ভালমন্দে বিশেষ কোন কথাবার্তা বলে না। তবে এখানে আসার আগে তোমার ঐ শেষের কথাটা কেন জানি সেও বলেছিল।''সারদা কথাটা লুফে নিয়ে বলল,''তাহলে ভেবে দেখ দেবু, কথাটা কত সত্যি। কতদূরে মেজদিদি আর কতদূরে আমি। তবু আমরা দু'জনে একই কথা বললাম। ঈশ্বরই আমাদের দু'জনের মুখ দিয়ে এই সত্যি কথাটা বলিয়েছেন। তাই আমি তোর কোন ওজর আপত্তি শুনছি না। আজই আমি নন্দ ভটচার্যের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধের জন্য তোর জামাইবাবুকে যদুপুরে পাঠাব।''একথা বলে সারদা.তৎক্ষণাৎ স্বামীকে বৈঠকখানা থেকে ডেকে আনার জন্য ছেলেকে পাঠিয়ে দিল।

সারদা ডেকেছে শুনে পীতাম্বরবাবু তাড়াতাড়ি ভিতরবাড়ীতে এলেন। স্বামীকে দেখেই সারদা কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে বলল, ''তুমিত সবসময়ই তোমার বন্ধুবান্ধব আর তামাক নিয়ে ব্যস্ত আছ। এতদিন পরে যে আমার ভাইটা এল তার সঙ্গেও যে দু'টো কথা বলতে হয়, সে জ্ঞান ও তোমার নেই।'' একথায় পীতাম্বর খুবই লজ্জিত হলেন এবং আমতা আমতা করে বললেন,''সেত নিশ্চয়ই। ওর সঙ্গে কথাবার্তাতো বলা দরকার। কিন্তু আমি ভাবলাম, অনেকদিন পরে তোমাদের ভাইবোনে দেখা। তাই দু'জনে নিরিবিলিতে নিজেদের কথাবার্তা বলে নিলে পরে আমি ওর সঙ্গে কথা বলব। সবেত এসেছে। থাকবে ত কয়দিন। ওর সঙ্গে কথাতো হবেই।'' স্বামীর কথায় সারদা হেসে বলল,''থাক আর ওর সঙ্গে কথা বলে কাজ নেই তোমার। তুমি আজই বিকেলে পাশের যদুপুর গ্রামের নন্দভট্টচার্যের মেয়ের সঙ্গে দেবুর বিয়ের কথা আলাপ করে

এস। ওদের যদি পচ্ছন্দ হয় তবে সাতদিনের মধ্যেই বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলব আমি।" পীতাম্বর বলল, পচ্ছন্দ হবে না কেন? নন্দ কবিরাজেরতো সাতমেয়ে এর মধ্যে দু'টির মাত্র বিয়ে হয়েছে। এখন প্রায় তিনটি মেয়েই বিয়ের যোগ্য। এক এক করে পার করতে হবেত। আমি আজই তিনটা সাড়ে তিনটায় চলে যাব। বিয়ের কথাও বলব আর গল্প গুজবও করে আসা যাবে।" সারদা বলল, দেখো গল্প করতে করতে আবার বিয়ের সম্বন্ধের কথাটা ভুলে যেওনা। গল্প পেলেত তোমার কাজের কথা মনেই থাকে না।" বলেই সারদা রান্নাঘরে চলে গেল। পীতাম্বর তখন শ্যালকের সঙ্গে দু'চার কথা বলে আবার বৈঠকখানায় চলে গেল।

শৈলর মৃত্যুর পর শিশুপুত্র দুটিকে নিয়ে দেবেন্দ্র যারপর নাই লাঞ্ছনা পেয়েছে এবং এখনও পাচ্ছে। এভাবে লাঞ্ছনা ভোগ করে মানুষ কতদিনই বা টিকে থাকতে পারে? মেজদিদি ও সেজদিদির কথাগুলো একেবারে ফেলনা নয়। বিয়ের মাধ্যমে পায়ের তলায় একটু মাটি তৈরী করা। বোনদের ঐ একটিমাত্র কথায় দেবেন্দ্র খুবই অভিভূত হল। তাই সারদার উদ্যোগে সে কোন বাধা দিতে পারল না। বরং সারদা যা করছে কোন চিন্তাভাবনা না করে সে তাই মেনে নিচ্ছে। নিজের অজান্তে সে যেন নিজেকে সারদার হাতে সমর্পণ করে দিয়েছে। একেই বলে নিয়তি। আমরা আসলে নিজের ইচ্ছায় কিছুই করতে পারিনা নিয়তি নির্দ্দিষ্ট পথেই আমাদের চলতে হয়। দ্বিতীয়বার বিয়ে দেবেন্দ্রের ভাগ্যে লেখা ছিল। তাই এখন সেই বিয়েই হতে চলেছে।

বাড়ীর লোকদের জানান না দিয়ে সারদার উদ্যোগে মাত্র সাতদিনের মধ্যে নন্দ ভট্চায়ের তৃতীয় মেয়ে কমলিনীর সঙ্গে খুবই অনাড়ম্বরভাবে দেবেন্দ্রের দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পরই সারদা বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দিল। বাড়ীর লোকের মতামত নেওয়া হল না বলে হয়ত বাড়ীর সবাই সারদার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে। কিন্তু সারদার তাতে যায় আসে না। কারণ বাড়ীর লোকের দেবুর প্রতি যে আচরণ, তাতে বাড়ীর লোকের প্রতি সারদার কোন ভরসা ছিল না। তাই সারদা রাগে দুঃখে তাদের কোন খবর দেয়নি। বিয়ে যখন হয়ে গিয়েছে। তখন আর চিন্তা নেই। যে যত খুশী সারদার উপর রাগ করে থাকুক, সারদা ভ্রূক্ষেপও করবেনা। তার এক চিন্তা মেয়েটি ছেলেদুটোকে আপন করে নেবে কিনা। আর এক চিন্তা মেয়েটি শ্যামবর্ণা বলে দেবুর অপছন্দ হবে কিনা। অমন রূপবান ভাইয়ের সঙ্গেত নূতন বউ তেমন মানানসই নয়। তবে সারদার বিচারে রূপ কিছুই নয়, গুণটাই বড়। তবে দেবুর পচ্ছন্দ হল কিনা এ নিয়ে সারদার একটু ভাবনা হচ্ছে।

কমলিনীর বয়স পনের বছর। বয়স অনুপাতে বেশ বাড়ন্ত। স্বাস্থ্য বেশ ভাল। চেহারা মোটামুটি মন্দ নয়। তবে বর্ণ শ্যাম। গায়ের রং ও রূপে সে শৈলর ধারে কাছেও যায় না। দেবেন্দ্র নিজে অনিন্দ্যকান্তি, তার প্রথমা স্ত্রী ছিল অপরূপা। দেবেন্দ্র নিজে মেয়ে দেখেনি। সারদার পছন্দেই হুট করে বিয়েটা হয়ে গেল। বিয়ের পর সারদার মনটা একটু খুঁত খুঁত করছিল। তাই একটু কৈফিয়তের সুরে বলল, "মানুষের রূপটাই বড় কথা নয় দেবু। আমি মনে করি গুণটাই আসল। যতদূর জানি মেয়েটি খুবই নম্রস্বভাবের, আর কাজেকর্মেও খুবই চৌকশ। তবে একথা সত্যি শৈলর মত রূপে গুণে সমান, এমন মেয়ে কোটিকে গুটিক মেলে। সব কিছু মিলিয়ে এখন একটা ভাবনা হচ্ছে দেবু। বাড়ীরও কারো মতামত নেইনি তোকেও মেয়ে দেখতে বলিনি। সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই করে ফেলেছি কাজটা। এখন মনে একটা কিন্তু কিন্তু লাগছে।" সেজদিদির কৈফিয়তদেবার ভঙ্গী দেখে দেবেন্দ্র হেসে ফেলল। বলল, "এত কিন্তু কিন্তু করছ কেন সেজদিদি? রূপগুণ নিয়ে তুমি যেমন ভাবছ, আমি তেমন ভাবছি না আমি শুধু ভাবছি আমার ছেলেদুটোকে আপন করে নিতে পারবে কিনা। মাহারা ছেলে দুটো যদি ওর কাছে একটু স্নেহভালবাসা পায় তবেই হল। পৃথিবীতে আমার আর কিছুই চাওয়ার নেই।"সারদার মাথা থেকে যেন একটা ভার নেমে গেল। উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলল, ওসবের জন্য তুই কিছু ভাবিস না দেবু। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েটি খুবই ভাল। সবার মুখেই ওর প্রশংসা শুনেছি।"

বিয়ের পরদিনই সারদা লোক মারফত বাড়ীতে খবর পাঠিয়েছিল। কারোর মতামত না নিয়ে সে যে নিজের দায়িত্বে দেবেন্দ্রের বিয়েটা সেরে ফেলেছে, এনিয়ে বাড়ীর লোক তার উপর অসন্তুষ্ট হতে পারে এমন একটা আশংকা তার মনে আগেই ছিল। তারপর খবর দেওয়া সত্ত্বেও বাড়ী থেকে কেউ না আসায় সারদা ও দেবেন্দ্রের মনে সে আশংকা দৃঢ়তর হল। তাই সাত পাঁচ ভেবে ভাইবোনে পরামর্শ করে নূতন বউকে বাপের বাড়ীতে রেখে দেবেন্দ্র একা বাড়ীতে ফিরে গেল। বাড়ীতে এসে দেখল তাদের আশংকা অমূলক। বিয়ের খবরে বাড়ীর কেউ অখুশীতো নয়ই, বরং দারুণ খুশী। মহেশ বাড়ীতে বিয়ের উৎসব অনুষ্ঠানের মস্ত আয়োজন করে শচীন্দ্রকে বরবউ নিয়ে আসার জন্য বন্দোবস্ত করেছে। এসব ব্যবস্থাপনার জন্য ওদের যেতে দেরী হয়েছে। এমন সময় দেবেন্দ্র একা বাড়ীতে ফিরে আসায় বিয়ের আরব্ধ আড়ম্বরটা আর করা হল না। এতে মহেশ বড়ই মনঃক্ষুন্ন হল। শচীন্দ্র আর দেরী না করে নূতন বউকে বাড়ীতে নিয়ে আসার জন্য রওনা হয়ে গেল।

দেবেন্দ্রের বিয়ের ব্যাপারে বাড়ীতে সবাই খুশী হলেও সমালোচনা যে একটু আধটু হয়নি তা নয়। দেবেন্দ্রের ভ্রাতৃবধূরা বিয়েটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বেশ ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছে। এসব আলোচনায় স্নেহলতাই সবসময় অগ্রণী ভূমিকা নেয়। স্থূলবুদ্ধি সরযূ অতশত বুঝতে পারে না। ছোটজায়ের তালে চলে। স্নেহলতা বিদ্রূপের সুরে বলল, ''দেখলেতো দিদি কাণ্ডকারখানা, মেজদির শোকে মেজভাশুর ঠাকুর কেমন সাধুসন্ন্যাসীর ভাব ধরেছিলেন। বিয়ের নামই তো শুনতে পারতেন না। কিন্তু তলে তলে যে পুরোমাত্রায় বিয়ের ইচ্ছে ছিল সেত তখনই আমি তোমাকে বলেছিলাম। তুমি বিশ্বাস করনি। বলেছিলে শৈলকে ঠাকুরপো এত ভালবাসত যে তার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। বলেছিলে স্বামীর এত ভালবাসা পেয়েইত শৈল সবসময় অহংকারে ডগমগ করত। কিন্তু এখন দেখলেত তোমার ধারণা কেমন মিথ্যে হয়ে গেল। তা বিয়ে করেছেন ভালই করেছেন। কিন্তু অমন লুকিয়ে বিয়ে করাটা কি খুব হাসির ব্যাপার হল না দিদি। ঢং একটা দেখালেন বটে মেজভাশুর ঠাকুর।''এসব বলে দুই জায়ে খুব হাসাহাসি করল।

ধনীর মেয়ে স্নেহলতা খুবই দাম্ভিক। তাছাড়া এতবড় বিদ্বান স্বামীর জন্যও সে গর্বিত। নিজেকে সে পরিবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। অপরের ভাল সে মোটেই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু শৈলর রূপগুণের সঙ্গে তুলনায় সে অনেক হেয় ছিল। তাই শৈলকে সে সহ্য করতে পারত না। কারণে অকারণে সে শৈলর এমনকি দেবেন্দ্রের নিন্দামন্দ করত। নিন্দামন্দে অবশ্য স্নেহলতার বরাবরই বেশ রুচি আছে। এতদিন শৈলর নিন্দায় দিন কেটেছে। এখন নূতন যে আসছে তার নিন্দামন্দ খুঁজে বের করার জন্য স্নেহলতা বেশ তৈরী হয়েই আছে।

শচীন্দ্র মেজদাদার নূতন শ্বশুর বাড়ীতে ও সেজদিদির বাড়ীতে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে নূতন মেজবউঠানকে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এল। নূতন বউ বাড়ীতে আসার জন্য কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হল না। কারণ বিয়েত হয়ে গেছে অনেক আগেই। শুধু বাড়ীর সবাই নূতন বউ দেখার জন্য গুণমণির ঘরে সমবেত হল। গুণমণি ও মহেশের ইচ্ছে ছিল বউ আসলে অন্ততঃ শাঁখ বাজুক, উলুধ্বনি দেওয়া হউক, কিন্তু দেবেন্দ্র তাও করতে দিল না। এতে সরযূ ও স্নেহলতা বেশ একটু দমে গেল। কারণ ওগুলো তাদের কাজ। তারা ভেবেছিল বেশ অনীহা প্রকাশ করে শেষ পর্যন্ত তারা এ মাঙ্গলিক কাজটুকু করবে। কিন্তু যারা শিশুদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, মাঙ্গলিক ক্রিয়ায় তাদের ভূমিকা দেবেন্দ্র গ্রহণ করল না। ভাগ্যের পরিহাসে দেবেন্দ্রের দুই

বিয়েতেই কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হল না।

গুণমণি তীর্থ পবিত্রসহ বাড়ীর সবার সঙ্গে নূতন বউয়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং যারা প্রণম্য তাদের প্রণাম করতে বললেন। নূতন বউ মাসীশাশুড়ীর নির্দ্দেশমত প্রণম্যদের প্রণাম করল। এরপর গুণমণি নূতন বউকে দেখিয়ে তীর্থ পবিত্রকে হললেন, "আজ তোমাদের নূতন মা এসেছে। তোমরা মায়ের কাছে যাও।" আর নূতন বউকে বললেন, "তোমার এই দুই ছেলেকে এতদিন আমি আগলে রেখেছি মা, এবার ওদের তোমার হাতে সমর্পণ করে আমি মুক্ত হলাম।" কিন্তু তীর্থ পবিত্র চট করে নূতন মায়ের কাছে গেল না, পবিত্র ঠাম্মার কোল আঁকড়ে রইল আর তীর্থও ঠাম্মার গাঁ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।

পবিত্রর শীর্ণ শরীর, শৈলর মত ধবধবে ফরসা গায়ের রং, শৈলর মতই নিবিড় কালো চোখ। সে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নূতন মাকে দেখছে। কারণ মা কাকে বলে সে জানে না। আর মাতৃত্ব কাকে বলে, নবীনা নববধূ কমলিনীও তা জানে না। কিন্তু বিধাতা বোধহয় অলক্ষ্যে জাগিয়ে তুললেন তার মধ্যে সুপ্ত মাতৃত্ব, যা সব মেয়েদের অন্তরেই সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে । অদ্ভুত এক মমতায় ভরে উঠল কমলিনীর মন। নিজের অজান্তে অসীম স্নেহে মাসী শাশুড়ীর কোল থেকে পবিত্রকে নিজের কোলে তুলে নিল সে। আর ঠাম্মার আঁচলধরা তীর্থকে ও হাত ধরে নিজের কাছে টেনে আনল। পবিত্র পরম নিশ্চিন্তে নূতন মায়ের বুকে মুখ গুঁজে রইল। মা হারা আজ মা পেল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এই দৃশ্য উপস্থিত সবার হৃদয় স্পর্শ করল, সবার চোখ সজল হল। আর গুণমণিত ডাক ছেড়ে কেঁদেই উঠলেন। শচীন্দ্র কোঁচার খুঁট দিয়ে ঘনঘন চোখ মুছতে লাগল। মহেশ মুখ ফিরিয়ে আগত অশ্রু রোধ করতে চেষ্টা করতে লাগল। নির্মল এই পরিবেশের প্রভাবে তার কামতাড়িত হৃদয় স্নেহরসে সিক্ত হয়ে উঠল। এমন কি যে সরযূ ও স্নেহলতা তীর্থপবিত্রকে চরম তাচ্ছিল্য করে এসেছে, ওদেরও চোখ শুষ্ক রইল না। তাদের অন্তর থেকে তীর্থপবিত্রের প্রতি বিরূপ ভাবটা চিরতরে উবে গেল। অনেকদিন পরে স্নেহপ্রীতির একটা স্নিগ্ধ মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হল। সবার মন থেকে সব রকম গ্লানি, ক্ষুদ্রতা সে সময় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। শ্যামলা কমলিনী যেন আঁচলে বেঁধে শান্তি নিয়ে এসেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই স্নিগ্ধ মধুর পরিবেশটা দেবেন্দ্রই শুধু দেখল না। কারণ এই পারিবারিক সমাবেশে সে উপস্থিত ছিল না।

কমলিনী সুন্দরী নয়, বড়লোক বাপের মেয়েও নয়, গৃহেকর্মেও এমন কিছু

সুপটু নয়। তবু তার চারিত্রিক মাধুর্যে ও ভাগ্যের গুণে সে সবার অজান্তে সকলের মন জয় করে নিয়েছে। এমন দাম্ভিক যে স্নেহলতা সেও নিজের চেয়ে বয়সে ছোট এই বড়জাটিকে বড়ই প্রীতির চোখে দেখতে শুরু করেছে। দু'জনে সব সময় এক সঙ্গে থাকে নানা গল্পগুজব করে। এমন কি মাঝে মধ্যে নিজের শাড়ী গয়না দিয়ে কমলিনীকে সাজিয়ে পর্যন্ত দেয়। দাম্ভিক স্নেহলতার এই সদয় ব্যবহারে বাড়ীর সবাই বিস্মিত হয়। কমলিনীও অবশ্য বয়সে বড়, সাজেগোজে পরিপাটি ভারিক্কি এই ছোটজাটিকে মোটামুটি মান্য করেই চলে। এতে স্নেহলতা বড়ই খুশী হয়। কারণ মান্যগণ্য পেতে সে বড়ই পছন্দ করে।

কমলিনী আসার পর স্নেহলতা খুব বেশীদিন বাড়ীতে রইল না। অল্প কিছুদিন পরেই শচীন্দ্র স্ত্রীপুত্র নিয়ে তার কর্মস্থান কোলকাতায় চলে গেল। বাড়ীতে রইল বড় বউ সরযূ আর মেজবউ কমলিনী। সরযূর বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়ে। এতগুলো ছেলেমেয়ে সামলানোর ঝামেলা নেহাৎ কম নয়। কাজে কর্মে সে বরাবরই ঢিলেঢালা ও অলস। তাই কমলিনী আসার পর সে দিব্যি গা এলিয়ে দিল। এতে নূতন বউ কমলিনীর উপর কাজকর্মের চাপটা পড়ে গেল খুবই বেশী। কমলিনী অলস অকর্মন্য নয়,তবু বয়সটা নেহাৎ কম বলে সবসময় সবদিক সামলে উঠতে পারেনা। এতে অবশ্য বাড়ীর কেউই কোনরকম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে না। কমলিনীর বয়সটা যে কম, এটা সবাই মাথায় রাখে।

রূপেগুণে কোনদিক দিয়েই শৈলর সঙ্গে কমলিনীর মিল নেই। শৈল ছিল অনিন্দ্যসুন্দরী, তুলনায় কমলিনীর চেহারা নিষ্প্রভ। কাজকর্মেও কমলিনীর শৈলর মত নৈপুন্য ও পরিপাট্য নেই। শৈল ছিল খুবই বুদ্ধিমতী আর কমলিনী সহজসরল। কমলিনী মৃদুভাষী নম্রস্বভাবের আর শৈল ছিল স্পষ্টভাষী খরস্বভাবের। তৎকালীন যুগ অনুপাতে শৈলকে মোটামুটি বিদূষীই বলা যায়। তার বুদ্ধি,বোধি ও মেধাশক্তি এমন ছিল যে তালিম পেলে স্বানামধন্য হয়ে উঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা তার মধ্যে ছিল। কমলিনীর লেখাপড়া অতি সামান্য। বোধ বুদ্ধি ও তার উচুঁদরের নয়। শৈল সবদিক দিয়েই উজ্জ্বল। কমলিনী স্নিগ্ধ। শ্বশুর বাড়ীতেও দু'জনের অবস্থান দুই মেরুতে। স্বভাবের মাধুর্যে অথবা ভাগ্যের গুণে কমলিনী শ্বশুর বাড়ীতে সবারই আদরণীয়া। কিন্তু স্বভাবদোষে অথবা ভাগ্যদোষে শৈল প্রাণপাত কর্তব্য করেও স্বামী ছাড়া আর কারোর বিশেষ প্রিয় হতে পারেনি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল কমলিনীর প্রতি মহেশের অকৃত্রিম স্নেহ। মেজবৌমা বলতে সে যেন একেবারে অজ্ঞান। অন্তরের অন্তস্থলে

মহেশ কমলিনীর সঙ্গে নিজের পিতাপুত্রীর সম্পর্কঅনুভব করে। ভ্রাতৃবধূ কমলিনীর প্রতি মহেশের অন্তহীন স্নেহ। কত বিচিত্র মানুষের মন, কত বিচিত্র তার আচরণ। কত বিচিত্র তার নীতিবোধ। শৈলর জন্য যার অন্তরে ছিল আদিম লালসা ও হিংসার বিষকুম্ভ, তারই অন্তরে কমলিনীর জন্য বয়ে চলেছে বাৎসল্যের ফল্গুধারা। সবই শৈলর নিয়তি। মহেশের কাছ থেকে শৈল যদি কমলিনীর মত ব্যবহার পেত, তবে হয়ত শৈল শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মহেশের পায়ে গড়াগড়ি দিত। কিন্তু কোন অদৃশ্য নিয়তির টানে বিদ্বান বিচারশীল হৃদয়বান মহেশ বৈধ সম্পর্ক ছেড়ে শৈলর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিল। আর সেই প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার জন্য শৈলকে নির্মমভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। অথচ প্রাণচঞ্চল শৈল এই সুন্দর পৃথিবীকে ভালবেসেছিল, আপন পরিবেশের মানুষজনদের ভালবাসতে চেয়েছিল, শ্রদ্ধা করতে চেয়েছিল। সবার মধ্যে সুখেদুঃখে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু শৈল পারল না। যা কিছু তার দেওয়ার ছিল দেওয়া হল না, যা কিছু তার পাওয়ার ছিল পাওয়া হল না। কামান্ধ পুরুষের পশুপ্রবৃত্তি তাকে অকালে মৃত্যুর কবলে ছুঁড়ে দিল। কি নির্মম পরিণতি মেনে নিতে হল রূপবতী গুণবতী শৈলকে। এসব ভেবে দেবেন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

তবে একটি ব্যাপারে দেবেন্দ্র বড় সুখী ও নিশ্চিন্তবোধ করে। কমলিনীর বয়স যদিও অল্প, তবু সে খুব নিপুণভাবেই তীর্থপবিত্রের সেবাযত্ন করে এবং আশ্চর্যের ব্যাপার যে কমলিনীর যত্নে খুব অল্পদিনের মধ্যেই পবিত্রর শরীর সেরে উঠে। তার মেজাজও আর আগের মত খিটখিটে নেই। সে এখন অন্য আর দশটা শিশুর মতই চঞ্চল হাসি খুশী। নূতন মাকে সে খুবই ভালবাসে। মা ছাড়া সে কিছু বুঝে না। আর কমলিনীও পবিত্রকে চোখের আড়াল করে না।পবিত্রর প্রতি কমলিনীর এই স্নেহ দেখে দেবেন্দ্রের হৃদয় জুড়িয়ে যায়। শৈলর মৃত্যুর পর কতজনের উপরইতো সে পবিত্রর লালনপালনের দায়িত্ব দিয়েছিল। কিন্তু কেউই ঠিকমত মাতৃহীন শিশুটির যত্ন নেয়নি। কিন্তু কমলিনী আসার অলঙ্কদিনের মধ্যেই তার যত্নে পবিত্র কেমন সেরে উঠেছে। এজন্য দেবেন্দ্র মনে মনে কমলিনীর কাছে কৃতজ্ঞ। শুধু পবিত্র নয়, তীর্থের প্রতিও কমলিনীর সমান নজর। তাকে সময়মত স্কুলে পাঠানো ও পড়তে বসানো, তার বইপত্র গুছিয়ে রাখা এসব দিকেও কমলিনীর যথেষ্ট দৃষ্টি আছে। কমলিনীর কাছে তীর্থপবিত্রর যত্ন আগে, সংসারের সবকাজ পরে। আর শুধু-পবিত্র নয়। তীর্থেরও মায়ের প্রতি খুব টান। ছেলেদের ব্যাপারে এখন দেবেন্দ্রের কোন ভাবনা চিন্তা নেই। দেবেন্দ্রের

নিজের জন্য চাওয়া পাওয়ার কিছুই নেই। ছেলেরা যে মা পেয়ে গেছে এটাই দেবেন্দ্রের কাছে পরমপ্রাপ্তি বলে মনে হয়।

এই রায়পরিবার একটি অভিশপ্ত পরিবার। ভাগ্যবিধাতা যেন এদের প্রতি বড়ই বিরূপ। অনেক ক্ষয়ক্ষতির পর এখন এদের পারিবারিক সুস্থিতি ফিরে এসেছে বটে। কিন্তু বাইরে অশান্তি উপদ্রবের অন্ত নেই। গ্রামে কেউই এই পরিবারটিকে সুনজরে দেখে না। তার উপর অভয় নমঃ জেল থেকে ছাড়া পেয়েই সাঙ্গপাঙ্গ সহ রায়দের পিছনে লেগেছে। দেবেন্দ্রের প্রতিই তার আক্রোশটা বেশী। তার নিত্য উপদ্রবে অতিষ্ঠ রায়পরিবার। সে বাড়ীতে আগুন লাগায়, ঢিল ছুড়ে, রাতের অন্ধকারে ক্ষেতের ফসল কেটে নেয়, বিষ ঢেলে পুকুরের মাছ মেরে ফেলে ইত্যাদি হরেক রকমের উপদ্রব করে। তার উপর আছে দেবেন্দ্রকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা। যাতায়াতের পথে অভয়ের আক্রমণে দেবেন্দ্র বেশ কয়েকবারই অল্পবিস্তর আহত হয়েছে। একবারতো অভয় বল্লমের ঘায়ে দেবেন্দ্রকে প্রায় শেষ করেই দিয়েছিল। ঈশ্বরের দয়ায় অল্পের জন্য দেবেন্দ্র বেঁচেযায়। অভয়ের এই অত্যাচারের পিছনে মজুমদাররা সহ গ্রামের প্রায় সব হিন্দুদেরই পরোক্ষ মদত আছে।

অভয়ের এই অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য মহেশ এবং দেবেন্দ্র বার বার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। অভয়ের অপরাধ কখন প্রমাণিত হয়েছে, কখনও হয়নি। অপরাধ কখনও প্রমানিত হলে অভয়ের শাস্তি হয়েছে, বার বার জেল খেটেছে। কিন্তু সে এতটুকু দমেনি। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই সে রায়পরিবারের পিছনে লেগেছে।

মামলা মোকদ্দমায় ঝক্কিঝামেলা যেমন আছে। তেমনি আছে পর্যাপ্ত অর্থব্যয়। যা আয় হয় তার সিংহভাগই খরচ হয়ে যায় মামলা মোকদ্দমায়। বৈষয়িক উন্নতির জন্য কোন খরচ করা সম্ভব হয় না। মূলতঃ পরিবারের একজনের একটি দোষের জের দীর্ঘদিন ধরে গোটা পরিবারকে টেনে যেতে হচ্ছে। যে পাপকর্ম আত্মজনের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল, তারই ফল এই শত্রুতা, অর্থব্যয় অশান্তি। অবশ্য রায়রা এসব তাদের ভাগ্যের দোষ বলেই মনে করে। এই শত্রুতার মূল কারণ অনুসন্ধান করে না। আত্মদোষ চিন্তা করে না।

ছোট ছেলের জন্মের পর থেকেই সরযূবালার শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। প্রথমদিকে রোগটাকে সে মোটেই আমল দেয়নি। শারীরিক অসুবিধার কথা কাউকে জানায়ওনি। মহেশ সদাব্যস্ত মানুষ। কাজেই স্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করার মত সময় তার ছিল না। রোগের বাড়াবাড়ি হলে ডাক্তার ডাকা হল। দেখা গেল তার ক্যান্সার হয়েছে।

এ রোগেরত আর রক্ষা নেই। তখনকার দিনে চিকিৎসাও তেমন উন্নত ছিল না কাজেই রোগের প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলল। বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকার পর সরযূ মারা গেল।

আটটি সন্তানের মা হয়েছিল সরযূ। এরমধ্যে তিনটি শৈশবেই মারা যায়। মৃত্যুকালে সে চার ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছে। এরমধ্যে ছোট ছেলেটির বয়স মাত্র আড়াই বছর। ঘরে দেখাশোনার মত অন্যকোন স্ত্রীলোক না থাকাতে সরযূর সন্তানদের দায়দায়িত্বও পড়ল কমলিনীর উপর। বিশেষ করে সরযূর ছোট ছেলেটি খুবই ছোট আর রুগ্ন বলে তার যত্ন আত্তিতে কমলিনীকে যথেষ্ট সময় দিতে হয়। এদিকে গুণমণিও একান্ত বৃদ্ধা হয়ে গেছেন। তারও যথেষ্ট সেবাযত্ন দরকার। এমন অবস্থায় সবকিছু সামলাতে কমলিনীকে হিমসিম খেতে হয়। মেজদিদি ক্ষীরোদা অবশ্য আছে। কিন্তু তার সবসময়ই একটা আলগা আলগা ভাব। তার মনে এমন একটা ক্ষোভ অভিমান যে তার দুর্ভাগ্যের জন্য যেন গোটা পরিবারটাই দায়ী। মাঝে মাঝে সে সংসারের কাজে হাত লাগায়, আর কোন সময় হাজার বিশৃংখলা থাকলেও সে বাড়ীর বাইরে রাস্তার পাশে বড় কাঁঠালগাছটার নীচে বসে থাকে, আর গুণ-গুণ করে দুঃখের গান গায়। সে এ গ্রামের মেয়ে,তাই তার রাস্তার পাশে গাছের নীচে বসে থাকাটা কারোর কাছেই দৃষ্টিকটু ঠেকে না। বরং পরিচিত পথচারীদের কাছ থেকে কিছুটা সহানুভূতি মিলে। কাজেই এতবড় সংসারের দায়িত্ব কমলিনীর উপরই। কমলিনীর এই গুরুভার লঘু করার জন্য বাড়ীর সবাই চিন্তভাবনাও করছে।

মহেশের বড় ছেলে সৌভাগ্য এখন বিবাহযোগ্য। তার বিয়ে দিয়ে যদি ঘরে একটি বউ আনা যায় তবে কমলিনীর উপর যে গৃহকর্মের মাত্রাতিরিক্ত চাপ তা একটু কমবে। তাই সৌভাগ্যের বিয়ের জন্য সম্বন্ধ দেখা শুরু হল। তাছাড়া মহেশেরও তো বয়স হয়েছে। এ বয়সে স্ত্রী মারা গেলে স্বাভাবিকভাবেই সেবাযত্নের অভাব ঘটে। পুত্রবধূ ঘরে এলে মহেশেরও ঠিকমত সেবাযত্ন হবে। তাই সৌভাগ্যের বিয়ের জন্য বাড়ীর সবাই উঠে পড়ে লেগে গেল। এমনি পরিস্থিতিতে প্রবীণ মহেশ বাড়ীর কাউকে না জানিয়ে এক অসহায় গরীব বিধবার নেহাৎ অল্পবয়সী মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে তুলল। এ বয়সে তার এই কাণ্ড দেখে বাড়ীর সবাই যেমন অবাক হল তেমনি বিরক্ত হল। কিন্তু মহেশের এ ব্যাপারে কোন হায়ালজ্জা নেই। যা ঘটার তাতো ঘটেই গেছে। ব্যাপারটা মেনে নিতেই হল। তবে এ ঘটনার কারণে সৌভাগ্যের বিয়ের চেষ্টাটা আপাততঃ স্থগিত রইল।

মহেশের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর বয়স মাত্র পনের, আর মহেশের বয়স একান্ন। নববধূ বিমলার চেহারাও বেশ ভালই। নেহাৎ গরীব বলেই তার অসহায় বিধবা মা এমন অধিক বয়সের পাত্রের হাতে তাকে তুলে দিয়েছে। যাই হউক বউ যখন একটা ঘরে এসেছে তখন সাংসারিক কাজকর্মের সুবিধাতো খানিকটা হবেই। কিন্তু কার্যতঃ সেটা হল না। নূতন বউ বিমলা যেমন অলস তেমনি অকর্মা। তাছাড়া হায়ালজ্জা বলতে তার কিছু নেই। কোনরকম ভদ্রতা শোভনতার ধার সে ধারে না। আর সে ভীষণ মুখরা। ছোটজাতের মেয়ের মত তার আচরণ ও কথাবার্তা। তাই বাড়ীর সবাই মান বাঁচাতে তাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে। বিমলা বউ হয়ে আসায় সংসারের কাজকর্মের কোন সুবিধাতো হলই না বরং বাড়ীতে ঝগড়া কাজিয়া চীৎকার চেচাঁমেচির সূত্রপাত হল। এ বাড়ীতে পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ-আবাদ যাই থাক না কেন, এমন চীৎকার চেচাঁমেচি করে কেউ কোনদিন ঝগড়া করে নি। বিমলা বাড়ীতে এই একটা নূতন জিনিস আমদানী করল।

সংসারের কাজের বোঝা যথারীতি আগের মতই কমলিনীর মাথায় চেপে রইল। সারাদিন তার নাওয়া খাওয়ারও সময় হয় না। নির্লজ্জ বিমলার তাতে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। সে দিব্যি খায় দায়। আর ঝগড়ার সুযোগ খুঁজে। তাছাড়া বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা বলে স্বামীর কাছে তার প্রশ্রয়টাও খুবই বেশী। এই প্রশ্রয়েও সে ধরাকে সরাজ্ঞান করে চলে।

অবস্থা দেখতে দেখতে দেবেন্দ্র মনে মনে খুবই অসহ্যবোধ করল। তাই কাউকে কিছু না বলে সে রান্নার ঠাকুর নিযুক্ত করল। এতে মনে মনে সবাই একটু অসন্তুষ্টবোধ করলেও মুখে বলার মত কিছু ছিল না। কারণ শুধু একজন সারাদিন হেঁশেল ঠেলবে আর অন্যরা পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকবে তাতো হয় না। তবে এতেও সমস্যার অন্ত নেই। ঠাকুরের রান্না কারোরই মুখে রোচে না। কোনদিন নুন বেশী, কোনদিন ঝাল বেশী, কোনদিন বা তরকারী সিদ্ধ হয় না,কোনদিন বা ভাত গলে যায় ইত্যাদি নানান অসুবিধা। এসব অসুবিধা দেখে কমলিনী আবার হেঁশেলে ঢুকতে চাইলেও দেবেন্দ্র প্রবল বাধা দিল। তাই রান্নার ঠাকুর যেমন রান্না করে তেমনই সবাইকে খেতে হল। দেবেন্দ্রের এই ব্যবস্থাপনায় বিমলাও যেন একটু দমে গেল। পরিবারে এই রান্নার ঠাকুর রাখার ব্যবস্থাটা দীর্ঘদিনই চালু রইল।

বিয়ের কিছুদিন পরেই বিমলার পর পর চারটি ছেলে হল এবং অধিক বয়সী পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হলে ভাগ্যে যা ঘটে বিমলার ভাগ্যেও তাই ঘটল। বিয়ের প্রায় নয়

বছরের মধ্যেই বিমলা বিধবা হল। মহেশ যখন মারা যায় তখন বিমলার ছোট ছেলের বয়স মাত্র দুই মাস। বিমলার প্রথম পুত্র আঁতুড়েই মারা গিয়েছিল। তিনটি অবোধ শিশুসন্তান নিয়ে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে বিমলাকে বৈধব্য বরণ করতে হল।

মহেশের মৃত্যুটা হঠাৎই হয়েছিল, স্বাস্থ্য তার বরাবরই ভাল ছিল। অসুখ বিসুখ তার কোনকালেই ছিল না। মহেশের একমাত্র মেয়ে শিবানীর বিয়ের রাতে তার পায়ে একটা কাঁটা ফুটে যায়। কাঁটাটা পা থেকে বের করে আনলেও সেটা সম্পূর্ণ বের হয়ে এসেছে কিনা বুঝা যায়নি। এরপর থেকে তার পাটা ধীরে ধীরে ফুলে উঠে ও পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে তার শরীরও ফুলে গেল ও গায়ের চামড়া লালচে হয়ে গেল। সারা গায়ে তার তীব্র জ্বালা. জ্বালায় সে সবসময় ছটফট করছে। চোখে একবিন্দু ঘুম নেই। তার জ্বালাযন্ত্রণা এমন যে চোখে দেখে সহ্য করা যায় না। কোন ওষুধেই জ্বালার উপশম হয় না। ডাক্তার কবিরাজ রোগটাও সঠিক ধরতে পাবছেন না। শরীরের ফোলা দিন দিন বাড়ছেতো বাড়ছেই। শবীরের লালচে চামড়া দিনে দিনে আগুনে ঝলসে যাওয়া চামড়ার মত কালচে হয়ে যাচ্ছে। বিষম যন্ত্রণায় সে দিনরাত কাতরাচ্ছে। রোগী ঘুমাতে পারে না. খেতে পাবে না, চোখ দুটো একটু সময়েব জন্যও বন্ধ করতে পারে না। চোখ বন্ধ করলেই দেখা দেয় অন্য এক উপসর্গ। চোখ বন্ধ করলেই মহেশ দেখতে পায় একদল সুন্দরী মেয়ে তীক্ষ্ণ ছোড়া হাতে নিয়ে তাকে মারবার জন্য ঘিরে ধরেছে। আর একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে এলোচুলে ছড়িহাতে নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাকে মারবার জন্য ওদের নির্দেশ দিচ্ছে। চোখ খুলে "বাঁচাও বাঁচাও" বলে মহেশ চীৎকার করছে আর বলছে, "ওদের তাড়িয়ে দাও, দেখতে পাচ্ছ না ঐ সুন্দরী মেয়েগুলো ছোড়াহাতে আমাকে মারতে চাইছে। কিন্তু ঘরের কেউ কিছু দেখতে পায় না। আর দেখতে পায় না বলে মহেশ বড়ই বিরক্ত হয়। দিনরাত মহেশ বিকারের ঘোরে এমন আর্তনাদ করে চলেছে।

বাড়ীর লোক বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছে। কি করবে না করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। শচীন্দ্র অনেক টাকা খরচ করে কোলকাতা থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে এল। বড় ডাক্তার অনেক পরীক্ষা নিরী ক্ষা করলেন, কিন্তু রোগ নির্ণয় করতে পারলেন বলে মনে হল না। তিনি গাদা গাদা ওষুধ লিখে দিলেন। কিন্তু সেই ওষুধে রোগীর অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হল না, বরং অবনতির দিকেই যেতে লাগল। মজুমদাররা আড়ালে আবডালে বলে বেড়াতে লাগল "এ কোন রোগ নয়,পাপ। যে আগুনে মা মাসীকে দগ্ধ করেছে, সেই আগুনেই এখন নিজে জ্বলে পুড়েমরছে।" এসব উড়ো কথা রায়দের

কানেও পৌঁছে যায়। নীরবে কথাগুলো সহ্য করা ছাড়া কোন প্রতিবাদের ভাষা তারা খুঁজে পায় না। ঘরেও যে এধরনের কথাবার্তা গোপনে হয় না তা নয়। শিবানীর বিয়ে উপলক্ষে লবঙ্গ, সারদা এসেছিল বাপের বাড়ীতে। আর ক্ষীরোদাতো আছেই। দাদার অসুখ দেখে ওরা রয়ে গেছে। তিনবোনে মিলে মাঝে মধ্যে কানাকানি করে বলে, "বড়দাদার অনেক গুণ থাকলেও একটি দোষত কারোর অজানা নেই। অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছেন বড়দাদা। ঘোরের মধ্যে ওই ছোঁড়াহাতে যে সুন্দর মেয়েগুলো দেখছেন তিনি, ওগুলো ওইসব মেয়েদের আত্মা, আর ছড়িহাতে যে মেয়ে তাকে দেখা দিচ্ছে সে নিশ্চয় আমাদের শৈলর আত্মা। পাপ কখনও ঈশ্বর ক্ষমা করেন না এবং এ জন্মের পাপ এজন্মেই ভোগ করতে হয়। পাপের ফলেই বড়দাদা এত কষ্ট পাচ্ছেন।" এ ব্যাপারে তিনবোনই একমত। তবে তাদের এসব কথাবার্তা খুবই গোপনে হয়।

তীব্র জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে অবশেষে কাঁটা ফোঁটার একুশদিনের দিন মহেশ মারা গেল। গুণমণি তখনও বেঁচে। তিনি থাকতে মহেশ চলে যাওয়ায় তিনি খুবই শোকগ্রস্ত হলেন। অল্পবয়সে বিমলার বৈধব্য দেবেন্দ্র শচীন্দ্রকে বড়ই মর্মাহত করল। মহেশের মৃত্যুর পর গ্রামের লোকেরা আর তেমন মুখ ফিরিয়ে রইল না। দাহকার্যে অনেকে এল। শ্রাদ্ধেও সবাই না এলেও কিছুসংখক এল। নির্বিঘ্নেই মহেশের শ্রাদ্ধাদির কাজ সম্পন্ন হল।

মহেশের মৃত্যুর ক্ষণটা ভাল ছিল না। তাই তার মৃত্যুর পর পরিবারে নানা দৈব দুর্ঘটনা দেখা দিল। বিমলার দুই বছরের শিশুপুত্রটি জলে ডুবে মরে গেল। গাইগরুর মধ্যেও মড়ক লাগল। দুটিমাত্র বাছুর ছাড়া গোয়ালের সব গরু মরে গেল। লবঙ্গর শ্বশুরবাড়ীতে আচমকা দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ল এবং দেওয়াল চাপা পড়ে লবঙ্গরও মারা গেল। মহেশের মৃত্যুর সময়ে ছোটবউ স্নেহলতার গর্ভে সন্তান ছিল। সেই সন্তান গর্ভেই মারা গেল। আর মৃত সন্তান প্রসবকালে স্নেহলতা প্রায় মৃত্যুর মুখামুখী হয়েও কোনরকমে বেঁচে উঠল। কিন্তু ঠিক সুস্থ হল না। এতসব দৈবদুর্ঘটনা দেখে গুণমণি প্রমাদ গুণলেন। তিনি পুরোহিত ডেকে বাড়ীতে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করালেন। তারপর আর তেমন কোন অঘটন ঘটল না।

মহেশের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই দেবেন্দ্রকেই নিতে হল। মহেশ দেবেন্দ্রের চূড়ান্ত অনিষ্টসাধন করে গেছে। কিন্তু দেবেন্দ্র কোনদিন মহেশের কোন অনিষ্টচিন্তা করেনি। তাই বিধবা ভ্রাতৃবধূ ও পিতৃহীন ভ্রাতৃস্পুত্রদের সে নিজের সন্তানের চেয়ে অধিকস্নেহে প্রতিপালন করতে লাগল। তাদের প্রতি কর্তব্যে তার

এতটুকু শিথিলতা নেই। সে মহেশের মৃত্যুর পরে তার বড় ছেলে সৌভাগ্যের বিয়ে দিল। পড়ুয়া ছেলেদের ভাল স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য তাদের কোলকাতা শচীন্দ্রের বাসায় পাঠিয়ে দিল। শচীন্দ্র বরাবরই দায়দায়িত্ব এড়িয়ে চলে। তাছাড়া স্নেহলতার অসুস্থতার জন্য সে বেশ একটু অশান্তি অসুবিধায়ই আছে। তবু মৃত ভাইয়ের সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্বটা তাকে নিতেই হল।

বাড়ীর মধ্যে দেবেন্দ্রের বড়ছেলে তীর্থই সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র। তাকেই প্রথমে ভালস্কুলে ভর্তি করা উচিত ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্র তাকে ভালস্কুলে ভর্তি করার জন্য ভাইয়ের ওখানে পাঠাল না। এমন কি তার পড়াশুনার ব্যাপারে যতটুকু যত্ন নেওয়া উচিত তাও নিল না। ভ্রাতৃস্পুত্রদের পড়াশুনার ভাবনাটাই তার বেশী। দেবেন্দ্রের আত্মস্বার্থের চিন্তা নেই বললেই চলে পরার্থে নিজেকে নিয়োজিত রাখাই তার চিরকালের স্বভাব। এজন্য ইদানীংকালে কমলিনীর সঙ্গে প্রায়ই তার মত বিরোধ হয়। অমন মেধাবী ছাত্র তীর্থর পড়াশুনার যত্ন নেওয়া হচ্ছে না বলে কমলিনী বড়ই অসন্তুষ্ট, তাছাড়া আরও চিন্তা আছে কমলিনীর। তার নিজেরও পর পর তিনটি মেয়ে হয়েছে। ভাগ্যদোষে মেয়েগুলি বাপের ফর্সা রংটা পায়নি। মায়ের মত শ্যামলা রং পেয়েছে। বিয়ের বাজারে শ্যামলা মেয়ের কদর নেই। অর্থের জোরেই এদের পার করতে হবে। তাই এখন থেকেই অর্থের সংস্থান করা উচিত। কিন্তু দেবেন্দ্র এসব চিন্তার ধারে কাছেও যায় না। একান্নবর্তী সংসারের ঘানি টেনে আখেরে যে নিজেদের চূড়ান্ত ক্ষতি হবে, এ কথাটা দেবেন্দ্রকে কমলিনী কিছুতেই বুঝাতে পারে না। তবু তীর্থ যদি পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারে, তবে সে একটা ভাল চাকরী পেয়ে সংসারের হাল ধরতে পারে। কাজেই আর কিছু না হউক তীর্থেব পড়াশুনার জন্য অন্ততঃ যত্ন নেওয়া দরকার। এসব নিয়ে দেবেন্দ্রের সঙ্গে কমলিনীর একটা খিটমিটি লেগেই আছে। তীর্থ এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। তার জন্য দু'একজন ভাল প্রাইভেট টিউটর রাখা খুবই জরুরী। কিন্তু অনেক বলা সত্ত্বে দেবেন্দ্র এ ব্যাপারে মোটেই গা করছে না। কমলিনী আর সহ্য করতে পারল না। ঠাণ্ডামেজাজের কমলিনী মেজাজ গরম করল। দেবেন্দ্রের সঙ্গে এ নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়াঝাটি হল। অবশেষে কমলিনীর কথামত টিউটর রাখা হল। তীর্থ পরীক্ষায় চূড়ান্ত ভাল ফল করল, কমলিনীর আশা পূর্ণ হল। তীর্থ পাশ করার পরে আর একটা বড় সমস্যা দেখা দিল। এখানে কলেজ নেই। কলেজে পড়তে হলে তাকে কোলকাতায়ই যেতে হবে, কিন্তু তীর্থকে কোলকাতায় শচীন্দ্রের বাসায় পাঠাতে দেবেন্দ্রের মনে বড়ই দ্বিধা সংকোচ। কারো মুখাপেক্ষী হতে দেবেন্দ্রের একেবারে মন চায় না।

কারণ শৈলর মৃত্যুর পর তীর্থপবিত্রকে কেন্দ্র করে বাড়ীর লোক যে দুর্ব্যবহার করেছিল, তা সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। তাছাড়া ইদানীং শচীন্দ্রের উপর দিয়েও মস্ত বিপর্যয় গেছে এবং যাচ্ছে।

দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে শচীন্দ্রের স্ত্রী স্নেহলতা মারা গেছে। মহেশের মৃত্যুর পর চতুর্থ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে সে যে অসুস্থ হয়েছিল, আর ভাল হয়নি। চিকিৎসার জন্য শচীন্দ্র বিস্তার টাকাপয়সা খরচ করেছে। কিন্তু স্নেহলতা নিরাময় হয়ে উঠেনি। একটা রোগ কোনমতে সারলে অন্য একটা রোগে সে আক্রান্ত হত। এমনি করেই ভুগে ভুগে সে শেষ পর্যন্ত অকালে মারা গেল।

স্নেহলতা শচীন্দ্রের প্রাণের চেয়েও প্রিয়তমা পত্নী। তাই তার মৃত্যুতে শচীন্দ্র শোকে অধীর হল। ঘরে বাইরে কোথাও সে তিষ্ঠাতে পারে না। তাই একদিন ঠাকুরচাকরের উপর ছেলেমেয়ে ও সংসার ফেলে সে বেরিয়ে পড়ল তীর্থের উদ্দেশ্যে। প্রায় ছয়মাসকাল অনেক তীর্থ ঘুরে সে শেষে এল শ্রীবৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে পা দেওয়ামাত্র কোন যাদুবলে যেন তার মন প্রশান্তিতে ভরে গেল। বৃন্দাবনের পথে পথে, কুঞ্জে কুঞ্জে সে যেন নন্দদুলালের নূপুরধ্বনি শুনতে পেল। সকাল সন্ধ্যা সে চুপচাপ বসে থাকে রাধামাধবের মন্দির প্রাঙ্গণে। এভাবে বসে থাকতে থাকতে তার অন্তরে কৃষ্ণভক্তিব স্ফুরণ ঘটল এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এই বৃন্দাবনেই অলৌকিকভাবে তার গুরুলাভ হল। শচীন্দ্র সিদ্ধগুরুর কাছে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নিল। তার শোকানল নির্বাপিত হল, চিত্ত প্রশান্ত হল। শোনা যায় গুরুর কৃপায় রাধামাধবের মন্দিরে সে একদিন সন্ধ্যার পরে মৃত স্নেহলতার দর্শন পেয়েছিল এবং স্নেলততা কথাও বলেছিল। তাকে সে শোক করতে নিষেধ করেছিল। বলেছিল, সে শচীন্দ্রকে ছেড়ে যায়নি। সূক্ষ্মদেহে সবসময় সে শচীন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই আছে।

মন শান্ত হয়ে গেলে শচীন্দ্র কোলকাতা ফিরে এল এবং যথারীতি কর্তব্যকাজ শুরু করল। এখন যদিও সে আগের মত শোকাকুল নয়, সব কাজকর্ম ঠিকভাবেই করছে তবু দেবেন্দ্র তীর্থকে তার কাছে পাঠানোর প্রস্তাব করতে বড়ই সংকোচবোধ করছিলেন। কিন্তু কমলিনী তার এই দ্বিধা সংকোচকে মোটেই আমল দিল না। সে বলল, ''আমিতো এরমধ্যে লজ্জা সংকোচের কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না। ঠাকুরপোর বাসায় থেকেত ভাশুরঠাকুরের তিন ছেলে পড়াশুনা করছে। এরমধ্যে একা তীর্থ গেলে অসুবিধাটা কোথায় ? তুমি বরং সরাসরি না দিয়ে কায়দা করে ওর খরচপত্রটা দিয়ে দিয়ো। সরাসরি দিলে ঠাকুরপো নিতে নিশ্চয়ই সংকোচবোধ করবেন। কমলিনীর

চাপে বাধ্য হয়ে দেবেন্দ্র তীর্থকে পাঠানোর কথা লিখে শচীন্দ্রকে চিঠি লিখলেন।

শচীন্দ্র তীর্থকে তার বাসায় রাখতে এতটুকু আপত্তি করলেন না। পত্রপাঠ তাকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি মেজদাদাকে লিখলেন। তীর্থ ভাল ছাত্র, তাই কোন ভাল কলেজে পড়লে সে যে ভাল ফল করে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করবে, একথা শচীন্দ্রও ভালই বুঝেন। শচীন্দ্রর চিঠি পাওয়ামাত্র তীর্থ কোলকাতায় চলে গেল। কাকা শচীন্দ্র তাকে নামীদামী কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি করে দিলেন।

তীর্থ ভালছাত্র বলে তার পড়াশুনায় কমলিনীর বড়ই আগ্রহ। সে যদি মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠে তবে আর চিন্তা নেই। সংসারের হাল সেই ধরতে পারবে। কারণ দেবেন্দ্রেরতো ভবিষ্যৎ চিন্তা নেই। তাই তীর্থের উপর নির্ভর করেই চলতে হবে। তীর্থের মত পবিত্রর পড়াশোনা নিয়ে কমলিনী তত চিন্তাভাবনা করে না। কারণ ছাত্র হিসাবে সে খুবই সাধারণ। আর পড়াশোনায় তার মনোযোগেরও একান্ত অভাব। পবিত্রর যে তেমন পড়াশোনা হবে না তা বুঝাই যায়। নিজের ইচ্ছা না থাকলে জোর করে পড়াশুনা হয় না। তাই তীর্থের উপরই কমলিনীর সব আশা ভবসা।

মহেশের মৃত্যুর কিছুদিন পর থেকে রায়পরিবারের পরিবেশ পরিস্থিতিতে বেশ একটা পরিবর্তন এসেছে। ঘরে বাইরে দু'দিকেই অশান্তি উপদ্রব ততটা নেই। বাড়ীতে লোকসংখ্যাও কমে গেছে। ছেলেরা অনেকেই কোলকাতা শচীন্দ্রের বাসায় থেকে পড়াশুনা করছে। মহেশের দ্বিতীয় পক্ষের বড়ছেলে বি.এ পাশ করে চাকরীতে যোগদান করেছে। সৌভাগ্যের বউ বাপের একমাত্র সন্তান। তাই সে বাপের বাড়ীতেই বেশী থাকে। সৌভাগ্যও বেশীর ভাগ সময়ে শ্বশুর বাড়ীতেই থাকে। লোক কমে যাওয়ায় রান্নার ঠাকুর বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। বাড়ীতে লোক কম বলে কমলিনীর উপর আগের মত কাজের চাপ সৃষ্টি হয় না। বাড়ীতে এখন অশান্তি ও মন কষাকষির কোন ব্যাপার নেই। শুধু যেদিন উগ্রস্বভাব বিমলার মেজাজ চড়ে যায়, সেদিন সে চীৎকার চেঁচামেচি করে গালমন্দ করে। কেউই তার কথায় কোন জবাব দেয় না। রাগে সে নিজেই বিলাপ করে। তার গালমন্দ ও বিলাপে প্রতিবেশীদেরও কান ঝালাপালা হয়। কিন্তু করার কিছু নেই। রাগ হলে বিমলাকে সামলায় কার সাধ্য! এক সময় ক্লান্ত হয়ে সে নিজেই থেমে যায়। বাড়ীতে এখন অশান্তি বলতে ঐটুকুই।

বাইরের অশান্তি উপদ্রবও কমে গেছে। অযথা অন্যায়ভাবে শত্রুতা আর মানুষ কতদিন করতে পারে। একসময় শত্রুরাই নিরুৎসাহ হয়ে থেমে যায়। শত্রুতা করার চেয়ে মিত্রতা করা অনেক সহজ। শত্রুতা ক্লান্তি আনে আর মিত্রতা আনে শান্তি।

তাই মজুমদাররা সহ রায়পরিবারের যারা ঘোর শত্রু ছিল তারা প্রায় সবাই এখন মিত্রতা করতে ইচ্ছুক। অনেকেই এখন কাজে অকাজে রায়বাড়ীতে আসা যাওয়া করে। শুধু নীলগঞ্জের যে ব্রাহ্মণ সমাজ রায়পরিবারকে একঘরে করেছিল, সেটা ইচ্ছে থাকলেও অজুহাতের অভাবে ভাঙ্গতে পারেনি। তাই এখনও উৎসব অনুষ্ঠানে নেমন্তনের সম্পর্কটা গড়ে উঠেনি। তবু ঘরে বাইরে উভয় দিক দিয়েই আগের সেই দমবন্ধ করা অস্বাভাবিক পরিবেশটা বেশ স্বাভাবিক হয়েছে। অভয় নমঃর উপদ্রব থেকেও রায়পরিবার এখন অব্যাহতি পেয়েছে। কারণ দেবেন্দ্রকে বল্লমের আঘাতে আহত করার দায়ে তার দীর্ঘ মেয়াদী জেল হয়েছিল। এবার জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সে দলবলসহ বেশ দমে গেছে। বার বার পুলিশের মার খাওয়ার ফলে তার শক্তপোক্ত শরীরেও ভাঙ্গন ধরেছে। তাই উপদ্রব করার মত শক্তি ও উৎসাহ সে হারিয়ে ফেলেছে। সময়টাও তার খুবই খারাপ চলছিল। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কিছুদিন পরেই তাকে পাগলা কুকুর কামড়ে দেয়। ফলে সে জলাতঙ্করোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা যায়। তার মৃত্যুতে তার দলবল একেবারে ছত্রখান হয়ে যাওয়ায় গ্রামে উপদ্রব করার মত লোকই আর রইল না।

ইতিমধ্যে বাড়ীতে কিছু শুভঘটনাও ঘটেছে। তিন মেয়ের পর কমলিনীর পর পর দুটি পুত্র সন্তান জন্মেছে। এতে গুণমণি যারপর নাই আনন্দিত হয়েছেন। কমলিনীর ছেলে হয়নি বলে গুণমণির মনে খুবই দুঃখ ছিল। শচীন্দ্র দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন। যদিও দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে শচীন্দ্রের আদৌ ইচ্ছে ছিল না। দেবেন্দ্র ও গুনমণির চাপে পড়েই অধিক বয়সে বিয়েটা করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। শচীন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আশারানী খুবই দরিদ্র এক ব্রাহ্মনের কন্যা। এত দরিদ্র ঘরে সম্বন্ধ করতে দেবেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। কিন্তু গুনমণির মেয়েটিকে খুবই পছন্দ। কারণ মেয়েটির গায়ের রং খুবই ফর্সা, মাথায় দীর্ঘ ঘন কালো চুল। নাক মুখ চোখের গড়ন যে খুব ভাল তা নয়। আর সবচেয়ে বড়ত্রুটি হল সে খুবই রোগা। এটাও দেবেন্দ্রের অপছন্দ ছিল। কারণ শচীন্দ্রের চেহারা বেশ একটু গোলগাল ধরণের। এমন রোগা মেয়ে তার সঙ্গে মোটেই মানানসই নয়। কিন্তু গুণমণির বক্তব্য যে রোগাটা কোন ব্যাপার নয়। বিয়ের জল পড়লে আপনিই স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যাবে। গরীবের মেয়ে। তেমন খেতে পর তেতো পায়নি। স্বাস্থ্য হবে কি করে? আগের বউতো ফর্সা ছিল না। তাই এবার ফর্সা বউ আনতেই হবে। দেবেন্দ্র মাসীর কথায় মনে মনে হাসলেন। শ্যামলা রং এরমধ্যে স্নেহলতা এত সুন্দরী ছিল যে এ মেয়ে তার পাশে দাঁড়াতেই পারে

না। কালো আর ফর্সারি মধ্যেই মাসীর সুন্দর অসুন্দরের বিচার। শচীন্দ্র কোন মতামত করেননি। কারণ স্নেহলতা তার মন জুড়ে আছে এবং চিরদিন থাকবে। তবে মাসীর কথা তিনি কিছুতেই অমান্য করতে পারেননি। গঙ্গামণির মৃত্যুর পরে দেবেন্দ্র শচীন্দ্র মাসী গুনমণিকে দেবতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। তাই গুণমণির পছন্দের মেয়ের সঙ্গেই শচীন্দ্রের দ্বিতীয় বিয়ে সম্পন্ন হল।

গুণমণি খুবই বৃদ্ধ হয়েছেন। আশির উপর বয়স হয়েছে। চোখে দেখতে পান না। আর বার্দ্ধক্যজনিত নানা অসুখবিসুখ তার লেগেই আছে। জ্বর এবং পেটের অসুখেই তিনি বেশী ভোগেন। এমনিতে জ্বর পেটের অসুখে ভুগে হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। গুণমণির মৃত্যুতে দেবেন্দ্র শচীন্দ্র খুবই শোকগ্রস্ত হলেন। এতদিন যাহোক মাথার উপর একজন অভিভাবক ছিলেন। আজ সবশূন্য। গঙ্গামণির শোচনীয় মৃত্যুতেও তারা এতটা শূন্যতাবোধ করেননি। তবে মাসীরতো যথেষ্ট বয়স হয়েছিল। কাজেই তিনিতো যাবেনই। পৃথিবীতে আসলে তো যেতে হবেই। এই সত্য সবাই জানে। তবু মন প্রবোধ মানে না।

রাজচন্দ্রের কন্যাদের মধ্যে গুণমণিই শেষ যাত্রী। অন্যরা চলে গেছেন অনেক আগেই। তাই গুণর শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া খুব বড় করেই করার ইচ্ছে দেবেন্দ্র-শচীন্দ্রর। কিন্তু সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল লোকখাওয়ানোর ব্যাপারে। গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজ তাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রন রক্ষা করতে আসবেন না। কারণ বেশ কয়েক বছর আগেই সমাজে তাদের একঘরে করে রাখা হয়েছে। এখন অবশ্য তাদের বাড়ীতে সবাই আসাযাওয়া করছেন কিন্তু সমাজে তাদের গ্রহণ করা হয়নি। ব্রাহ্মণেরা না এলে অন্য বর্ণের হিন্দুরাও অনেকে আসতে দ্বিধাবোধ করবে। এই একঘরে হওয়া নিয়ে দেবেন্দ্র শচীন্দ্রের মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। একঘরে হওয়ার পর বাড়ীতে অনেক উৎসব অনুষ্ঠান হয়েছে। গ্রামের ব্রাহ্মণসমাজ ও অন্য হিন্দুরা যথারীতি তাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছে। কিন্তু এর আগে এ ব্যাপারে তাদের এতটা মন খারাপ হয়নি।

এদিকে মজুমদাররাসহ গ্রামের ব্রাহ্মণসমাজ অনেকদিন ধরেই রায়দের সঙ্গে সামাজিক এই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্য অছিলা খুঁজছিল। গুণমণির মৃত্যুতে সেই সুযোগ এসে গেল। গুণমণি মজুমদার বাড়ীর মেয়ে, প্রসন্নদের পিসী। নিজের পিসীর শ্রাদ্ধে না গেলে বংশের প্রতি অকর্তব্য করা হয়। এমনি একটা ভাব প্রকাশ করে প্রসন্ন রায়বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন এবং আত্মীয়জনোচিত সহানুভূতি নিয়ে পিসীর শ্রাদ্ধের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করলেন। পিসীর শ্রাদ্ধে না

এলে না খেলে যে বংশের অমর্যাদা হবে এ নিয়ে বেশ একটা বক্তৃতাও প্রসন্ন দিয়ে ফেললেন। তারপর আসল কথাটি বললেন যে আজ সন্ধ্যায় তাদের দুর্গামন্ডপে এ নিয়ে গ্রামের ব্রাহ্মণদের এক সভা হবে। দেবেন্দ্র শচীন্দ্র যেন এই সভায় উপস্থিত থাকে। তারপর আরও বললেন, ব্রাহ্মণরা কি করবেন জানিনা। কিন্তু অমাদের তো আসতে হবেই। সমাজের জন্যতো আর নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের ফেলে দিতে পারি না। ইত্যাদি অনেক ভাল ভাল কথা বলে প্রসন্ন বিদায় নিলেন। দেবেন্দ্র শচীন্দ্র যেমন অবাক হলেন, তেমনি হাসাহাসিও করলেন। কারণ আজ যে প্রসন্নদাদার আত্মীয়দের জন্য দরদ উথলে উঠেছে, কিন্তু তাদের একঘরেটা করেছিল কে? কিন্তু একথাতো মুখের উপর বলা যায় না। যথাসময়ে দেবেন্দ্র শচীন্দ্র দুই ভাই সভায় উপস্থিত হলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হল যে আজ থেকে রায়পরিবার আর একঘরে নয়। গ্রামের সব ব্রাহ্মণই গুণমণির শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন। কারণ গুণমণি এ গ্রামেরই মেয়ে। তাই তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো গ্রামের সবারই কর্তব্য। তাছাড়া গঙ্গার ছেলেদের এ ভাবে একঘরে করে রাখাটা ঠিক নয়। গঙ্গাওতো এ গ্রামেরই মেয়ে ইত্যাদি অনেক ভাল ভাল কথা বলে ব্রাহ্মণেরা সভার কাজ শেষ করলেন। দেবেন্দ্র শচীন্দ্র হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরে এলেন।

খুব ঘটা করেই গুণমণির শ্রাদ্ধ হল। শ্রাদ্ধ করলেন শচীন্দ্র। আর এদিকে গুন নিঃসন্তান বলে ভাইপো হিসাবে প্রসন্নও গুণের নামে চারদানের শ্রাদ্ধ করলেন। নিমন্ত্রিতরা সবাই এল, কেউ বাদ পড়ল না। বহুদিন পরে রায়বাড়ীতে গ্রামের সবলোকের পাত পড়ল। আয়োজন উপাচারও হয়েছিল পর্যাপ্ত। খেয়ে সবাই ধন্য ধন্য করল। এতবড় শ্রাদ্ধ গ্রামে বহুদিনের মধ্যে হয়নি। স্বর্গ বলে যদি কোন জায়গা থাকে, তবে গুণমণি বোনপো এবং ভাইপোর শ্রাদ্ধের জোরে তরতর করে স্বর্গের সিঁড়িবেয়ে স্বর্গে পৌঁছে যাবেন। এত বড় শ্রাদ্ধই হল গুণমণির।

শচীন্দ্রের দ্বিতীয় বিয়েটা মোটেই শুভহয়নি। বিয়ের পরে যথেষ্ট যত্ন সত্ত্বেও আশার স্বাস্থ্যের এতটুকু উন্নতি হয়নি। বিয়ের পর রুগ্ন ক্ষয়ে যাওয়া শরীর নিয়েই আশারানী পর পর দুটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিল। ছোটমেয়েটি গর্ভে থাকাকালীনই তার ক্ষয়রোগ ধরা পড়ল। কন্যাসন্তানটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার দুই মাস পরেই আশারানী মারা গেল। বিয়ের পর মাত্র চার বছরের মধ্যেই আশারানী সব আশা আকাঙ্খা ও ভালবাসা বুকেনিয়ে অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল।

শিশুকন্যাদের নিয়ে শচীন্দ্রের দেবেন্দ্রের মত সমস্যার সৃষ্টি হল না। দেবেন্দ্রর

শাশুড়ী বেঁচে না থাকায় দেবেন্দ্র তার শিশুপুত্রদের মামার বাড়ী রাখার সুযোগ পাননি। কিন্তু এ নিয়ে শচীন্দ্রকে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হল না। কারণ শচীন্দ্রের দ্বিতীয় শাশুড়ী বেশ শক্ত সমর্থ মহিলা। তাই শচীন্দ্র শিশুকন্যাদের লালনপালনের ভার শাশুড়ীর হাতে দিয়ে দিলেন এবং মেয়েদের খরচবাবদ মোটা টাকা বরাদ্দ করলেন। এতে শচীন্দ্রের দরিদ্র শ্বশুরও খুবই উপকৃত হলেন আর শচীন্দ্রেরও শিশুকন্যাদের লালনপালন বিষয়ে কোন চিন্তা রইল না।

সময়ের ব্যবধানে পরিবারে স্বাভাবিকভাবেই অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। দেবেন্দ্র শচীন্দ্র এখন প্রবীণ। পরবর্তী প্রজন্মের জমানা শুরু হয়েছে। ছেলেরা লেখাপড়া শিখে যে যার যোগ্যতা অনুপাতে পেশা নির্বাচন করছে এবং ধারাবাহিকভাবে তাদের বিয়েথার সম্বন্ধও দেখা হচ্ছে। বিজ্ঞানের ছাত্র তীর্থ বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বিমান বিভাগে কাজ নিয়ে চলে গেছে বম্বে। কাজটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হলেও উচ্চবেতন। এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যোগদান ব্যাপারে দেবেন্দ্র ও কমলিনীর যথেষ্ট আপত্তি ছিল। কিন্তু তীর্থ সে আপত্তি মেনে নেয়নি। ছোটবেলা থেকেই সে একটু ডানপিটে ধরণের। বেতনটা তার কাছে বড় নয়। ঝুঁকিপূর্ণ কাজেই তার আনন্দ। তবে এত উচ্চবেতনের কাজ বাড়ীর অন্য কোন ছেলে পায়নি। অবশ্য সে যোগ্যতাও তাদের কারোরই নেই। পবিত্রর পড়াশোনায় একেবারে মন নেই। ক্লাস টেন অবধি পড়ে সে পড়াশোনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। এখানে ওখানে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়। এ বয়সের একটি ছেলে এমন নিষ্কর্মা ঘরে বসে থাকলে বখে যেতে পারে ভেবে দেবেন্দ্র তাকে যেমন তেমন একটা চাকরীতে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। সুযোগও একটা এসে গেল। গ্রামের দেবেন্দ্রের বন্ধু যোগেন্দ্রের মেজছেলে রমেন দার্জ্জিলিং এ উচ্চপদে চাকরী করে। ছুটিতে এলে দেবেন্দ্র কথায় কথায় তাকে পবিত্রর জন্য একটা চাকরীর ব্যবস্থা করতে বললেন। রমেনের ছোটখাট চাকরী দেওয়ার ক্ষমতা আছে। তাই পিতৃবন্ধুর অনুরোধে সে যাবার সময় পবিত্রকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল এবং অল্পদিনের মধ্যেই তার জন্য একটা চাকরী জুটিয়ে দিল। দেবেন্দ্র বড় দুই ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন। ইতিমধ্যে মহেশের দ্বিতীয়পক্ষের দুই ছেলে ও শচীন্দ্রের বড় ছেলেও যার যার যোগ্যতা অনুসারে কাজে যোগদান করেছে। মহেশের দ্বিতীয়পক্ষের বড়ছেলে করুণাময় ও শচীন্দ্রের বড়মেয়ে অপর্ণার বিয়েও এরমধ্যে হয়ে গেল। শচীন্দ্র ছোট দুই মেয়েকে মামার বাড়ী থেকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন। ওরা এখন বেশ বড় হয়েছে। শচীন্দ্রের তিনমেয়েই ফর্সা এবং মোটামুটি সুন্দরী।

কমলিনীর তিনমেয়ে ছাড়া বাড়ীর অন্য সবমেয়েরই গায়ের রং ফর্সা। এজন্য কমলিনীর মেয়েদের নিয়ে বাড়ীতে বড়ই বিরূপ সমালোচনা হয়। বিয়ের বাজারে কালোমেয়ে যে অচল এই মন্তব্য অনেকেই কমলিনীর দিকে ছুঁড়ে দেয়। বিশেষ করে বিমলার মুখেত আগল নেই। কমলিনীর প্রতি রাগ হলে সে কালোমেয়ের খোঁটা দেবেই। বিমলার মেয়ে নেই। সে ছেলের মা। এজন্য গর্বে যেন তার মাটিতে পা পড়ে না। এসব কথায় কমলিনীর মনে খুব আঘাত লাগে। নীরবে তিনি চোখের জল ফেলেন। দেবেন্দ্রের মনেও যে আঘাত লাগে না তা নয়, তবে তিনি নীরবে আঘাতটা হজম করেন এবং মনে মনে মেয়েদের লেখাপড়া শিখানোর চিন্তা করেন।

নীলগঞ্জ গ্রামের ছেলেরা বরাবরই শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত, কিন্তু মেয়েরা অন্ধকারে। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে গ্রামের কোন অভিভাবকই সচেতন নন। বাড়ীতে বসে লক্ষ্মীর পাঁচালীটা পড়া এবং সামান্য চিঠিপত্র লেখা শিখলেই মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট মনে করা হত। যেমন তেমন একটা বিয়ে হয়ে যাওয়াই মেয়েদের ভবিষ্যৎ। গ্রামের সবার মানসিকতাই এমন ছিল।

কিন্তু দেবেন্দ্র মনে মনে স্ত্রী শিক্ষার খুবই পক্ষপাতী। পড়াশোনার সুযোগ পেলে মেয়েরা যে ছেলেদের চেয়ে মোটেই পিছিয়ে থাকবে না, শৈলর মেধাশক্তি দেখে দেবেন্দ্রের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। তাই দেবেন্দ্র মেয়েদের লেখাপড়া শেখাটা অত্যাবশ্যক বলে মনে করেন। গ্রামে মেয়েদের জন্য একটা স্কুল স্থাপন করা তার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নানা ঝামেলায় ব্যস্ত থাকায় ইচ্ছেটা আর কাজে পরিণত হয়নি। এখন নিজের মেয়েদের পড়াশুনার কথা ভেবে স্কুল স্থাপনের ইচ্ছেটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আর সাংসারিক ঝামেলা অনেকটা মিটে যাওয়ায় এখন সময় সুযোগও হয়েছে। তাই দেবেন্দ্র উদ্যোগ নিয়ে গ্রামের কয়েকজনকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করলেন এবং নিজে জমি দান করে গ্রামে মেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এই স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে দেবেন্দ্রকে কোন বেগ পেতে হল না। কারণ গ্রামের অনেক ভদ্রলোকই এ ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। চাঁদা করে খড়ের চাল আর বাঁশের বেড়া দিয়ে স্কুল ঘর তৈরী হল। স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে সবচেয়ে সাহায্য করলেন দেবেন্দ্রের মামাতো ভাই মজুমদার বাড়ীর সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্র শুধু স্কুল স্থাপনের ব্যাপারেই সাহায্য করলেন না স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োজিত হয়ে স্কুল পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করলেন। সুরেন্দ্রর অবস্থাও দেবেন্দ্রের মতই। সুরেন্দ্র নিজে খুবই ফর্সা কিন্তু স্ত্রীর গায়ের রং কালো হওয়ায় সবগুলো

মেয়েরই গায়ের রং কালো, আর ছেলেগুলি হয়েছে বাপের মত ফর্সা। হয়ত সুরেন্দ্রকেও দেবেন্দ্রর মত কালো মেয়ের জন্য বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয়।

সুরেন্দ্র ছাড়াও গ্রামের কয়েকজন শিক্ষকপদে নিযুক্ত হলেন। দেবেন্দ্র সুরেন্দ্র উভয়েই নিজের নিজের মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। অন্যান্য বাড়ী থেকেও বেশ কয়েকটি মেয়ে স্কুলে ভর্তি হল। দেবেন্দ্রের মেয়েদের স্কুল স্থাপন সার্থক হল। কারণ মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে গ্রামে বেশ একটা সাড়া জাগল।

দেবেন্দ্রের বাড়ীতে অবশ্য এ নিয়ে অনেক ঠাট্টা-সমলোচনা হল। এত যে উচ্চশিক্ষিত শচীন্দ্র তিনিও ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করলেন না। তিনি সোজাসুজি দেবেন্দ্রকে বললেন, ''এসব কি করছ মেজদাদা! মেয়েদের আবার স্কুলের কি দরকার। ওরা কি পাশ দিয়ে চাকরী বাকরী করবে? ঘরে বসে সামান্য চিঠিপত্র লিখতে পারলেই হল। ঘরসংসার করাই মেয়েদের কাজ। স্কুলেটুলে গেলে মেয়েদের স্বভাব উদ্ধত হয়।''উচ্চশিক্ষিত ভাইয়ের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি এই বিরূপ মনোভাবটা দেবেন্দ্রের খুবই খারাপ লাগল। তবে মুখে তা প্রকাশ না করে দেবেন্দ্র শুধু বললেন, ''এ'তো প্রাইমারী স্কুল। এখানে মেয়েরা আর কতটুকু লেখাপড়া শিখবে? চিঠিপত্র লেখার মত শিক্ষাইতো হবে ওখানে। তা বাড়ীতে না পড়ে স্কুলে পড়ল ঐ টুকুই।'' শুধু শচীন্দ্র নয়, বাড়ীতে দেবেন্দ্রের এই স্কুল ও তার মেয়েদের পড়া নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অন্ত নেই। সৌভাগ্য খুব ঠাস ঠাস কথা বলে। সে কমলিনীকে বলল, ''ভাল বুদ্ধিই করেছ মেজখুড়ী। কালো মেয়ের ভাগ্যেতো বিয়ে নেই। তাই লেখাপড়া শিখে যদি একটা চাকরী জুটিয়ে নিতে পারে, তবে তোমাদের ঘরেও দুটো পয়সা আসবে আর বিয়ের খরচটাও হবে না।'' বলে দরাজ হাসি হাসল। সে হাসিতে যোগ দিল আরও কয়েকজন। অবনীর এতটা সহ্য হল না। সে প্রতিবাদ করে বলল, ''কালো বলে বিয়ে হবে না চাকরী করবে এতসব কথা উঠছে কেন? কালো মেয়ের কি বিয়ে হয় না? তা তোর বউই বা কোন ফর্সা! বিয়ে হয়নি তার? কালো বলে এত হেলাফেলা করার কি আছে? তাছাড়া ছেলেরাই শুধু লেখাপড়া শিখবে আর মেয়েরা শিখতে পারবে না, এটাই বা কেমন কথা।'' অবনী লেখাপড়া তেমন শিখেনি, কোন কাজকর্মও করে না। মামার বাড়ীতে পড়ে খাচ্ছে। তাই তাকে কেউ আমল দেয় না। এহেন অবনীর এই উচিত কথায় সবাই থমকে গেল, আর সৌভাগ্যের নিজের বউয়ের কথা এমন স্পষ্টাস্পষ্টি উল্লেখ করায় সৌভাগ্যের মুখ একেবারে চুন হয়ে গেল।

সৌভাগ্যের মেয়ে নেই। দুটি মাত্র ছেলে এবং সৌভাগ্যের মতে ওরা দুটি

হীরের টুকরো। তাই অহংকারে সৌভাগ্যের মাটিতে পা পড়েনা। তাই যা খুশি বলতে তার মুখে আটকায় না। কিন্তু আজ চিরঅবহেলার পাত্র অবনী যে তাকে এমন অপ্রস্তুত করবে তা সে ভাবতেই পারেনি। সে মনে মনে গজগজ করে বলল, ''মা, বউ, মেয়ে নিয়ে মামার বাড়ীতে পড়ে খাচ্ছিস আবার মুখে বড় বড় কথা।'' কিন্তু মুখে আর অবনীকে ঘাঁটাতে সাহস করল না। অবনী আর সৌভাগ্য প্রায় সমবয়সী। তাই কেউ কাউকে সমীহ করে কথা বলে না। তাছাড়া অবনীটা একটু রগচটাও বটে।

ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও উপদেশে কোন কাজ হল না। দেবেন্দ্রের মেয়েরা যথারীতি স্কুলে যেতে লাগল এবং রীতিমত পড়াশুনাও করতে লাগল। দু'একটা পরীক্ষা দেওার পর দেখা গেল ওরা পড়াশুনায় খুবই ভাল। বাড়ীতে এটাও একটা জ্বালার কারণ হল।

এই সময়টাতে ধীরে ধীরে দেশকালের ও একটা বিরাট পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল। এই পরিবর্তনের হাওয়াটা সহজ সরল গ্রামবাসীরা তেমন করে অনুভব করতে পারেনি। মুসলমানদের মধ্যে যে একটা হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাব তৈরী হচ্ছিল তা গা এলানো হিন্দুরা এতটুকু টেব পায়নি। তারপর উনিশশো ছয়চল্লিশ সালে হিন্দুমুসলমানের ভয়াবহ দাঙ্গার ঢেউ যখন নিস্তরঙ্গ গ্রামের বুকে আছড়ে পড়ল, তখন বিস্মিত ভীতসন্ত্রস্ত হিন্দু গ্রামবাসীদের টনক নড়ল। তারা হিন্দুমুসলমান মিলে একগ্রামে এতকাল ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। কিন্তু এমনটা যে হতে পারে তাতো ভাবতেই পারেনি। তাদের মধ্যে কোন সময়ে ঝগড়া কাজিয়া যে হয়নি তা নয়। কিন্তু সে ঝগড়া ছিল ব্যক্তিগত, কখনও বা দলগত। কিন্তু সাম্প্রদায়িক নয়।

দাঙ্গার পরের বছরটাতেই অর্থাৎ উনিশশো সাতচল্লিশ সালে দেশের এক বিরাট রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হল। বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটল। দেশ স্বাধীন হল। ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে গেল। অখণ্ড ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্থান এই দুই খণ্ডে ভাগ হয়ে গেল। এই ভাগাভাগিতে পূর্ববঙ্গ পাকিস্থানের অর্ন্তভুক্ত হল। পাকিস্থান মুসলীম রাষ্ট্র। তাই জন্মভূমির মাটিতে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের শিকড় আলগা হয়ে গেল। দেশে থাকা যাবে কি যাবে না, পাকিস্থানে বসবাসকারী হিন্দুদের সামনে এই এক বিরাট সংকট দেখা দিল। ছয়চল্লিশের দাঙ্গার কথাটাও মানুষ ভুলে যায়নি। পাকিস্থান মুসলমান রাষ্ট্র বলে মুসলমানদের দাপট আশ্চর্যরকমভাবে বেড়ে গেল আর হিন্দুরা একেবারে চুপসে গেল। মুসলমানদের মনোভাবে এক বিবাট পরিবর্তন দেখা দিল। বেশীব ভাগ মুসলমানের দৃষ্টিতেই হিন্দুবা এখন কাফের, আগের মত বন্ধুনয়,- প্রতিবেশী নয়,- মানুষ নয়। পাকিস্থানের হিন্দুরা ভাবগতিক দেখে উভয়সংকটে পড়ে গেল।

একদিকে সাতপুরুষের ভিটেমাটি, বিষয় আশয়, আর একদিকে প্রাণমান। বিশেষ করে মেয়েদের মানইজ্জতের প্রশ্নটাই পাকিস্থানের হিন্দুদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ হিন্দুমেয়ের সম্ভ্রম নিয়ে টানা হেঁচড়ায় কিছুসংখ্যক মুসলমানদের প্রবল উৎসাহ।

বিষয় সম্পত্তির চেয়ে মানুষের কাছে স্বভাবতঃই প্রাণের দাবী, মানের দাবী অনেক বেশী। প্রাণের নিরাপত্তা যদি না থাকে, মানইজ্জৎ যদি ধুলায় লুটিয়ে পড়ে, তবে মানুষের জীবনে বিষয় সম্পত্তিরত কোন মূল্যই থাকে না। তাই পাকিস্থানের বিপন্ন হিন্দুদের মধ্যে দেশ ছেড়ে ভারত ভূখণ্ডে চলে যাওয়ার একটা হিড়িক পড়ে গেল। নীলগঞ্জ গ্রামেও এর ব্যতিক্রম দেখা গেল না। নীলগঞ্জেরও বেশ কয়েকটি হিন্দু পরিবার জমিজমা বাড়ীঘর জলের দরে বিক্রি করে ভারতভূখণ্ডে চলে গেল। এই যাওয়ার ব্যাপারটাও চলছে গোপনে গোপনে। কেউ কাউকে কিছু না বলে যার যার মত ব্যবস্থা করে হঠাৎ করে চলে যায়। এভাবে নীলগঞ্জ গ্রামের প্রায় অর্ধেক হিন্দু ওপারে চলে গেছে। গ্রাম ছন্নছাড়া, মুসলমানদের প্রতাপ দোর্দণ্ড, যুবক ছেলের প্রাণ আর যুবতী মেয়ের মানের প্রশ্নে হিন্দুরা কম্পমান। এই পরিস্থিতিতে যারা যাবার ব্যবস্থা করতে পারছেন না, তারা যুবতী মেয়েদের ভারতে আত্মীয়স্বজনদের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। দেবেন্দ্রের মেয়েরাও বড় হয়ে উঠেছে। বিষয়সম্পত্তিও বিস্তর। একক সিদ্ধান্তে জলের দরে জমি বিক্রি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সমস্ত সম্পত্তিই যৌথ সম্পত্তি। তাই এই বিষয়ে একটা সুহারার জন্য ছোটভাই শচীন্দ্র ও মহেশের ছেলেদের আসার জন্য চিঠি লিখলেন, কিন্তু তারা আসার কোন গরজ দেখাল না, আবার দেবেন্দ্রকে নিজের ইচ্ছামত বিক্রি করার অধিকারও দিল না। শুধু তাই নয়, দেশের পরিস্থিতি সাপেক্ষে দেবেন্দ্র মেয়েদের শচীন্দ্রের বাসায় পাঠানোর কথা লিখেছিলেন। কিন্তু শচীন্দ্র এ ব্যাপারে কোন ইতিবাচক সাড়া না দিয়ে ঈশ্বর ভরসা করে থাকতে লিখলেন। তার এই নির্মম ব্যবহারে দেবেন্দ্রও কমলিনী বড়ই মর্মাহত হলেন। এদিকে তীর্থপবিত্র দুই ভাই বোনদের কোলকাতা কাকার বাসায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য জোর তাগাদা দিয়ে চিঠির পর চিঠি লিখছে। ওরা মনে কষ্ট পাবে ভেবে দেবেন্দ্র আসল কথা না লিখে শীঘগিরই পাঠাব এমন লিখে মিথ্যা স্তোকবাক্যে তাদের নিশ্চিত রাখতে চেষ্টা করছেন। এরকম বিপদের দিনে আপন কাকার এই ব্যবহারে তাদের মনে কষ্ট হবে ভেবেই দেবেন্দ্র মেয়েদের পাঠানোর ব্যাপারে শচীন্দ্রের অনিচ্ছার কথাটা তাদের জানাননি।

প্রথম পাকিস্থান হওয়ার পর দেশের অবস্থাটা যতটা উত্তাল ছিল, কিছুদিন পরে সে অবস্থাটা একটু থিতিয়ে এল। মুসলমানদের উগ্র মনোভাবটা একটু নমনীয় হল। তাই এখন হিন্দুরা ঠিকমত জমিজমা বিক্রি করে ধীরে সুস্থে গুছিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে পারছে। কিন্তু দেবেন্দ্র কিছুই করে উঠতে পারছেন না। কারণ এজমালী সম্পত্তি এককভাবে বিক্রি করার তার কোন এক্তিয়ার নেই। তিনটি উপযুক্ত মেয়ে দুই নাবালক ছেলে নিয়ে দেবেন্দ্রতো আর শূন্য হাতে কোথাও চলে যেতে পারেন না। তাছাড়া এভাবে সম্পত্তি ফেলে গেলে আর দখলও পাওয়া যাবে না। নিজের পরিবার ছাড়া বিমলা ও তার দুই ছেলে, ক্ষীরোদা ও তার ছেলে ওরাও আছে। সম্পত্তির একটা কিছু ব্যবস্থা না করে কিছুই করা যাচ্ছে না। মেয়েদের নিয়েই দেবেন্দ্রের সবচেয়ে বেশী চিন্তা।

দেশের এবং পারিবারিক এই পরিস্থিতিতেই দেবেন্দ্রের ভাগ্যে আবার এক আশ্চর্য বিপত্তি দেখা দিল। বিমলার বড় ছেলে সুজয় সবেমাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। বয়স মাত্র ষোল বছর। কিন্তু ঐটুকু ছেলে যে প্রতিপালক কাকার প্রতি ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ পোষণ করছে এবং গ্রামের দুষ্টলোকেদের সঙ্গে জোট পাকিয়ে কাকাকে চূড়ান্ত বিপদে ফেলার চেষ্টা করছেন, তার এতটুকু আঁচ দেবেন্দ্র করতে পারেননি। অকৃতজ্ঞ দুষ্ট লোকদের মদতপুষ্ট হয়ে পিতৃপ্রতিম কাকা দেবেন্দ্রের বিরুদ্ধে সে অতি গোপনে এক মিথ্যা ফৌজদারী মামলা দায়ের করল। অতি গোপনেই দেবেন্দ্রের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়ে গেল। দেবেন্দ্র ঘুণাক্ষরেও এই ভীষণ সংবাদ জানতে পারলেন না। তাছাড়া এ সময়টাতেই দেবেন্দ্র প্রবলজ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। উঠে বসার শক্তিটুকুও তার ছিল না। দেবেন্দ্র গ্রামের একজন মান্যগন্য প্রবীণ ব্যক্তি। তাকে যদি পুলিশ এসে হাতকড়া দিয়ে ধরে নিয়ে যায়, তবে তার যে অপমান হবে সেটা মৃত্যুর চেয়েও বেশী। অপরাধ প্রমাণ হওয়াতো পরের কথা। সুজয়, তার মা বিমলা এবং দুষ্টচক্রের লোকেরা দেবেন্দ্রকে অপমানিত করার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু সুজয়ের কাকাকে এমন মৃত্যুতুল্য অপমান অপদস্ত করার কোন কারণ ছিল না। হয়ত তার বাবার দেবেন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষভাবটাই তার রক্তে সঞ্চারিত হয়ে তাকে এমন জঘন্য কাজে উদ্‌বোধিত করেছে। কিন্তু সজ্জনের মানসম্ভ্রম ঈশ্বরই রক্ষা করেন। তাই দেবেন্দ্র ভাগ্যগুণে কিঞ্চিৎ আগেই পুলিশের তরফ থেকেই দুঃসংবাদটা পেয়ে গিয়েছিলেন। সজ্জন ব্যক্তি বলে পুলিশের বড় দারোগা সাহেব দেবেন্দ্রকে খুবই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত। সেই দেবেন্দ্রকে খবরটা গোপনে দিয়েছিল এবং পুলিশ গ্রেপ্তার করার আগেই দেবেন্দ্র যাতে কোর্টে

হাজির হয়ে যেতে পারেন সে ব্যবস্থাও করেছিল। অসুস্থ এবং আত্মজতুল্য বালকের ষড়যন্ত্রে বিধ্বস্ত দেবেন্দ্র তীর্থর দুই বন্ধুর সাহায্যে কোনরকমে কোর্টে হাজির হয়ে শেষ পর্যন্ত হাতে হাতকড়া পরার অপমান থেকে রক্ষা পেয়ে গেলেন।

আদালতে মামলা উঠার পর সুজয় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিশেষ কিছু বলতে পারল না। দুষ্টচক্রের লোকেরাও দেবেন্দ্রের সামনাসামনি মিথ্যা সাক্ষী দিতে তেমন সাহসী হল না। আর সুজয়ের দুর্বুদ্ধি যতই থাক, বয়সেত সে বালক মাত্র। তাই প্রতিপালক কাকাকে যে সে বিনা কারণে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে এতে তারমধ্যে তাৎক্ষাণিক ভীষণ একটা অনুতাপের সৃষ্টি হল এবং সে কেঁদে ফেলল। দেবেন্দ্রের কোন অপরাধ প্রমাণিত হল না। তিনি বেকসুর খালাস পেলেন।

আদালত চত্বরে সুজয় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে কাকার পায়ে ধরে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। তার চোখের জল দেবেন্দ্রের হৃদয় স্পর্শ করল না। তিনি কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। তাড়াতাড়ি একটি ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে শারীরিক অসুস্থ, মানসিক বিধ্বস্ত, বালকের শঠতায় পর্যুদস্ত দেবেন্দ্র বাড়ীতে ফিরে এসে শয্যায় নিজেকে এলিয়ে দিলেন।

সুজয়ের মা বিমলা তক্কে তক্কে ছিল। দেবেন্দ্র ফিরে আসতেই সে দেবেন্দ্রের ঘরে এসে ইনিয়ে বিনিয়ে নানা কথা বলে ছেলের কীর্তিকলাপ ঢাকতে চেষ্টা শুরু করে দিল। দেবেন্দ্র তার কথার কোন উত্তর দিলেন না। তার এতসব মিথ্যাকথাগুলো কমলিনীর সহ্য হল না। তাই কমলিনী বললেন, "কেন শুধু শুধু এতসব মিথ্যে কথা বলে অসুস্থ মানুষটাকে বিরক্ত করছ? তোমার দেবর উদার ঠিকই, বোকাত নন। যা করার করেছ, আর কি কি করবে সেই ফন্দী ফিকির করোগে। আব কথা বাড়িও না।" কমলিনীর কথায় মুখরা বিমলার মুখে আর কথা জোগাল না। আস্তে আস্তে সে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল।

এরপর থেকে দেবেন্দ্র এক বাড়ীতে থেকেও তাদের দায়দায়িত্ব একেবারে ছেড়ে দিলেন। হাঁড়ি আলাদা হয়ে গেল। দেবেন্দ্র সম্পত্তির আয়ব্যয়ের ব্যাপারেও কোন কথা বলেন না। যৌথ সমপত্তির আয় যে যেভাবে যতটুকু পারে নিয়ে নিজ নিজ জীবনযাত্রা নির্বাহ করুক। দেবেন্দ্র আর কোনরকম দায়িত্বকর্তব্য পালনে আগ্রহী নন। সারাজীবন তিনি কম কিছু সহ্য করেননি। কিন্তু সুজয়ের এই ব্যবহারে তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। তিনি সব ব্যাপারেই নির্লিপ্ত। নিজেদের গ্রাসাচ্ছদনেব জন্য যতটুকু প্রয়োজন সম্পত্তিব আয় থেকে কমলিনীই তার ব্যবস্থা করেন। শরীকবা

দেবেন্দ্রকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পায় না। দেবেন্দ্র ইচ্ছে করলে সুজয়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে পারতেন। অনেকে তাকে মানহানির মামলা করার পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্র তা ক রেননি। এই প্রবীণ বয়সে রক্তসম্পর্কিত ঐটুকু এক নষ্টচরিত্র বালকের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার মত নীচপ্রবৃত্তি তার নেই। কাজেই তিনি বিনা প্রতিবাদে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ চিরতরে ছিন্ন করে ফেললেন। সুজয়ের কুকীর্তির খবর যথাসময়ে শচীন্দ্রের কাছেও পৌছল। ঐটুকু বয়সের একটা ছেলের যে এতটা দুষ্টবুদ্ধি হতে পারে তা শচীন্দ্রর কল্পনার অতীত। তিনি এতে যেমন বিস্মিত হলেন তেমনি মর্মাহতও হলেন। মানুষ যতই আত্মকেন্দ্রিক হউক না কেন তবু অপরের প্রতি সীমাহীন অন্যায় দেখলে আত্মসর্বস্ব মানুষের মধ্যেও মাঝে মধ্যে প্রতিবাদী মনোবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, সুজয়ের ঘটনায় শচীন্দ্রেরও তাই হল। তাই ক্রুদ্ধ উত্তেজিত শচীন্দ্র খবরটা পাওয়ামাত্র প্রতিকার চিন্তা করে বাড়ীতে চলে এলেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিমলা সুজয় শচীন্দ্রের কাছে সত্য মিথ্যা অনেক কিছুই বলতে চেয়েছিল। কিন্তু শচীন্দ্র এদের এতটুকু পাত্তা দেননি, এদের কোন কথা শোনেননি। ক্রুদ্ধ শচীন্দ্র মানহানির মামলা করে এদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিপকর হলেন। অনেক বুঝিয়ে সুজিযে দেবেন্দ্র তাকে নিবৃত্ত করলেন। যাবার সময় শচীন্দ্র খুবই দুঃখের সঙ্গে বললেন, "মেজদাদা, ভেবে দেখ ওর আসলে দোষ নেই। দোষটা ওর রক্তের। ওর বাবা জীবনভোর তোমার সঙ্গে কি করেছে, সেটাতো ভুলে যাওয়ার নয়। এরপরও তুমি ওদের সংস্রব ত্যাগ করনি। বড় দুঃখের সঙ্গেই বলছি যে এদিক দিয়ে তোমারও যথেষ্ট দোষ আছে। অন্যায় করা যেমন পাপ সহ্য করাও তেমনি পাপ। এজন্য আজ জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ঐটুকু ছেলের হাত থেকে তোমাকে এতবড় অপমানের বোঝাটা মাথায় তুলে নিতে হল।" কথাটা খুবই সত্যি। তাই দেবেন্দ্র একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন, "সবই আমার নিয়তি। আমিতো চিরদিনের জন্য চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু অদৃশ্য নিয়তির টানে আবার সংসাররূপ নরকে ফিরতে হল, আর অনেক কিছুই পেতে হল, সইতে হল। হয়ত আরও অনেক কিছু পাওনা বাকী রয়েছে। সেগুলোতো পেতে হবেই। তাই সংস্রব ত্যাগ করতে চাইলেও লাভ কিছু হত না। এগুলো আমার জন্মজন্মান্তরের প্রাপ্য।" শচীন্দ্রের মনে দেবেন্দ্রের সন্ন্যাসীর রূপটা ভেসে উঠল। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না।

সুজয়ের খবরটা দেবেন্দ্র তীর্থপবিত্রকে জানাননি। কারণ এরকম সাংঘাতিক খবর পেলে ওরা চাকরী ছেড়ে বাড়ী চলে আসবে এবং দিগবিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে

একটা খুনোখুনি কাণ্ড করে বসবে। ওরাওতো বয়সে তরুণ। এত অন্যায় সহ্য করাতো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

দেবেন্দ্র একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়ায় সংসারের অবস্থা বড়ই বেহাল। ফসল যা আসে, আগে ইচ্ছেমত ওরা ওদের ভাগ নিয়ে নেয়। বাকী যা থাকে তা কমলিনী তুলে আনেন। প্রজারা খাজনা দিতে এলে দেবেন্দ্র সুজয়কে দেখিয়ে দেন। সুজয় এসব কাজে একেবারেই আনাড়ী এবং সম্পত্তির ব্যাপারে সে কিছু জানেও না বুঝেও না। তার বড়ই অসুবিধা হয়। প্রজারা যেমন খুশী খাজনা দেয়, কর্মচারীরা যেমন খুশী ঠকায়। সুজয়ের কিছু করার থাকে না। তাই এই কর্তৃত্ব তার মনে কণ্টক হয়ে বিঁধে। কিন্তু উপায় নেই। কাকা যে আর তাদের কোন দায়িত্ব নেবেন না এটা সে ও তার মা বুঝে গিয়েছে। খাজনার টাকা দেবেন্দ্রেরও প্রাপ্য কিন্তু দেবেন্দ্র তা গ্রহণ করেন না। প্রয়োজনও বোধ করেন না। তীর্থ পবিত্র যে টাকা পাঠায়, তাতেই কোন রকম চলে যায়। কমলিনী নেহাৎ কিছু ফসল ঘরে তুলে আনেন। এতেও দেবেন্দ্র ভালমন্দ কিছু বলেন না। বাড়ীটা সবসময় খুব চুপচাপ, দুই পক্ষের কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। ঝগড়া করার মত সুযোগটুকুও দেবেন্দ্রের পক্ষ থেকে মিলে না। বিমলার গলাবাজি আর শোনা যায় না। দুইটি পরিবার একই বাড়ীতে বাস করেও মনে হয় কেউ কাউকে চিনে না। ক্ষীরোদারা আছেন দেবেন্দ্রের সঙ্গেই।

সুজয়ের কুকীর্তির খবর পেয়ে উত্তেজিত শচীন্দ্র বিশেষ কোন ভাবনাচিন্তা না করে অল্পদিনের ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ীতে ছুটে এসেছিলেন। এই অল্পসময়ের মধ্যেই দেবেন্দ্র সম্পত্তি ভাগাভাগির প্রস্তাবটা রেখেছিলেন। কিন্তু এসব করতে গেলে যথেষ্ট সময়ের দরকার। শচীন্দ্রের বেশীদিন বাড়ীতে থেকে এসব করার সুবিধে নেই। কারণ বিস্তর কাজকর্ম ফেলে তিনি হঠাৎ করে চলে এসেছেন। তাই দেবেন্দ্রের প্রস্তাবটা ধামাচাপা দিয়েই তিনি তার কর্মস্থলে চলে গেলেন। দেবেন্দ্র ও কমলিনী উভয়েই একটা বিষয় বিশেষ করে লক্ষ্য করলেন যে শচীন্দ্র সুজয়ের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যতটা তৎপরতা দেখিয়েছেন, দেবেন্দ্রের সাংসারিক বিপন্নতা সম্বন্ধে ততটাই নিস্পৃহ থেকেছেন। বিশেষ করে নিজে বাড়ীতে এসে,দেশের পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখেও তিনি দেবেন্দ্রের মেয়েদের কোলকাতা নিয়ে যাওয়ার কথা একবারও উল্লেখ করলেন না। কমলিনীর মেয়েরা কালো বলে বরাবরই বাড়ীতে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য পেয়েছে। কিন্তু তিনি ওতো কালো। কই এ বাড়ীতে কালো বলেতো কেউ তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেনি। বরং মেজবউ বলতে সবাই ছিল অজ্ঞান। আসলে কমলিনীর মেয়েদের

ভাগ্যই খারাপ। নইলে শচীন্দ্রতো নিজের বিপদের মধ্যেও ভাশুর ঠাকুরের ছেলেদের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কমলিনীর মেয়েদের বেলায় এত বড় সমস্যা সত্ত্বে তিনি কোন উচ্চবাক্যে করলেন না। কমলিনী দেবরের প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হলেন। দেবেন্দ্রও এ ব্যাপারে খুবই দুঃখিত হলেন।

কোলকাতায় গিয়ে শচীন্দ্র সুজয়ের ঘটনাটাকে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় অনেক ভাবনা চিন্তা করলেন। তার মনে হল যে এ বয়সেই যে এত নষ্টদুষ্ট, সে ভবিষ্যতে আরও অনেক রকম নষ্টামীদুষ্টামী করবে। সবেত কলির সন্ধ্যা। ভবিষ্যতে ওর বাপের কীর্তির মত আরও অনেক কীর্তি অপেক্ষা করে আছে। তেমন কিছু ঘটে গেলে একেবারে না জড়িয়ে পার পাওয়া যাবে না। কারণ তিনিওতো পরিবার ভুক্ত। মুসলিম রাষ্ট্রে এমনিতে হিন্দুদের নিরাপত্তা নেই। এরমধ্যে পরিবারের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে এক ভীষণ গৃহ শত্রু। দেবেন্দ্রেরও বয়স হয়েছে। এর উপরে আছে তিনতিনটে মেয়ে। কাজেই কোন যুবক ছেলের সহায়তা ছাড়া দেবেন্দ্রের পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হবে। তেমন তেমন কিছু ঘটে গেলে শচীন্দ্রকে কিছু না কিছু নাক গলাতে হবেই। এসব ঝঞ্ঝাট তার মোটেই ভাল লাগে না। তাই তিনি এব্যাপারে গাঁ বাঁচিয়ে চলার মত একটা সুষ্ঠু উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি ভেবে দেখলেন দেবেন্দ্রের বড়ছেলে তীর্থ খুবই দাপুটে এবং বুদ্ধিমান ছেলে। সে একা একশো দিক সামাল দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তাকে যদি চাকরী ছাড়িয়ে বাড়ীতে তার বাপের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তবেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন। অবশ্য এতে তীর্থর জীবনের খুবই ক্ষতি হবে। কিন্তু কি আর করা যাবে। দুদিকতো আর বজায় রাখা যায় না। মেয়েগুলোই আসল সমস্যা। নইলে এতটা চিন্তার কিছু ছিল না। মেজদাদা ও মেজবউঠান তার উপরই মেয়েদের দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে একান্ত ইচ্ছুক। কিন্তু তার পক্ষে এ দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ একবার আশ্রয় দিলে বিয়ে দেওয়ার দায়টাও তার ঘাড়েই পড়তে পারে। কালো মেয়ে পার করার খরচও অনেক। তার নিজেরও দুটি মেয়ে আছে। তাই তার পক্ষে মেজদাদার মেয়েদের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। এতে মেজদাদা ও মেজবউঠান অসন্তুষ্ট হলেও তার কিছু করার নেই।

অনেক ভেবেচিন্তে শচীন্দ্র তীর্থকে চাকরী ছাড়িয়ে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়াটাই সুবিধাজনক মনে করলেন। তাই তীর্থের কাছে তিনি জরুরী টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন তার বাসায় আসার জন্য। টেলিগ্রাম পেয়ে তীর্থ পড়িমরি করে ছুটে আসল কাকার বাসায়। তীর্থ আসলে শচীন্দ্র তাকে সুজয়ের কীর্তিকাহিনী সব খুলে বললেন, এতসব

ঘটনা হয়ে গেল অথচ দেবেন্দ্র তীর্থকে কিছুই জানালেন না বলে তীর্থ খুবই অবাক হল। অপরিণত বুদ্ধি বলে কেন জানালেন না সেটা আর তার মাথায় আসল না। শচীন্দ্র শুধু তীর্থকে সব কথা খুলে বলেই ক্ষান্ত হলেন না। সেই সঙ্গে নিজের জীবনের উন্নতির চেয়ে পিতার পাশে দাঁড়ানোটাই যে পুত্রের প্রধান কর্তব্য সেই সদোপদেশটুকুও তীর্থের মনে গেঁথে দিলেন।

পিতার এই হেনস্থা অপমানের কথা শুনে ক্রোধে তীর্থর তরুণরক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। তার উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ জীবনের কথা আর তার মাথায় রইল না। সে কাকার কথামত চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। কোন খবরবার্তা না দিয়ে হঠাৎ তীর্থ বাড়ীতে চলে আসায় দেবেন্দ্র কমলিনী রীতিমত আঁতকে উঠলেন। কেননা একবছরের মধ্যেতবার কোন ছুটি নেই। এটাতো তার চাকরীর ট্রেনিং পিরিয়ড। চাকরী ক্ষেত্রে কোন গোলমাল বাঁধিয়ে বসেনিতো? এমন হতেও পারে। দেবেন্দ্রের যে এখন সবদিক দিয়েই সময় খারাপ। তারপর তীর্থের কাছ থেকে সব জেনে দেবেন্দ্র কমলিনী শচীন্দ্রের উপর যারপর নাই অসন্তুষ্ট হলেন। শচীন্দ্রের এ আচরণটা একটা নিছক শত্রুতা ছাড়া আর কিছুই নয়। দেবেন্দ্রের জীবনের শেষ আলোটুকুও নিভিয়ে দিলেন শচীন্দ্র। দেবেন্দ্র কমলিনী কত আশা করে বসেছিলেন যে তীর্থকে অবলম্বন করেই সংসারটা গুছিয়ে নেবেন তারা। ট্রেনিং শেষ হলে তীর্থ পদস্থ অফিসার হবে। প্রচুর মাইনে পাবে। কোলকাতায় পোষ্টিং হবে, মস্ত কোয়াটার পাবে। তখন তীর্থের বিয়ে দিয়ে দেবেন্দ্র ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দেবেন তীর্থের কাছে। তীর্থের যে বেতন ও প্রভাবপত্তি হবে তাতে তিনবোনকে পাত্রস্থ করতে তার কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। পবিত্রতো তার কর্মস্থলে যথারীতি কাজ করেই যাচ্ছে। এই অভিশপ্ত সম্পত্তি ত্যাগ করে দেবেন্দ্র শূন্যহাতে চলে যাবেন এই ছিল দেবেন্দ্রের মনের গোপন ইচ্ছা। কিন্তু শচীন্দ্র সব বানচাল করে দিল। শচীন্দ্র মহেশের মত আচরণ করেনি বটে, তবে সুহৃদের কাজও করেনি। আত্মীয় পরিজন সবাই তার দুর্দশা অপমান লাঞ্ছনা তামাসার মত প্রত্যক্ষ করেছে। কোন প্রতিবাদও করেনি, সমাধানের কথাও ভাবেনি। সবই দেবেন্দ্রের কর্মফল। এছাড়া আর কিই বা ভাবা যায়?

তীর্থ বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক দীপ্তিমান যুবক। অসম সাহসী তীর্থ অসাধ্যসাধনের ক্ষমতা রাখে। তার এমনি একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব আছে যে তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস অনেকেরই হয়না। তাই তীর্থ বাড়ী আসায় সুজয় ভয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল। চোখের সামনে পেলে তীর্থ মেরে তার

হাড় গুড়িয়ে দিতে পারে এই ভয়েই সে পালিয়েছে। বিমলাও তীর্থের ভয়ে সব সময় আড়ালে আড়ালে থাকে। তীর্থ কখন কি করে বসবে বলা যায় না। তীর্থকে গ্রামের লোকও ভয় পায়। তাই তীর্থের বিরুদ্ধে তাদের পক্ষ সমর্থন করতে কেউই এগিয়ে আসবে না। একথা বিমলা ও সুজয় ভালই বুঝে। সারাজীবন নোংরামী সহ্য করতে করতে দেবেন্দ্রের মনে এত ঘৃণার সঞ্চার হয়েছে যে ঐ ঘৃণ্য লোকদের কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতেও তার প্রবৃত্তি হয় না। তাই তিনি তীর্থকে বুঝিয়ে সুজিয়ে কোন রকম বাদপ্রতিবাদ করতে বারণ করলেন। সমস্ত রায়পরিবারের সংস্রব কিভাবে ত্যাগ করা যায়, এটাই এখন দেবেন্দ্রের একমাত্র চিন্তা। তীর্থের চাকরীটা বজায় থাকলে ব্যবস্থা একটা হয়ে যেত। কিন্তু শচীন্দ্রের কারণে সে পথও বন্ধ হয়ে গেল।

তীর্থের এত ভাল চাকরী ছেড়ে আসায় দেবেন্দ্র ও কমলিনীর মনে যে আফশোষ, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর তীর্থের মনে কিন্তু সেরকম আফশোষ নেই। সে জানে, তার মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছেলের পক্ষে অমন চাকরী জুটিয়ে নেওয়া কোন ব্যাপারই নয়। কিছুদিন থেকে সংসারটা একটু গুছিয়ে তারপর সে আর একটা চাকরীর সন্ধান করবে এবং চাকরী পেলেই পরিবারের সবাইকে নিয়ে যাবে তার কর্মস্থানে। এই নোংরা পারিবারিক পরিবেশ তার মনেও ঘৃণার উদ্রেক করেছে।

বাড়ীতে বসে শুধু বিষয় সম্পত্তির তদারকি করে সময় কাটিয়ে দেওয়ার ছেলে তীর্থ নয়। সে নিকটবর্তী শহর কিশোরগঞ্জে বাসা ভাড়া করে টিউশানী শুরু করে দিল। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও অন্যান্য বিষয়েও তীর্থের সমান দখল। তাই দলে দলে ছাত্র তার কাছে প্রাইভেট পড়তে আসতে লাগল এবং উপার্জনও নেহাৎ কম হল না। গ্রামের চেয়ে শহর অনেকটা নিরাপদ বলে তীর্থ বড় দুটি বোনকে তার ভাড়া করা শহরের বাসায় নিয়ে এল। মা বাবা ও ছোট তিনটি ভাইবোন রইল বাড়ীতে। তীর্থ প্রতি সপ্তাহে বাড়ী গিয়ে সব দেখাশোনা করে আসে। তীর্থের মাথায় তার পরিবার সম্বন্ধে অনেক পরিকল্পনা। সে চাকরীর চেষ্টায় চলে যাবে বিদেশে আর তার বাবা মুসলীম রাষ্ট্রে পড়ে থেকে বিপন্ন জীবনযাপন করবেন দুষ্ট স্বজনদের দ্বারা নিগৃহীত হবেন, এটা সে হতে দিতে পারে না। তাই কোলকাতার কাছাকাছি সস্তায় কিছু জমি কিনে নেওয়ার কথা সে ভাবছে। জমিটা কোনমতে কেনা হয়ে গেলেই যেমন তেমন একটা বাড়ী তৈরী করে সে সবাইকে নিয়ে চলে যাবে। দুই ভাইয়ের রোজগারে দিব্যি সংসার চলে যাবে। যৌথ সম্পত্তির নোংরামির মধ্যে আর নয়। এই যৌথসম্পত্তির তদারকী করে তার বাবা যথেষ্ট অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়েছেন। সম্পত্তি পড়ে থাকুক।

সম্পত্তির জন্য তার মনে কোন চাহিদা নেই। বরং এই সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করলেই তারা ভাল থাকবে।

তীর্থ যখন এসব পরিকল্পনা করছিল, তখন বিধাতাপুরুষ হয়ত অলক্ষ্যে হেসেছিলেন। পরিকল্পনা কার্যকরী করার সময় যে তার হাতে নেই সেত তার জানা ছিল না। তীর্থ চেষ্টা করলে কি হবে। নিয়তি তাড়িত দেবেন্দ্রের ললাটে যে অন্যরূপ লেখা আছে তা তীর্থ খন্ডাবে কি করে?

ক'দিন ধরেই তীর্থের শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। একটু একটু জ্বর,খাওয়ায় অরুচি আর একটা দুর্বল দুর্বল ভাব। তীর্থের জীবনে অসুখ-বিসুখ বড় একটা হয়নি। ছোটবেলা থেকেই তার স্বাস্থ্য খুবই ভাল। কমলিনী তাই অসুখটার জন্য বেশ চিন্তিত হয়ে ডাক্তার দেখানোর জন্য তাকে অনবরত তাগাদা দেন। কিন্তু কমলিনীর কথায় তীর্থ মোটেই আমল দেয় না। ওসব অমনি সেরে যাবে বলে মাকে দাবিয়ে রাখে। তারপর চোখে, হাতের তালুতে একটা হলদে ভাব দেখা দিল। শরীর দিনকে দিন দুর্বল হচ্ছে। দেবেন্দ্র কালবিলম্ব না করে ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বললেন, "রোগটা খুব সাধারণ নয়। মারাত্মক ধরণের জন্ডিস। রোগীকে খুব সাবধানে রাখবেন। আর ওষুধ ও পথ্যাদি খুব নিয়ম করে দিতে হবে।" এই বলে তিনি ওষুধপত্র লিখে দিয়ে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ সব ওষুধ কিনে যথারীতি খাওয়ানো চলল এবং পথ্যাদির ব্যাপারেও খুব সাবধানতা অবলম্বন করা হল। কিন্তু রোগের তেমন উপশম হল না। ধীরে ধীরে তার সমস্ত শরীরই হলুদবর্ণ হয়ে গেল। দেবেন্দ্র শহরের কোন নামী ডাক্তারই বাকী রাখলেন না। তারা সবাই এলেন এবং ওষুধপত্র দিলেন। কিন্তু কোন লাভ হল না। এই কালব্যাধিই মৃত্যুদূত রূপে এসে মন্দভাগ্য পিতার সান্নিধ্য থেকে সূর্যসদৃশ পুত্রকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে যমরাজকে উপহার দিল। চিরদুর্ভাগা দেবেন্দ্রের ভাগ্যাকাশ চির অন্ধকারে ছেয়ে গেল।

সূর্য যখন পাটে নামছেন, মাঘীপূর্ণিমার চাঁদ যখন সবেমাত্র গগনকোণে উঁকি দিচ্ছেন, সেইক্ষণে তীর্থের প্রাণপাখী তার রূপের ডালি শরীরখানি ছেড়ে অচিন দেশে পাড়ি জমাল, দেবেন্দ্র চেতনা হারিয়ে ফেললেন। তার অচেতন শরীর অর্ধেক ঘরে অর্ধেক বাইরে পড়ে রইল। মেয়েদের কান্নার রোল উঠল। সেই ভীষণ বিলাপের ধ্বনিতে আকাশ কি বিদীর্ণ হয়েছিল? বসুন্ধরা কি কেঁপে উঠেছিল? বাতাস কি ভারী হয়ে উঠেছিল? পূর্ণিমার চাঁদ কি কিরণ ছড়াতে দ্বিধা করেছিল? বিশ্বপ্রকৃতি কি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল? জাতিধর্মনির্বিশেষে পাড়াপ্রতিবেশীদের বুকে কি বেদনার ঢেউ উত্তাল হয়ে

উঠেছিল? এসব অনুভব করার মত পাশে কেউ কি ছিল? ছিল না। কোন স্বজন বন্ধু ছিল না। ছিল শুধু তীর্থর দুই বন্ধু, ননী ও মানিক। ওই দুই বন্ধুর সঙ্গেই তীর্থকে যেতে হল শ্মশানের পথে। সে পথে সঙ্গী হওয়ার মত আত্মজন কেউ ছিল না। এমন দুর্ভাগ্য কি কারোর কোনদিন হয়? হয় না। শুধু দেবেন্দ্রের ভাগ্যেই এমন করুণ মর্মবিদারী ঘটনা নির্ধারিত ছিল।

অচেতন দেবেন্দ্র পড়ে আছে ঘরের দরজায়। কেউতো নেই। মেয়েরাই কোনমতে তাকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল ঘরের মেঝেতে। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিল। কিন্তু চেতনা ফিরে এল না দেবেন্দ্রের। তার চেতনা বুঝি বা আর ফিরবে না। না ফিরলে কেমন করে হবে? আরও কিছু পেতে যে তার বাকী আছে। তাই তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য গুরুকেই এগিয়ে আসতে হল। অজ্ঞান দেবেন্দ্রের সামনে আবির্ভূত হলেন গুরু। বললেন, ''দেবেন্দ্র! কেন জ্ঞান হারিয়ে বসে আছিস? ভুলে গেলি কেন পূর্বকথা? ঊনত্রিশ দিনের দিন বাঁচাতে পারলেও ঊনত্রিশ বছর বয়সে ওকে আর ধরে রাখা যাবে না। শাপগ্রস্ত মহাপুরুষ শাপমুক্ত হয়ে দিব্যধামে চলে গেছেন। সব জেনেশুনেও তুই শোক করছিস।''

গুরুর আবির্ভাবে দেবেন্দ্রের চেতনা ফিরে এল আর গুরুও অন্তর্হিত হলেন। দেবেন্দ্রের চেতনা ফিরে এসেছে দেখে হতাশ মেয়েরা যেন প্রাণ ফিরে পেল। কিন্তু কিভাবে দেবেন্দ্রের চৈতন্য হল কিছুই তারা বুঝল না। চেতনা ফিরে পেয়ে সব কথা দেবেন্দ্রের মনে পড়ে গেল। তীর্থ যে ঊনত্রিশ বছর বয়সে পা দিয়েছে, সে কথাতো কই একবারও মনে পড়েনি দেবেন্দ্রের। সংসারটা একটুখানি গুছিয়েই ছেলের বিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। পূর্বকথার এমন বিস্মরণ ঘটল কেন তার? মহামায়ার কি আশ্চর্য মায়া। সব ভুলে গিয়ে তিনি পুত্রকে নিয়ে ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্ন দেখছিলেন। পুত্রশোক পাওয়া যে তার বিধিলিপি, সেত পুত্রের জন্মের বহু আগেই হরিদ্বারের আশ্রমে গুরু বলেই দিয়েছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্র সব ভুলে গিয়েছিলেন। সংসারের মোহে গুরুর বাক্য এবং উপদেশের বিস্মরণ ঘটেছিল। এখন সব কিছুই মনে পড়ছে তার। কিন্তু তবু নির্মোহ হতে পারছেন কই! পুত্রশোক যে বড় নিদারুণ শেল। সব কিছু জেনে বুঝেও দেবেন্দ্রের হৃদপিণ্ড যে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। দুই চোখে তার অমানিশার অন্ধকার। গুরুবাক্য স্মরণ করে ইষ্টমন্ত্র অবিরাম জপ করেও শোক সামলানোর অবলম্বন খুঁজে পাচ্ছেন না দেবেন্দ্র।

যথাসময়ে তীর্থের মৃত্যু সংবাদের টেলিগ্রাম গেল দার্জ্জিলিং এ পবিত্রর কাছে

আর কোলকাতায় শচীন্দ্রের কাছে। মহেশের ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই তাদের কাছে বার্তা পাঠানোর কোন প্রশ্নই উঠে না। এই নিদারুণ সংবাদ পেয়ে পাগলপ্রায় পবিত্র তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গেল বাড়ীর পথে। কিন্তু যথাসময়ে বাড়ী পৌঁছতে পারল না। তীর্থের মৃত্যুর ঠিক দু'দিন পরেই শুরু হয়ে গেল উনিশশো পঞ্চাশের হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সে কি ভয়াবহ তাণ্ডব। এই দাঙ্গার পূর্বাভাস না পাওয়ায় হিন্দুরা এতটুকু সাবধান হতে পারেনি। তাই বেঘোরে হিন্দুরা মুসলমানদের হাতে খুন হতে লাগল। মুসলমানরা হিন্দুনিধন যজ্ঞে মেতে উঠল। ভৈরবের পুলে ট্রেন থামিয়ে মুসলমানরা অসহায় হিন্দুযাত্রীদের কচুকাটা করে লাশ ফেলে দিল মেঘনার জলে। হিন্দুর রক্তে মেঘনা নদীর জল লালে লাল হয়ে গেল। আল্লাহ্-আকবর ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হল। হিন্দু দেখামাত্রই মুসলমানরা তাকে হত্যা করে উল্লাসে ফেটে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে হিন্দুদের পক্ষে পায়ে চলা পথের চেয়ে যানবাহনে চড়া আরও বেশী বিপদজ্জনক। তাই পথে ঘাটে কোন হিন্দু দেখা যায় না। কিন্তু নিরুপায় পবিত্রকে তো পথ চলতেই হবে। তাই পবিত্র দাঙ্গা এলাকায় পৌঁছে কোনমতে গা ঢাকা দিয়ে জল জঙ্গল দিয়ে পায়ে হেঁটে এগুতে লাগল। মনে নিরন্তর শংকা কখন মুসলমানদের খপ্পরে পড়ে যায়। এমনি করে প্রাণ হাতের তালুতে রেখে সদ্য ভ্রাতৃহারা শোকার্ত পবিত্র অনাহারে অনিদ্রায় পথ চলতে লাগল।

কিন্তু এত সাবধানে চলেও শেষ রক্ষা হল না। যাত্রার তৃতীয় দিনে সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে কয়েকজন দাঙ্গাকারী যুবক পবিত্র কে ঘিরে ফেলল। প্রাণভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত পবিত্র দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে 'বাঁচান বাঁচান' বলে চীৎকার করতে করতে দৌড়ে এক দোতালা বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। সেই বাড়ীর মালিক মুসলমান। নাম সামসুল হক্। তিনি স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক। বিদ্বান ধর্মপ্রাণ ও সজ্জন হিসাবে এলাকায় তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। অধ্যাপক সাহেব পলকে ব্যাপার বুঝে হেঁচকাটানে পবিত্রকে ঘরে এনে খাটের তলায় ঠেলে দিয়ে নিজে দরজা আগলে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে দুর্বৃত্তরা তাঁর দরজায় এসে হানা দিয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই হক সাহেবের ছাত্র। তারা স্যারকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু দমে গিয়ে বলল, "স্যার আপনার এই ঘরে একটা কাফের ঢুকে পড়েছে। ওকে আমাদের হাতে তুলে দিন। ওকে আমরা এক্ষুণি খতম করে ফেলব। হক সাহেব দৃঢ় অথচ শান্ত গলায় বললেন, "না, তা হবে না। আমি ওকে তোমাদের হাতে তুলে দেব না। ও আমার আশ্রিত। আশ্রিতকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্তব্য। আমি আমার কর্তব্য পালন করবই।" হক সাহেবের

একথা শুনে জিঘাংসু যুবকেরা তেতে উঠল। অসহিষ্ণু গলায় বলল. "আপনি কেমন করে ভাবলেন যে একটা কাফেরকে আপনার আশ্রিত বললেই আমরা ওকে ছেড়ে দেব? আপনাকে মান্য করি বটে, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। ভালয় ভালয় দরজা থেকে সরে দাঁড়ান। ওকে টেনে বের করে আপনার চোখের সামনেই খতম করব। বেশী কাফের প্রীতি দেখালে আপনিও যে রেহাই পাবেন না তাও জানিয়ে দিচ্ছি।" হক সাহেব সমান তেজে বললেন, "আমার প্রাণ থাকতে আমি ওর কেশাগ্রও তোমাদের স্পর্শ করতে দেবনা। আর লেখাপড়া শিখে তোমরা কেন কাফের কাফের বলে চিৎকার করছ? মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে শেখ। আর তা যদি না পার, তবে এই মূহুর্তে আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, হল্লা করার জায়গা নয়।" খুনের উন্মাদনা যাদের রক্তে, নীতিকথা বা অপরের তেজ তাদের কাছে মোটেই সহনীয় হয় না। তাই হক সাহেবের কথার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বন্দুক গর্জে উঠল। 'হায় আল্লা' বলে নিজের ঘরের দরজায় লুটিয়ে পড়লেন অধ্যাপক সামসুল হক সাহেব। রক্তাক্ত কলেবরে হক সাহেবকে লুটিয়ে পড়তে দেখে সম্বিৎ ফিরল দাঙ্গাকারীদের। এ তারা করেছে কি! কাফের মারতে এসে শেষে কিনা নিজেদের শিক্ষাগুরুকেই তারা খতম করে ফেলল! তাছাড়া গণ্যমান্য এই অধ্যাপককে খুন করার পরিণাম কি ভয়াবহ হতে পারে সেটা মাথায় আসতেই তারা ঊর্দ্ধশ্বাসে যে যে দিকে পারে ছুটে পালাল। কাফেরের কথা তখন আর তাদের মনে রইল না।

পবিত্রের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। কারণ তার জন্য হক সাহেব খুন হলেও সে খুনীর কবলিত হল না। হক সাহেবের সুযোগ্য পুত্র সিরাজুল হক এই বিষম বিপদের মধ্যেও পিতার কর্তব্যটুকু পালনে ত্রুটি করল না। সেই রাতেই বিশ্বস্ত লোক সঙ্গে দিয়ে পবিত্রকে নিরাপদে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করল। যাবার বেলায় পবিত্র সিরাজের দুইহাত জড়িয়ে ধরে হক সাহেবের জন্য অঝোরে কেঁদেছিল। সদ্য পিতৃহারা সিরাজের চোখও তখন শুষ্ক ছিল না। একই বিয়োগব্যথায় সেদিন হিন্দু ও মুসলমান দুই তরুণের চোখের জল মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে ছিল।

শুধু হক সাহেব বা তাঁর পুত্রই নয়। দাঙ্গা চলাকালীন সময়ে কিছু সংখ্যক হৃদয়বান মুসলমান ভদ্রলোক হিন্দুর প্রাণ মান বাঁচানোর জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিপন্ন হিন্দুদের সাহায্য করতে গিয়ে অনেক সময় নিজেরাও বিপন্ন হয়েছিলেন। তবু তারা তাদের সাহায্যের হাত গুটিয়ে বসে থাকেন নি সেই ঘোর দুঃসময়ে তাদের সাহায্যের হাত প্রসারিত না হলে, সামসুল হক সাহেবের মত পরার্থে

আত্মোৎসর্গকারী কিছু সংখ্যক মহৎ মানুষ না থাকলে, এই হিন্দু-নিধন যজ্ঞে বলির সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে যেত।

তীর্থের মৃত্যুর পঞ্চমদিনে কাকভোরে অনাহারে অনিদ্রায় পথশ্রমে ক্লান্ত শোকে বিধ্বস্ত পবিত্র জলেকাদায় মাখা ছিন্নভিন্ন পোষাকে 'মা' বলে ডেকে দেবেন্দ্রের বন্ধ দরজায় ঘা দিল। এস্তে দরজা খুললেন কমলিনী। পবিত্রর কণ্ঠ দিয়ে অস্ফুষ্টে আবার ধ্বনিত হল 'মা' শব্দটি। তারপরই সে লুটিয়ে পড়ল কমলিনীর গায়ের উপরে। কোনরকমে টাল সামলে কমলিনী ধরে ফেললেন পবিত্রকে। মেয়েরাও ইতিমধ্যে উঠে এল। সবাই মিলে পবিত্রকে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়। পথের বিঘ্ন অতিক্রম করে ঘরে ফিরে জ্ঞান হারাল পবিত্র। অসার অজ্ঞান পবিত্র, বিলীন তীর্থ, দেবেন্দ্রের আর্তবিলাপে ভোরের আকাশ খানখান হয়ে গেল। কান্না শুনে ওঘর থেকে ছুটে এল তীর্থের বন্ধু ননীগোপাল। দুর্ঘটনার পর থেকে এই পরিবারটিকে ছেড়ে এক মিনিটের জন্যও কোথাও যায়নি সে। ধন্য ননীগোপাল। বিপদে এমন বন্ধু কোটিকে গুটিক মিলে। এই পরিবারের জন্য ননী ঈশ্বরের এক আশীর্বাদ স্বরূপ।

কমলিনী দেবেন্দ্রের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিলাপ করলেন না, এতটুকু ধৈর্য হারালেন না। ননীর সাহায্যে প্রাণপণে পবিত্রর চেতনা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে লাগলেন। একে শীত তায় ভিজে পোষাক, ঠাণ্ডায় পবিত্রর শরীর যেন জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। দুটো হারিকেন জ্বেলে কমলিনী ন্যাকড়া গরম করে তার সমস্ত শরীরে সেঁক দিতে লাগলেন, ননী ভিজে পোষাক যথাসম্ভব ছাড়িয়ে দিয়ে পবিত্রর গায়ে কম্বল চাপিয়ে দিল, চামচ দিয়ে অতি কষ্টে দাঁত কপাটি খুলে দিল। শরীর গরম হলে আস্তে আস্তে পবিত্রর শরীরে একটু সাড় ফিরে এল। কমলিনী দুধ গরম করে চামচ দিয়ে একটু একটু করে তার মুখে দিতে লাগলেন। দুধটুকু খাওয়ার পর চারদিনের উপোসী পবিত্র চেতনা ফিরে পেল এবং উঠে বসল। তারপর ধীরে ধীরে বাবার কাছে গিয়ে পাশে বসে বাবার গায়ে হাত রাখল। পবিত্রর স্পর্শে দেবেন্দ্র ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কিন্তু পবিত্র কাঁদল না। বলল, "বাবা দাদা নেই, কিন্তু আমরা তিন ভাইতো আছি, বোনরাও তো আছে। আমাদের মুখ চেয়ে কি তুমি দাদার শোকটা ভুলতে পার না। যে গেছে হাজার কাঁদলেও সেত আর ফিরে আসবে না। আমাদের ভাগ্যে যা ছিল তাই হয়ে গেছে। এখন তুমি যদি শোক সামলে উঠে না দাঁড়াও তবে আমাদের বেঁচে থেকে লাভ কি?" পবিত্রর কথায় তৎক্ষণাৎ দেবেন্দ্রের কান্না থেমে গেল। শূন্যদৃষ্টি মেলে তিনি পবিত্রর দিকে তাকিয়ে রইলেন। পবিত্রর কথামত অন্য সন্তানদের মুখ দেখে

তিনি এই নিদারুণ পুত্রশোক সম্বরণ করতে পেরেছিলেন কিনা সেটা তার পিতৃহৃদয়ই জানে।

তীর্থের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে শচীন্দ্রকেও টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এতবড় শোকসংবাদটা পেয়ে আসাতো দূরের কথা,সান্তনাসূচক দু'লাইনের চিঠিও লিখেননি তিনি। তীর্থের মৃত্যুতে দেবেন্দ্র শুধু শোকগ্রস্থই নন। বিপন্নও বটে। অসহায় পরিবারের কারণে পবিত্রকেও চাকরী ছাড়তে হল। তীর্থের মৃত্যুতে দেবেন্দ্রের পরিবারে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে তা কাটিয়ে উঠবার মত কোন আশা ভরসা আর নেই। দেশের অবস্থাও হিন্দুদের পক্ষে খুবই প্রতিকূল। এর উপর আছে দেবেন্দ্রের তিন তিনটি বিবাহযোগ্যা কন্যা। পাকিস্থানের মুসলমানদের হিন্দুর প্রাণের চেয়ে হিন্দুমেয়ের ইজ্জতের দিকেই নজর বেশী। কাজেই শচীন্দ্র ভেবে দেখলেন, এ অবস্থায় দেবেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অর্থ নিজের ঘাড়ে বোঝা টেনে আনা। সামান্য যোগসূত্র পেলেই বিপন্ন দেবেন্দ্র হয়ত তার মেয়েদের শচীন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। একবার পাঠিয়ে দিলে ওদের সব দায়দায়িত্ব শচীন্দ্রকেই কাঁধে তুলে নিতে হবে। শচীন্দ্রের সুখের সংসার, সুখের ঘাটে তরী ভিড়ানোই তার বরাবরের অভ্যাস। শচীন্দ্র কোনক্রমেই ওসব ঝামেলায় জড়াবেন না। দেবেন্দ্রের মেয়েদের ভাগ্যে যা আছে তাই হউক। তাই অনেক ভেবেচিন্তে শচীন্দ্র দেবেন্দ্রের সঙ্গে একেবারে যোগাযোগ ছিন্ন করে ফেললেন। এই যোগাযোগ ছিন্নের একমাত্র কারণ দেবেন্দ্রের মেয়েরা।

পবিত্র চাকরী ছেড়ে দিয়েছে, তীর্থের মৃত্যুর পর সেই যে একবস্ত্রে সে রওনা হয়ে এসেছিল,তারপর আর তার কর্মস্থানে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিশোরগঞ্জের বাসা ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বর ভরসা করে তারা পড়ে রয়েছে দেশের বাড়ীতেই। গ্রামের অনেকেই হিন্দুস্থানে চলে যাচ্ছে। কিন্তু দেবেন্দ্রের পরিবারের হিন্দুস্থানে যাওয়ার মত কোন সুযোগ সুবিধা নেই। কাকে অবলম্বন করে তারা হিন্দুস্থানে পাড়ি দেবে? অথচ পরিবারের প্রায় সবাই হিন্দুস্থানে বেশ সুপ্রর্তিষ্ঠিত জীবন যাপন করছে। কিন্তু দেবেন্দ্রের বিপন্ন পরিবারের জন্য তাদের সাহায্যের হাত সম্পূর্ণ গুটানো। এমন অবস্থায় পবিত্র কি করতে পারে? তার বয়সও কম, আর তীর্থের মত সে অতটা চৌকশও নয়। তাই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পবিত্র ও কমলিনী দিশাহারা। আর দেবেন্দ্রতো আছেন মাত্র। একটা ঘোরের মধ্যে তার দিন কাটে। চোখে আলো একদম সহ্য হয় না। দিনরাত ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে রাখেন। রাতের বেলায়ও তার ঘরে কোন আলো জ্বলে না। রাতের অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে নিদ্রাহীন দেবেন্দ্র কখনও জল খান, কখনওবা

ঘুমের বড়ি খান। তীর্থের মৃত্যুর আঘাতের সঙ্গে শচীন্দ্রের ব্যবহারের আঘাতটাও তার মনে কম বড় ক্ষতের সৃষ্টি করেনি। তীর্থের মৃত্যুর পর এভাবেই দেবেন্দ্র মাত্র পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন।

এদিকে গ্রাম প্রায় হিন্দুশূন্য হয়ে পড়েছে। তাই গ্রামে আর থাকা সম্ভব নয়। কাজেই পবিত্র ও কমলিনী পরামর্শ করে আবার কিশোরগঞ্জে বাসা ভাড়া করে চলে যেতে মনস্থির করলেন। কিশোরগঞ্জে একটা বড়সড় বাসাভাড়া করে সবাই চলে এল। বাড়ীঘর দেখাশোনার ভার ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে মুসলমান চাকরবাকরদের হাতেই দেওয়া হল। কমলিনী ও পবিত্র সপ্তাহে একবার করে গিয়ে যাহোক কিছু সম্পত্তির আয় তুলে আনে। এভাবেই কিশোরগঞ্জ বাসায় পরিবারের গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা হচ্ছে।

সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সম্পত্তির লোভ সবারই আছে। বিনাশ্রমে সম্পত্তির ভাগ নেওয়ার জন্য সবাই লালায়িত। তীর্থ বেঁচে থাকতেই দেবেন্দ্রের সঙ্গে এ নিয়ে পরিবারের অন্যান্যদের কিছু তিক্ততাও হয়েছিল। মহেশের দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেরাই বেশী প্রতিষ্ঠিত। তাই তাদের সঙ্গে যোগসাজস করে শচীন্দ্র তাদের সম্পত্তি বিক্রী করে ভাগের টাকা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য পত্রমারফত দেবেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। এই চিঠি পেয়ে তীর্থ যারপর নাই বিরক্ত হল। যার যার সম্পত্তি নিজেরা এসে বিক্রী করে পাওনা গণ্ডা বুঝে নেওয়াই উচিত। শচীন্দ্রের চিঠির উত্তরে এই মর্মে সে দেবেন্দ্রকে দিয়ে চিঠি লেখাল। এতে তাদের আঁতে বড়ই ঘা লাগল। পাকিস্থানে এসে তারা সম্পত্তির জন্য এতটা ঝুঁকি নেবে তাতো হতেই পারে না। ঝক্কিঝামেলাতো চিরদিনই দেবেন্দ্রের দিকেই ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং বিনা প্রতিবাদে দেবেন্দ্র সব ঝক্কিঝামেলা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। হঠাৎ দেবেন্দ্রের এই পরিবর্তন সম্ভব নয়। এটা নিশ্চয় চতুর তীর্থর পরামর্শমত লেখা চিঠি। বিদ্বান দীপ্তিমান তীর্থের প্রতি এমনিতেই বাড়ীর সবার মনে একটা হিংসার ভাব বিদ্যমান ছিল। দেবেন্দ্রের চিঠি পেয়ে সম্পত্তি বিক্রী করতে কেউই পাকিস্থানে এল না। নিরাপদ দূরত্বে থেকে টাকা পাওয়ার মতলবটা পণ্ড হওয়ায় সবাই খুব বিরক্ত হল, বিশেষ করে তীর্থের উপর। এরপর থেকেই দেবেন্দ্রের সঙ্গে শচীন্দ্রের সম্পর্কটা বেশ ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। তীর্থের মৃত্যুর পর দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন হয়ে গেল।

তীর্থের মৃত্যুর মাস ছয় সাত পরে আচমকা শচীন্দ্রের ছোটছেলে প্রদীপ্ত বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। বাড়ীতে এসেই সে তীর্থের অসুখের খোঁজখবর করল এবং তার

মৃত্যুর জন্য খুব শোক শোক ভাব দেখাল। কিন্তু তীর্থের মৃত্যুর পর তাদের ব্যবহার স্মরণ করে কেউই তার এই কৃত্রিম শোক প্রকাশে কোন পাত্তা দিল না। সে যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে সেটা সবাই বুঝতে পারল। কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনের সুযোগ না পেয়ে সে একটু অপ্রস্তুত হল। তারপর সময়মত সে তার আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। সে মাত্র তিন দিনের জন্য এসেছে অন্ততঃ ষাট সত্তর হাজার টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য। কারণ তার দ্বিতীয় বোন রত্নার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে। তাই তাদের টাকার দরকার। এই তিনদিনের মধ্যেই তাকে টাকাটা দিয়ে দিতে হবে। কোথায় বিয়ে ঠিক হয়েছে, কেমন পাত্র, কবে বিয়ে এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রের পরিবারের কেউ কোন কৌতূহল প্রকাশ করল না। শোকগ্রস্ত দেবেন্দ্র খুবই শান্তভাবে বললেন, "আমিতো সুজয়ের ঘটনার পর থেকে সম্পত্তির দায়দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি। একথা তোমার বাবা ভালই জানেন। আমার যতটুকু ফসল প্রাপ্য, অনুমান করে সেটুকুই আমরা নেই এবং ক্লায়কেশে জীবন ধারণ করি। সুজয় খাজনাপত্র কতটুকু আদায় করে সে আমার জানা নেই। তবু মনে হয় প্রজাদের ঘরে অনেক অনাদায়ী খাজনা জমে আছে। তুমি প্রজাদের খবর দিয়ে তাদের সঙ্গে বৈঠক করে অনাদায়ী খাজনা আদায় করে নাও। তারপর তোমাদের অংশের জমি বিক্রী করে প্রয়োজনমত টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে যাও। সম্পত্তির আয়তো এমনিতেই ঘরে উঠে বসে থাকে না। আদায় করে নিতে হয়। আর এসেছ যখন তখন সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারাটাও করে যাও। আমাকে আর ওসবে জড়িও না। তোমার বাবাকে আগেও বহুবার একথা জানিয়েছি।" টাকার থলেটা হাতে হাতে না পাওয়ায় প্রদীপ্তের বড় রাগ হল। রাগ দেখিয়ে সে পরদিনই চলে গেল। কিন্তু আসলে সে চলে যায়নি। একটা ঘোঁট পাকানোর মতলবে সে সুজয়ের দ্বারস্থ হয়েছে। সুজয়রাও বাড়ী ছেড়ে কিশোরগঞ্জেই কোথাও বাসা ভাড়া করে আছে। সম্পত্তির আয় দিয়েই তাদেরও জীবন যাত্রা নির্বাহ হয়। প্রদীপ্ত খুঁজে খুঁজে সুজয়ের ওখানে গিয়ে উঠল। কিন্তু ঘোঁট পাকানোর ব্যাপারে তেমন সফল হল না। তবে সুজয়ের সঙ্গে মিতালী করে হয়ত কিছু টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে থাকবে। দেবেন্দ্র বা পবিত্রর এসব জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তবে এব্যাপারে সুজয় একটা চমৎকার সুযোগ পেয়ে গেল। সুজয় পড়াশুনায় বরাবরই ভালই ছিল। ইতিমধ্যে সে বি.এ পাশ করে ফেলেছে। তাই প্রদীপ্তের মাধ্যমে কাকাকে ধরে সে কোলকাতায় একটা চাকরী জুটিয়ে নিল এবং দিব্যি মা ভাইকে নিয়ে হিন্দুস্থান চলে গেল। কোলকাতা গিয়ে প্রথমে তারা শচীন্দ্রের বাসায়ই উঠল। পরে শচীন্দ্রই তাদের জন্য একটা সুবিধামত ভাড়া বাসা ঠিক করে

দিয়ে কোলকাতায় তাদের থিতু করে দিলেন। শচীন্দ্র আত্মকেন্দ্রিক হলেও মহেশের ছেলেদের জন্য তিনি নেহাৎ কম কিছু করেননি। শুধু দেবেন্দ্রের মেয়েদের আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারেই তার মনে যত অনীহা এবং আতংক।

পঞ্চাশের দাঙ্গার পর পাকিস্থানের হিন্দুদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে গেছে। তাই হিন্দুরা যে যার মত কেউ প্রকাশ্যে কেউবা গোপনে হিন্দুস্থানে পাড়ি জমাচ্ছে। কেউ কেউ জমিজমা তৈজসাদি বিক্রী করে হাতে কিছু টাকাকড়ি নিয়ে যাচ্ছে আবার কেউ কেউ নিঃস্ব হয়েই রওনা দিয়েছে। আবার কিছু সংখ্যক বিষয়সম্পত্তির মোহ কাটাতে না পেরে রয়েও গিয়েছে। তবে তাদের সংখ্যা খুবই সীমিত। রায়পরিবারের মধ্যে পাকিস্থানে সপরিবারে আছেন দেবেন্দ্র আর আছে মহেশের প্রথমপক্ষের ছেলে সৌভাগ্য। সে তার শ্বশুরবাড়ী জামালপুরে থাকে। তার শ্বশুরের সম্পত্তি অঢেল। এজন্য বাড়ীর সম্পত্তি জন্য তার তেমন মাথাব্যাথা নেই। শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুর পর সৌভাগ্যও তার পাততাড়ি গুটাল। সৌভাগ্য বড়ই আত্মম্ভরি মানুষ। নিজেকে সে বড়ই বিজ্ঞ মনে করে। চালাকচতুরও বটে। তাই যাবার সময় সে শ্বশুরের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বেশ ভালদামেই বিক্রী করল। কুটাগাছটিও ফেলে গেল না। বেশ ভাল টাকা পয়সা নিয়ে গিয়ে সে নবদ্বীপ একটু গ্রাম ঘেষেঁ বাড়ী জমি কিনল। দেশে যেমন গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু ও পুকুরভরা মাছ ছিল,হিন্দুস্থানে গিয়ে সৌভাগ্য দেশের মতই সবকিছু করে খুবই জাঁকিয়ে বসল। সে খুবই পরিশ্রমী ও করিৎকর্মা। তাই অল্পদিনের মধ্যেই তার নূতন সংসার ফুলে ফেঁপে উঠল। সৌভাগ্যের দু'টি মাত্র ছেলে। ছেলেরা তার কাছে এক একটি রত্ন বিশেষ। আদরে যত্নে সে তাদের মাথায় করে রাখে। সৌভাগ্য মাত্রাতিরিক্ত বিবেচনাশীল। তাই যেহেতু দেশের সম্পত্তিটা ছেলেদের মাতামহের এবং তাদের মাতামহের সম্পত্তি বিক্রীর টাকা দিয়েই নবদ্বীপের বিষয় সম্পত্তি কেনা হয়েছে। তাই বিবেচনাশীল সৌভাগ্য নবদ্বীপের বাড়ীঘর জোতজমি সবই ছেলেদের নামে কিনল। তার এই সুবিবেচনাই পরিণামে তার কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দেবেন্দ্র ছাড়া রায়পরিবারের সবাই হিন্দুস্থানে চলে গিয়েছে এবং সবাই মোটামুটি ভালই ব্যবস্থা করে নিয়েছে। শুধু দেবেন্দ্রের পরিবারই পাকিস্থানে বিপন্ন জীবন যাপন করছে। দেবেন্দ্র চিরদিন পরের জন্য ভূতের বেগার খেটেছেন। নিজের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেননি। তার তাপিত প্রাণে এসব কথাও উদয় হয়। কিন্তু কিছু করার মত শক্তি ও মানসিকতা তার নেই। বিধাতাও তার প্রতি বাম। মেয়েগুলির জন্যই তার মনে সবচেয়ে দুশ্চিন্তা। দেবেন্দ্র মেয়েদের লেখাপড়া শিখাতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি

অনেক পরিশ্রম করে গ্রামে মেয়েদের প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করেছিলেন এবং ধীরে ধীরে ঐ স্কুলকে হাইস্কুলে পরিণত করার স্বপ্নও তার মনে ছিল। কিন্তু দেশের পরিস্থিতিতে সব বানচাল হয়ে গেল। প্রাইমারী স্কুলের পড়া শেষ করে মেয়েরা অবশ্য হাইস্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। তীর্থ কিশোরগঞ্জ বাসা করে মেয়েদের নিয়ে এসে হাইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল এবং সে নিজে পড়িয়ে মেয়েদের পড়াশুনায় বেশ এগিয়েও দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পড়া আর হল না। তীর্থ মারা গেল এবং পঞ্চাশের দাঙ্গায় দেশের উত্তাল পরিস্থিতির জন্য মেয়েদের স্কুলও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। দেবেন্দ্রের মেয়েদের লেখাপড়ারও ইতি ঘটল। দেবেন্দ্র মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থাও করতে পারছেন না। লেখাপড়াও বন্ধ। এমনি করেই বছর দুই কেটে গেল।

কোন কিছুই চিরদিন একরকম চলে না, চলতে পারে না। তাই দাঙ্গার উত্তেজনাও একসময় স্তিমিত হল। কিছু সংখ্যক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমান ভদ্রলোকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জনজীবনেও কিছুটা সুস্থিতি এল। বন্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে খুলতে আরম্ভ করল। মেয়েদের স্কুলও একসময় খুলল। কিশোরগঞ্জ শহরে এখন মোটামুটি শান্তি বজায় আছে। রাস্তায়ঘাটে এখন হিন্দুমেয়েদের চলাফেরায় ভয়ভীতিটা একটু কম। মেয়েদের স্কুল খোলার পর মুসলমান মেয়েরা রীতিমত স্কুলে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে কিছু হিন্দুমেয়েও স্কুলে যেতে শুরু করল। কিন্তু স্কুলে আর আগের মত সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ছিল না। স্কুলের হিন্দু হেডমিস্ট্রেস চলে গেছেন হিন্দুস্থানে। স্কুলের বেশীর ভাগ শিক্ষক শিক্ষিকাই হিন্দু ছিলেন। তারাও অনেকে পাড়ি জমিয়েছেন ওপারে। কাজেই শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবে যেমন স্কুলের পঠন পাঠন বিঘ্নিত হচ্ছিল তেমনি প্রধান শিক্ষিকার অভাবে স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রেও অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু নূতন করে হেডমিস্ট্রেস নিয়োগ করার জন্য কোন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা পাওয়া গেল না। কারণ সে সময়ে মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রচলনটা কম ছিল। আর মুসলমান মেয়েদের মধ্যে তেমন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন না বললেই হয়। তখন স্কুল কমিটি রাইমোহন সাহা নামে খুবই উচ্চশিক্ষিত ও বয়স্ক এক হিন্দু ভদ্রলোককে মেয়েদের স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োগ করল এবং পঠন পাঠনের অসুবিধা দূর করার জন্য বেশ কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকাও নিয়োগ করা হল। নবনিযুক্ত হেড্‌মাস্টারের তত্ত্বাবধানে স্কুল ভালভাবেই চলতে লাগল।

দেবেন্দ্রের দ্বিতীয় মেয়ে মিতালী রীতিমত মেধাবী ও পড়াশুনায় বড়ই আগ্রহী। তীর্থ তাকে পড়িয়ে ক্লাস অনুপাতে অনেক অগ্রসব কবে দিয়েছিল। তাছাড়া দাদার

মৃত্যুর পর সে নিজে নিজেই বইপত্র নিয়ে পড়াশুনা করত। লেখাপড়ার চর্চা সে একদিনের জন্যও ছেড়ে দেয়নি। স্কুল খোলার পর মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে দেখে তার মনেও স্কুলে যাওয়ার জন্য অদম্য আগ্রহ জাগল। কিন্তু স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার জন্য বাবাকে বলার সাহস হচ্ছে না। বাবারওতো পড়াশুনার ব্যাপারে আগে খুবই আগ্রহ ছিল। মিতালীকে স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে কিছু বলতেই হত না। এমনিতেই বাবা স্কুলে ভর্তি করে দিতেন। কিন্তু মিতালীদের ভাগ্যই যে খারাপ। অমন বড়দা হঠাৎ করে চলে গেলেন। আর বাবাও বড়দার শোকে কেমন হয়ে গেলেন। বাবার মনের কি যে অবস্থা তাকি আর মিতালী বুঝে না? তাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছেটা বাবাকে বলতে না পেরে সে ভিতরে ভিতরে ছটফট করছে। কিন্তু অদম্য আকাঙ্খা মনে আর কতদিন চেপে রাখা যায়? একদিন সাহস করে বাবাকে সে বলেই ফেলল কথাটা। মনে খুবই ভয় ছিল, বাবা নিশ্চয়ই অমত করবেন। কারণ এখন তাদের পারিবারিক যে বিশৃংখল পরিস্থিতি, তাতে তার পড়াশুনাটা নেহাৎই গৌণ ব্যাপার। কিন্তু মিতালীর ভাগ্য ভাল যে দেবেন্দ্র ঠিক অমত প্রকাশ করলেন না। একটু সময় চুপ করে থেকে উদাস গলায় বললেন, "তোমাদের পড়াশোনা হউক, এই ইচ্ছাতো আমার বরাবরই ছিল। কিন্ত ভাগ্য দোষে তা আর হল না। স্কুলে ভর্তি করলেই বা কি হবে। তোমাদের ম্যাট্রিক পাশ করিয়ে যাবার মত সময় যে আমার হাতে নেই তা আমি টের পাচ্ছি। তবে ক্লাস টেনে ভর্তি হয়ে যদি পড়া চালাতে পার তবে আমি ভর্তি করে দিতে পারি। তানা হলে ভর্তি হয়ে কোন লাভ নেই।" মিতালী মাত্র ক্লাস এইটে উঠেছিল। তারপরই পড়া বন্ধ হয়ে যায়। এইটের ছাত্রীর পক্ষে টেনে এ ভর্তি হয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু স্কুলে ভর্তি হওয়ার অদম্য আগ্রহে মিতালী কোন চিন্তা ভাবনা না করেই ক্লাস টেনের পড়া চালিয়ে নিতে পারবে বলল। কারণ পড়ার ব্যাপারে মিতালী মরিয়া। পড়াশুনা তাকে করতেই হবে। মেয়েস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাইমোহনবাবুর সঙ্গে দেবেন্দ্রের আগেরই পরিচয় ছিল। তিনি রাইমোহনবাবুকে তার বাড়ীতে আসার জন্য খবর পাঠালেন। দেবেন্দ্র প্রথমে মিতালীকে ক্লাস টেনে ভর্তি হওয়ার কথা বললেও পরে তিনি ভেবে দেখলেন মিতালী মেধাবী ছাত্রী বটে, কিন্তু তিনটি ক্লাস ডিঙিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পাশ করা খুবই কঠিন কাজ। তাই তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, বড়মেয়ে পাঞ্চালী ও মিতালীকে ক্লাস নাইনে আর ছোটমেয়ে বর্নালীকে ক্লাস এইটে ভর্তি করে দেবেন। রাইমোহনবাবু আসার পর তিনি তাকে একথাই বললেন। রাইমোহনবাবু কোনমেয়ে কোন ক্লাসের যোগ্যতা পরীক্ষা করে মিতালী সম্বন্ধে

বললেন,"রায়বাবু! আপনার এই মেয়েটিকে আমি ক্লাস টেনেই ভর্তি করে নেব। কারণ আমার স্কুলের ক্লাস টেনের অধিকাংশ ছাত্রীই সব বিষয়ে এরচেয়ে অনেক কাঁচা। মেয়ে যখন এতটা এগিয়ে আছে, তবে শুধু শুধু একটি বছর নষ্ট করবেন কেন? আর আপনার অন্য দুই মেয়ে ক্লাশ এইটে ভর্তি হওয়ার যোগ্য। মিতালীর এই প্রশংসায় দেবেন্দ্র খুবই খুশী হলেন। কিন্তু বড়মেয়ে ছোটবোনের নীচের ক্লাসে ভর্তি হতে চাইবে না ভেবে তিনি প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে পাঞ্চালী মিতালীকে ক্লাস টেনে এবং বর্ণালীবে ক্লাস নাইনে ভর্তি করে দিতে অনুরোধ করলেন। রাইমোহনবাবু রাজী হলেন। তখনকারদিনে ভর্তির ব্যাপারে এত কড়াকড়ি ছিল না। মেয়েদের বেলাতে তো কড়াকড়ি ছিলই না। প্রাইভেট টিউটর ছাত্র বা ছাত্রী যে ক্লাসের যোগ্য বলে সার্টিফিকেট দিতেন,সেই ক্লাসেই ভর্তি হওয়া যেতো। দেবেন্দ্র রাইমোহনবাবুকে মেয়েদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন এবং তিনিই সার্টিফিকেট দিয়ে পাঞ্চালী মিতালীকে ক্লাস টেনে এবং বর্ণালীকে নাইন ক্লাসে ভর্তি করে দিলেন। সেটা ছিল মার্চমাস, পরের মার্চেই পাঞ্চালী মিতালীকে ম্যাট্রিকপরীক্ষা দিতেবসতে হবে। ওদের মত ক্লাস ডিঙ্গানো ছাত্রীর পক্ষে সময়টা খুবই অল্প। তবে রাইমোহনবাবু তাদের তৈরী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। রাইমোহনবাবু এমনিতে টিউশানী করেন না। কিন্তু তিনি দেবেন্দ্রের বন্ধুব্যক্তি বলে তার অনুরোধ এড়াতে পারেননি। তাছাড়া বিশেষ করে মিতালীর পড়ার আগ্রহটাও তাকে আকৃষ্ট করেছিল।

তিন তিনটে ক্লাস ডিঙ্গিয়ে ভর্তি হওয়ায় ক্লাস টেনের সিলেবাসটা ওদের কাছে বড়ই কঠিন মনে হল। আর ক্লাসের পড়া চালিয়ে যেতেও ওরা হিমসিম খেতে লাগল। তাছাড়া তিন ক্লাস ডিঙ্গিয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য ক্লাসের মেয়েরা ওদের সবসময় ঠাট্টা টিটকারী দেয়। ওদের সঙ্গে কেউই মিশে না। এমন কি দু'একজন শিক্ষক শিক্ষিকা পর্যন্ত মাঝে মধ্যে টিপ্পনী কাটেন। আর ফাস্ট গার্লের তো অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না।

পাঞ্চালী এতে কিছুটা দমে গেলেও মিতালী মোটেই দমে যাওয়ার মেয়ে নয়। জীবনপণ করে সে পড়াশুনায় লেগে গেল। দিনে সে ষোল থেকে আঠার ঘন্টা পড়াশোনা করতে লাগল। অন্য দু'বোনও যথেষ্টই খাটতে লাগল। তবে মিতালীর মত এতটা ওরা পেরে উঠত না। হাফইয়ার্লি পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল মিতালী ফার্স্ট গার্লের চেয়ে মোটে দুই নম্বর কম পেয়েছে। ক্লাসের মেয়েদের অহঙ্কার চূর্ণ হল। ফার্স্ট গার্ল মিতালীর সঙ্গে মিতালী করতে বড়ই ব্যগ্র হল। আর যে সব শিক্ষক

শিক্ষিকা টিপ্পনী কেটেছিলেন তারাও অবাক। কিন্তু হাফইর্য়ালি পরীক্ষার এই ভাল ফলে মিতালীর মধ্যে কোন অহমিকার সৃষ্টি হল না। তার লক্ষ্য ফাইনাল পরীক্ষায় ভাল ফল করা। পাঞ্চালী অবশ্য হাফইয়ার্লি পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারেনি। কিন্তু মিতালীর ভাল ফল করার জন্যই ক্লাসের মেয়েরা ঠাট্টা টিটকারী বন্ধ করে বন্ধু হয়ে উঠল। এমনি করেই ফাইনাল পরীক্ষা এসে গেল। পাঞ্চালী মিতালী ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসল। এর আগে নীলগঞ্জ গ্রামের কোন মেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসেনি। কিন্তু দুঃখের বিষয় একান্ত পড়ার চাপে পাঞ্চালী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ল। দু'টি মাত্র বিষয় পরীক্ষা দিয়ে সে আর পরীক্ষাটা দিতে পারল না।

যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বেরুল, সমস্ত ক্লাসের মধ্যে মিতালী একাই প্রথম বিভাগে পাশ করল এবং স্কুলের সব ছাত্রীদের মধ্যে বেশী নম্বর পাওয়ায় স্কুল থেকে পুরস্কারও পেল। স্কুলের অন্য সব ছাত্রীই দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে পাশ করল। কিছু সংখক ছাত্রী ফেলও করল। দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করা ফার্স্ট গার্লের মুখ চুন হয়ে গেল। মিতালীর সাফল্যে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা তাকে উচ্চপ্রশংসা করলেন। মিতালীর ম্যাট্রিক পাশ করার সাধ পূর্ণ হল। কিন্তু যে বড়দার কাছে তার পড়াশুনার হাতেখড়ি। সেই বড়দা তার এই সাফল্য দেখল না এটাই মিতালীর বড় দুঃখ।

মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে দেবেন্দ্র বরাবরই খুব আগ্রহী ছিলেন। তাই মিতালীর এই সাফল্যে সদাবিষন্ন দেবেন্দ্রও খুশীতে ঝলমল করে উঠলেন। তীর্থের মৃত্যুর পরে তাকে কোনদিন এমন প্রফুল্ল দেখা যায়নি। খুশী কমলিনীও হয়েছেন। কিন্তু বড়মেয়ের অসাফল্যে তিনি কিছুটা ম্রিয়মান হয়ে রইলেন। পরীক্ষা দিতে না পারায় পাঞ্চালীরও মন ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু দেবেন্দ্র তার এই মন খারাপকে মোটেই পাত্তা দিলেন না। এ বছরে হয়নিতো কি হয়েছে? চেষ্টা করলে পরের বছর অবশ্য হবে। বাবার কথায় পাঞ্চালী মন খারাপ না করে আগামী বছর পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে লাগল এবং মিতালীকে দেবেন্দ্র কলেজে ভর্তি করে দিলেন। পরের বছর পাঞ্চালী ও বর্ণালী ভালভাবেই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করল এবং মিতালী আই.এ ক্লাসে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠল। এই পরীক্ষা পাশের ফলে দেবেন্দ্রের মেয়েদের আবদ্ধ জীবন যেন একটু খোলা হাওয়ার স্পর্শ পেল। আর শোকজর্জর বিষন্ন দেবেন্দ্রও যেন মেয়েদের এই পাশের ফলে বিষণ্ণতা কিঞ্চিৎ কাটিয়ে উঠলেন।

দেবেন্দ্র পাঞ্চালী বর্ণালীকেও কলেজে ভর্তি করে দিলেন। যতটা পারে ওরা পড়াশুনা করুক এই দেবেন্দ্রের ইচ্ছা। সংসারের আর কোন ব্যাপারেই দেবেন্দ্রের

কোন ভূমিকা নেই। কমলিনী আর পবিত্রই সংসার চালায়। আত্মীয়রা কেউই এই নিবার্ন্ধব বিপন্ন পরিবারটির খোঁজ খবর করে না। খোঁজখবর না করলেও বাড়ীর লোকেরা হিন্দুস্থানে বসেও তাদের খবর রাখে এবং মুসলীম রাষ্ট্রে দেবেন্দ্রের মেয়েদের মানহানিকর করুণ পরিণতির জন্য হৃষ্ট মনে প্রতীক্ষা করে। এই হল, আত্মীয়তা, এই রক্তসম্পর্ক।

দেবেন্দ্র মেয়েকে ঠিকই বলেছিলেন যে তার হাতে সময় আর বেশী নেই। দেবেন্দ্রের জীবনে কিছু সাধনা ছিল। সেই সাধনপ্রভাবেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মৃত্যু তার নিকটবর্তী। কিছুদিন ধরেই দেবেন্দ্রের শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, যে তার পেটে আলসার হয়েছে। এই রোগে মাসখানেক ভুগলেন দেবেন্দ্র। যথারীতি চিকিৎসাও হল। কিন্তু রোগের উপশম হল না। এই রোগেই তীর্থের মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে শোকজর্জরিত, স্বজন লাঞ্ছিত, ভাগবিড়ম্বিত দেবেন্দ্র ইহলীলা সংবরণ করলেন। তীর্থের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্র যে মাত্র পাঁচবছর বেঁচে ছিলেন, তা বোধহয় মেয়েদের এটুকু লেখাপড়া শেখাবার জন্যই। কারণ মেয়েদের এই স্বল্প বিদ্যাই দেবেন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের সংসারের ভবিষ্যতে বাঁচার একমাত্র অবলম্বন হবে তা কি সাধক দেবেন্দ্রের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল?

দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর সহজ সরল কমলিনী তিন যুবতী মেয়ে ও দুই নাবালক ছেলে নিয়ে অথৈ জলে পড়ে গেলেন। বিষয় আশয় ব্যাপারে কমলিনী কোনদিন মাথা গলাননি, হেঁশেল ঠেলেই তিনি জীবনের এতটা কাল কাটিয়ে দিয়েছেন। বিষয় সম্পত্তি ও নগদটাকা পয়সা কি আছে বা কতটুকু আছে সে সম্পর্কে দেবেন্দ্র কিছুই কমলিনীকে বলে যাননি। সম্পত্তির আয়ব্যয়, নগদ টাকা পয়সা সবই পবিত্রর হাতে। সদ্য বিধবা কমলিনী একেবারে নিঃসম্বল। অথচ দায়দায়িত্বের অন্ত নেই। তৎপর হলে দেবেন্দ্র জীবিত থাকতে থাকতেই একটি বা দু'টি মেয়ের বিয়ে হয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে চেষ্টা মোটেই করা হয়নি। দেবেন্দ্র জীবনের শেষ পাঁচ বছরতো মরে বেঁচে ছিলেন। কাজেই এই সময়টায় তিনি আর কি করবেন। এমনিতেও নিজের সংসার গুছানোর মত লক্ষ্য তার কোনকালেই ছিল না। আর কমলিনীরও একান্ত নির্ভরশীল স্বভাব। স্বামী না করলে নিজেই যে উদ্যোগ নিয়ে গুছিয়ে নেবেন, এমন ক্ষমতা তার ছিল না। তবু দেবেন্দ্র বেঁচে থাকতে কমলিনীর মাথার উপর একটা ছাদ ছিল। এখন দেবেন্দ্রের অবর্তমানে কমলিনীর মাথার উপর খোলা আকাশ। সবচেয়ে বড় মুস্কিল এদেশে থাকার দুশ্চিন্তা। কখন কি বিপদ উপস্থিত হয় বলা যায় না। একদিকে স্বামীর জন্য

শোক অন্যদিকে মেয়েদের চিন্তায় কমলিনীর মুখে অন্ন রোচে না, চোখে ঘুম নামে না।

যৌথসম্পত্তির আয়দায় এখন সবই পবিত্রর হাতে। সম্পত্তির অংশীদাররা অর্থাৎ শচীন্দ্র ও মহেশের ছেলেরা পাকিস্থানকে বিভীষিকা দেখে। তাই সম্পত্তির অংশ নেওয়ার জন্য দেশে আসার মানসিকতা তাদের নেই। নিরাপদ দূরত্বে বসে থেকে বিনা শ্রমে যার যার প্রাপ্যটা পাওয়ার জন্য তাদের যেমন প্রচণ্ড লোভ তেমনি না পাওয়ার জন্য মনে মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ। দেবেন্দ্রের পরিবারের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই বটে, তবু গ্রামের লোকদের যাতায়াত ও দেখাসাক্ষাতের মাধ্যমে তাদের লোভ ক্ষোভের বার্তা এবং ভবিষ্যতে দেবেন্দ্রের মেয়েদের ভয়াবহ পরিণতি যে অবশম্ভাবী সে সম্পর্কে তাদের কটু মন্তব্য নিরন্তর ভেসে আসে।

দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর কমলিনীর সঙ্গে পবিত্রর সম্পর্কের মধ্যে বেশ চিড় ধরেছে। বাপের মৃত্যুর পর এতবড় বিষয়সম্পত্তি হাতে পেয়ে চঞ্চলচিত্ত যুবক পবিত্র যেন রাতারাতি বদলে গেল। অর্থ অনর্থের মূল। অর্থের মোহ চিরদিনই শ্রদ্ধা ভালবাসার নির্মল সম্পর্কের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। পবিত্র ও কমলিনীর মধ্যেও সেই একই ঘটনা ঘটতে চলেছে। শুধু তাই নয়। অন্য একজনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েও পবিত্র ভিন্নপথে চালিত হচ্ছিল। সেই অন্য একজন হল অবনীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী অচলা।

তীর্থের মৃত্যুর বছর দেড়েক আগেই অবনীর মা ক্ষীরোদার মৃত্যু হয়েছিল। ক্ষীরোদার মৃত্যুর মাত্র মাস ছয়েকের মধ্যেই অবনীর স্ত্রীও সাপের কামড়ে বাপের বাড়ীতে মারাযায়। মা ও স্ত্রী মারা যাওয়ায় অবনী ঝাড়া হাতপা হয়ে চিরদিনের ঠাঁই মেজমামার আশ্রয় ত্যাগ করে পাকিস্থানেই ভিন্ন ভিন্ন আত্মীয়ের বাড়ীতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর সে উপস্থিত হল কোলকাতায় ছোটমামার বাসায়। তার অন্তরে ইচ্ছা ছোটমামার ওখানেই সে আস্তানা গাড়বে। পাকিস্থানে আর ফিরে আসবে না। কিন্তু ছোটমামার সংসারে ভ্যাগাবণ্ড অবনীর ঠাঁই কোনদিন হয়নি, এবারও হল না। মাস দু'য়েক কাটার পরই ছোটমামা তাকে চলে যাওযার জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। অবনী আর কি করে। সে পাকিস্থানে এসে সেজমাসীর বাড়ীতে উঠল। সারদাও তখন জীবিত ছিলেন না। মাসতুতো ভাইদের সংসার। কিন্তু মেজমামার ওখানেও চট্ করে আসতে তার মনে একটু সংকোচ হচ্ছে। কারণ মেজমামার জীবনের সব দুর্ঘটনার খবরই সে রাখে। কিন্তু সেও এই দুঃসময়ে মেজমামার সঙ্গে সামান্য চিঠিপত্রের যোগাযোগও করেনি। অথচ মাসীর বাড়ীতেও তেমন সুবিধে হচ্ছে না। এমন সময় তার জীবনে

একটা বিশেষ ঘটনা ঘটল। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে অবনীর দ্বিতীয়বার বিয়ে করার খুবই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তার অপদার্থতার কারণে দেবেন্দ্র এ ব্যাপারে মোটেই আগ্রহ দেখাননি। তার মামার বাড়ী ত্যাগ করার পিছনে এটাও একটা কারণ। অনেক বছর পরে এবার মাসীর বাড়ীতে এসে তার সেই সুযোগটা এসে গেল। এই গ্রামে এক হতদরিদ্র বিধবা দুটি সুন্দরী মেয়ে নিয়ে ভাইয়ের বাড়ীতে গলগ্রহ হয়ে পড়ে আছেন। মেয়ে পাত্রস্থ করার কোন ক্ষমতা তার নেই। অবনীকে পেয়ে মেয়ের বড়মামা সুন্দরী যুবতী বড় ভাগ্নীটিকে অবনীর মত কালো,ঢেঙা,নিঃস্ব চল্লিশোর্ধ পাত্রের হাতে নির্দ্বিধায় তুলে দিলেন। যেন বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এতে অচলার বড়মামা কালীশংকরের খুবই নিন্দে হল। পয়সা বাঁচানোর জন্যই তিনি অমন সুন্দর মেয়েটিকে জলে ভাসিয়ে দিলেন। সবাই নিন্দে করলেও অচলার মা কিন্তু মোটেই নিন্দে করলেন না। কারণ অচলা নামে অচলা হলেও স্বভাবে বড়ই চঞ্চলা। বামুনের মেয়ে হয়ে আজ নাপিত ছেলের কাছ থেকে আংটি উপহার নেয়। কাল নমঃশূদ্র ছেলের কাছ থেকে শাড়ী উপহার পায়। পরশু পুকুরপাড়ে জামগাছের আড়ালে মুসলমান ছেলেরসঙ্গে ফুসুরফাসুর আলাপ করে। বাড়ীর লোক শাসন করলে তার ফিটের ব্যামো দেখা দেয়। এহেন মেয়েকে যেমন তেমন করে পার না করলে যে কুলে কালি পড়বে এই ভেবেই যে কালীশংকর তাকে অবনীর মত পাত্রের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন,সেটা অন্য কেউ না জানলেও অচলার মাতো জানেন। তাই ভাইয়ের প্রতি তার কোন অভিযোগ নেই।

এই বয়সে অবনী এমন উচ্ছলযৌবনা সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হল। কিন্তু স্ত্রীকে নিয়ে মাসতুতো ভাইয়ের বাড়ীতে থাকা আর পোষাল না। তাই অগতির গতি মেজমামার ওখানেই এক সন্ধ্যায় সে সস্ত্রীক গুটি গুটি পায়ে এসে হাজির হল। অবনীর এমন বউ দেখে বাড়ীর সবাই অবাক। তবে সবাই স্বাভাবিক ব্যবহারই করল। এ বাড়ীতে দু'একজন লোকের অন্নের অভাব হয় না। তাই অবনী স্বচ্ছন্দে আগের মতই মামার বাড়ীতে বসবাস করতে লাগল। তাছাড়া সে আসায় একটা সুবিধাও হল। দেবেন্দ্র সপরিবারে কিশোরগঞ্জে থাকেন। বাড়ীঘর খেতখামার সবই চাকরবাকর ও ভাগীদারের হাতে। এতে খুব লোকসান হয়। অবনীকে তার স্ত্রীসহ বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলে এরকম লোকসান হবে না। কারণ সে সব দেখাশোনা করতে পারবে। তাই অবনী আসার কিছুদিন পর তাকে স্ত্রীসহ বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

সুন্দরী যুবতী অচলার সঙ্গে অবনী একেবারেই মানানসই নয়। তাই বিয়ে হলেও অচলা মন থেকে অবনীকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তার অতৃপ্ত উচ্ছল যৌবন অন্য কোন ঘাটে তরী ভিড়ানোর জন্য সদাসর্বদা আকুলি বিকুলি করে। এই খপ্পরেই পড়ে গেল সরলচিত্ত সুদর্শন যুবক পবিত্র। অচলা শুধু সুন্দরী নয়, অত্যন্ত চতুর, কমলিনী ও পবিত্রের সম্পর্কটা তার মোটেই সহ্য হয় না। তাই পবিত্র বাড়ীতে গেলে সে পবিত্রকে কমলিনীর বিরুদ্ধে নানাকথা বলে তাদের সুসম্পর্কে ভাঙ্গন ধরাতে চেষ্টা করে। ব্যাপারটা কমলিনী ও দেবেন্দ্র দু'জনেই আঁচ করতে পারলেও প্রতিকারের তেমন সুযোগ হয়নি। কারণ সে সময়টাতেই দেবেন্দ্র অসুখে পড়ে গেলেন এবং এই অসুখেই তার জীবনান্ত হল।

দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর অচলার সাহস খুবই বেড়ে গেল। সে কমলিনীর বিরুদ্ধে পবিত্রর কানে নিরন্তর বিষ ঢালতে লাগল এবং তার ভোগবিলাসের মাত্রা চূড়ান্তভাবে বেড়ে গেল। এই ভোগবিলাসের সমস্ত খরচ সে পবিত্রর কাছে থেকেই আদায় করতে লাগল। অবনীরতো আর্থিক কোন ক্ষমতাই নেই। কমলিনীর বিরুদ্ধে অচলার এই চক্রান্ত অবনীও টের পায়। সে অত নীতিজ্ঞানহীন নয়। তাই অচলার এই হীন কার্যকলাপে সে যে খানিকটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেনি তা নয়। কিন্তু অচলা তাকে গ্রাহ্যই করে না। অচলা যা করার করেই চলল। ফল কমলিনীর পক্ষে খুবই খারাপ হল। অচলার প্রভাব এবং অর্থের মোহ এই দুই পবিত্রকে উদ্‌বোধিত করল প্রতিপালিকা মাতা স্নেহময়ী কমলিনীকে বঞ্চনার পথে ঠেলে দিতে।

পৈত্রিক বিষয় আশয়ে যে বিমাতাও বৈমাত্রেয় ভাইবোনদের সমান অধিকার রয়েছে, পবিত্রর আচর-আচরণে তা একেবারেই মনে হয় না। সেই যেন দেবেন্দ্রের একক উত্তরাধিকারী আর ওরা যেন গলগ্রহ। কমলিনী মেয়েদের বিয়ের উল্লেখ করলে সে খুবই বিরক্ত হয়, অর্থাভাবের দোহাই দেয়। কমলিনী বাপের বাড়ীর জন্যও কম কিছু করেন নি। কিন্তু এই সংকটকালে দেখা গেল শ্বশুরবাড়ী বাপের বাড়ীর সব লোকেরই এক চেহারা। শ্বশুরবাড়ী ও বাপের বাড়ীর সব লোকেই কন্যাদায়গ্রস্ত কমলিনীর দুর্দশার শেষসীমা দেখার জন্য দূর থেকে প্রতীক্ষা করছে। এদিকে পবিত্রর সঙ্গে সম্পর্কের ফাটলটা দিনদিন বড় হচ্ছে। স্বার্থের সংঘাত বেড়ে চলেছে। আর বেড়ে চলেছে কমলিনীর সংসারে অচলার কর্তৃত্ব। ইদানীংকালে পবিত্র কমলিনীদের অন্নবস্ত্রের ব্যাপারেও এমন কার্পণ্য করছে যে তাদের নিত্য জীবনযাত্রা নির্বাহ বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

পবিত্র এখন বেশীর ভাগ বাড়ীতেই থাকে। আর কমলিনী ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিশোরগঞ্জের ভাড়া বাড়ীতে থাকেন। মাঝে মধ্যে একবেলার জন্য বাড়ীতেও যান। অচলা-অবনীতো স্থায়ীভাবেই আছে বাড়ীতে। পবিত্র মাঝে মধ্যে বাসায় আসে এবং দু'এক রাত থাকেও। কিন্তু তার মেজাজ সবসময় এমন তিরিক্ষে হয়ে থাকে যে তাকে কোন প্রয়োজনীয় কথাই বলা যায় না। কমলিনীর সংসার খরচে দিন দিন টান পড়ছে। মেয়েদের কলেজের বেতন দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় বাধ্য হয়ে ওদের পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে। শুধু মিতালী অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল বলে তার আই. এ পরীক্ষাটা দেওয়া হল এবং সে পাশও করল ভাল ভাবেই। কিন্তু পাশ করলেতো আর আর্থিক কোন সুরাহা হয় না। কষ্টে কমলিনী জীবনযাত্রা টেনে চলেছেন। অথচ বাড়ীতে প্রাচুর্যের ঢল। বাড়ীতে কিবা খাওয়া দাওয়া কিবা অচলার শাড়ী গয়না। এসব দেখে কমলিনীর সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। অচলা প্রকাশ্যে কমলিনীকে হেনস্থা করে। খরচপত্র নিয়ে পবিত্রর সঙ্গে কমলিনীর কলহ হয়। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। বরং দিনদিন অনটন বাড়তেই থাকে। কমলিনী চক্ষু লজ্জা ত্যাগ করে গ্রামের দু'একজনকে তার সমস্যার কথা জানান। তারা মুখে সহানুভূতি প্রকাশ করে। কিন্তু সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে না। কারণ পবিত্র পুরুষ মানুষ, বয়সেও নবীন আর বিষয় আশয়ও তার হাতে। কাজেই পবিত্র সবল, কমলিনী দুর্বল। মানুষ সাধাবণতঃ সবলের পক্ষই অবলম্বন করে। দুর্বলের প'ক্ষে কেউ কথা বলে না। এটাই সংসারের চিরাচরিত নিয়ম। কাজেই কমলিনী তাদেরও কোন সাহায্য সহাযতা পেলেন না।

কমলিনী বড়ই অসহায় হয়ে পড়েছেন। প্রাপ্য বিষয়সম্পত্তি আদায় করাতো দূরের কথা, তার গ্রাসাচ্ছদনের খরচটা ও ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে। তবু এখন যা পাওয়া যাচ্ছে, ভবিষ্যতে যে তাও পাওয়া যাবে না তা তিনি পরিস্কার বুঝতে পারছেন। সহায় সম্বলহীন কমলিনীর চোখের সামনে জমাট অন্ধকার। অথচ মাত্র পনর বছর বয়সে এই মাতৃহীন পেটরোগা ছেলেটিকে তিনি বুকে তুলে নিয়েছিলেন। এখন তার কোন মূল্যই নেই। আজ তার গায়ে শুধু বিমাতা বিমাতা গন্ধ। বেদনায় কমলিনীর বুক ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

মানুষ যখন সবদিক দিয়ে নিরুপায় হয়ে যায়, অসহায়ত্ব যখন তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে, তখন ঈশ্বরের আসন টলে উঠে। সহায় হয়ে তখন তাঁকেই এসে দাঁড়াতে হয় বিপন্নের পাশে। ঈশ্বরের রূপ নিয়ে আসেন না তিনি, মানুষের মধ্যে দিয়েই ঘটে তার আবির্ভাব। বিপন্ন কমলিনীর সামনেও সহায় হিসাবে উপস্থিত হলেন তেমনি

ঈশ্বরের দূতস্বরূপ এক মানুষ। কমলিনীদের ভাড়াবাড়ীর পাশের বাড়ীতে ভাড়াটে থাকেন হেমেন্দ্র কর নামে এক বয়স্ক কায়স্থ ভদ্রলোক। তিনি একা থাকেন। পরিবার পরিজন পাঠিয়ে দিয়েছেন হিন্দুস্থানে। সম্পত্তিবিক্রির প্রয়োজনে তিনি একা রয়ে গেছেন। দেবেন্দ্র থাকতেই এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কমলিনীদের পরিচয়। ভদ্রলোক প্রায়ই আসতেন দেবেন্দ্রের সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় কাটাতে। শোকগ্রস্ত দেবেন্দ্র কারোর সঙ্গে তেমন কথাবার্তা না বললেও হেমেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। খুবই সজ্জনব্যক্তি এই হেমেন্দ্রবাবু। তার সঙ্গে দেবেন্দ্রের এমন ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল যে দুই পরিবারের পারিবারিক কথাও উভয়ের জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আসতেন কমলিনীদের বাসায়। বেশীর ভাগ সময়েই মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেই তিনি চলে যেতেন। সংকোচবশতঃ কমলিনী ভদ্রলোকের সঙ্গে বিশেষ কথার্বাতা বলতেন না। হেমেন্দ্রবাবু জলপাইগুড়িতে বাড়ী করেছেন। এখানকার সম্পত্তিও প্রায় সবটাই বিক্রী করে ফেলেছেন। ব্যবসাপত্রও অনেকটাই গুটিয়ে এনেছেন। শীঘগিরই তিনি চলে যাবেন। অর্থাৎ তার একপা হিন্দুস্থানে আর এক পা পাকিস্থানে। কমলিনীর দুর্গত অবস্থাটা তিনি মনে মনে বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে ইতস্ততঃ করছিলেন। কারণ অন্যের পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলাটা কতটুকু সংগত, তাই ভেবে তিনি কিছুটা সংকোচবোধ করছিলেন। তার নিজেরও সম্পত্তি বিক্রী ও ব্যবসা গুটানোর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শীঘগিরই তিনি এখানকার পাট উঠিয়ে চলে যাবেন জলপাইগুড়িতে। কমলিনীর মেয়েদের প্রতি তার খুবই স্নেহ ছিল। কিন্তু কমলিনীর পরিস্থিতি যা দেখছেন, তাতে কমলিনীর একেবারে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। তাই যাবার বেলায বন্ধুপত্নীর একটু উপকার করে যাওয়া কর্তব্য বিবেচনা করে সংকোচ ঝেড়ে ফেলে একদিন কমলিনীকে বললেন, "কিছু যদি মনে না করেন তবে আপনাকে একটা কথা বলি বউঠান! আপনি উপযুক্ত তিনটি মেয়ে নিয়ে এখানে যেভাবে আছেন সেটা কিন্তু মোটেই নিরাপদ নয়। আপনি ওদের হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দিচ্ছেন না কেন?" কমলিনীকে এমন সহানুভূতিসূচক কথা আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি। তাই কমলিনী যেন ভদ্রলোকের কথায় হাতে আসমান পেলেন। অসহায়কণ্ঠে বললেন, "সেকি আমিও ভাবছি না ঠাকুরপো! কিন্তু কি করে পাঠাব বলুন। হিন্দুস্থানে কে আমার মেয়েদের আশ্রয় দেবে? আত্মীয় স্বজনতো অনেক আছে আমার হিন্দুস্থানে তাদের অনুনয় বিনয়ও কম করিনি। কিন্তু আমার মেয়েদের আশ্রয় দিতে কেউই রাজী নয়। কিন্তু আপনি অনাত্মীয় হয়েও পরমসুহৃদের মত

কথাটা তুললেন বলে আমিও আমার অবস্থাটা আপনাকে খুলেই বলছি। স্বামী ছাড়া আমার সবই আছে। কিন্তু আসলে কেউ নেই।'' একথা বলে কমলিনী আর চোখের জল সামলাতে পারলেন না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন তিনি। কমলিনীর চোখের জলে ভদ্রলোকের মন সহানুভূতিতে গলে গেল।তিনি বললেন,''আপনি ওরকমভাবে ভাবছেন কেন বউঠান? আত্মীয়স্বজনদের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করুন। দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। আজকাল হিন্দুস্থানে অনেক মেয়েরাই চাকরীবাকরী করছে। দিব্যি স্বাধীনভাবে দিন কাটাচ্ছে। আপনার মেয়েরাতো পাশ করা। ওখানে গিয়ে অনায়াসে চাকরী জুটিয়ে নিয়ে ওরাও স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে। ওখানে মেয়েদের চলাফেরায় কোন অসুবিধে নেই। অবশ্য আমি জানি আপনারা রক্ষনশীল পরিবার। তাই মেয়েদের চাকরী করাটা আপনাদের পছন্দ না হওয়াই স্বাভাবিক।'' কমলিনী বললেন, যেখানে আমার মেয়েদের মানইজ্জতের প্রশ্নে আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি সেখানে পারিবারিক মর্যাদা আঁকড়ে বসে থাকব, এমন পাগল আমি নই ঠাকুরপো। পরামর্শটা আপনি ভালই দিয়েছেন। কিন্তু এতেও সমস্যা আছে। হিন্দুস্থানে আমি কার কাছে কোথায় মেয়েদের পাঠাব, আর কেই বা চাকরী জুটিয়ে দেবে?'' হেমেন্দ্রবাবু একটু চুপ করে রইলেন। তরপর বললেন,''দেখুন বউঠান, আপনি যদি আমার উপর নির্ভর করতে পারেন, তবে আমি ওদের চাকরীর একটা চেষ্টা করতে পারি। তবে চাকরী হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ইচ্ছা। মানুষ শুধু চেষ্টাটুকুই করতে পারে। কাছাকাছি রাজ্য ত্রিপুরায় আমার অনেক আত্মীয়স্বজন আছে। শুনেছি ওখানে চাকরীও সহজেই মিলে. আপনার মত থাকলে আমি সেখানে আপনার মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আর চাকরী যোগাড় করে দেওয়ার মত আমার জানাশোনা লোকও সেখানে আছে। আপনি মনস্থির করে জানালে আমিই সব ব্যবস্থা করে দেব। শুধু শুধু হাহুতাশ করলেতো লাভ হবে না বউঠান! যাহোক একটা কিছু করুন। নইলে বড়ই বিপদে পড়ে যাবেন।'' এসব কথাবার্তা বলে ভদ্রলোক সেদিনের মত উঠলেন।

কমলিনীর মেয়েরা প্রস্তাবটা লুফে নিল। কারণ এই কলেপড়া ইঁদুরের মত জীবন তারা আর সহ্য করতে পারছে না। তারা এই দমবন্ধ করা জীবন থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুক্ত বাতাসে স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস নিতে চায়। এই কূট কচালে পরিবেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ওরা দিনরাত ছটফট করে মরছে। কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার কোন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেনা। তাই হিন্দুস্থানে চলে যাবার এই যে সামান্যতম সুযোগ

হাতের কাছে এসেছে, সেটাকে তারা পরমভাগ্য বলে মনে করছে। একবার কোনমতে চলে যেতে পারলে পরে যা হবার হবে। তাই তারা মায়ের মতামতেব অপেক্ষা না করেই তিনবোন মিলে ভদ্রলোককে ছেঁকে ধরল। "আপনি মায়ের মতামতের অপেক্ষা করবেন না কাকাবাবু! আমরাতো যথেষ্ট বড় হয়েছি। তাই আমরা বলছি, এটুকু সুযোগ যখন আপনি করে দেবেন বলেছেন, তখন আমরা অবশ্য চলে যাব, কারোর কথা শুনব না। আপনি তাড়াতাড়ি আমাদের যাবার ব্যবস্থা করে দিন। সেখানে গিয়ে আমাদের চাকরী যদি নাও হয়, আমরা ভিক্ষে করে খেতেও রাজী আছি।"

মেয়েদের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং নিজের অবস্থার কথা ভেবে কমলিনী ওদের যাওয়াই স্থির করলেন এবং ব্যাপারটা পবিত্রকেও জানালেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে সে এব্যাপারে বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করল না। কমলিনী বুঝতে পারলেন, যে এদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে যথার্থই উদাসীন। বর্তমানে কমলিনীর সঙ্গে তার খুবই খটাখটি থাকলেও সে যে বোনদের প্রতি এতটা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করবে তা তিনি ভাবতে পারেননি। কমলিনী বড়ই দুঃখিত হলেন। কত স্নেহে যত্নে আপন সন্তানের অধিক মনে করে তিনি তাকে বড় করে তুলেছেন। অথচ আজ সে তাকে এই প্রতিদান দিল। মেয়েদের আড়ালে কমলিনী চোখের জলে ভাসলেন।

সময় হলেই সবকিছু হয়ে যায়। হেমেন্দ্রবাবু নিজে ঢাকায় গিয়ে কমলিনীর মেয়েদের মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট বের করে আনলেন। যাওয়ার প্রস্তুতির জন্য যতকিছু কাজ সবই দ্রুত নিষ্পন্ন হল। তারপর শুভদিন দেখে কমলিনীর মেয়েদের নিয়ে হেমেন্দ্রবাবু ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ওদের তুলে দেবার জন্যও পবিত্র বাড়ী থেকে আসল না এতে কমলিনীর দুঃখ আরও বাড়ল। অনাত্মীয় অল্প চেনা ভদ্রলোকের হাতে নিরুপায় কমলিনী তার যুবতী মেয়েদের তুলে দিলেন। তার মেয়েরা অজানা অচেনা অন্ধকার ভবিষ্যতের বুকে ঝাঁপ দিল। কমলিনী জানেন না এই অনিশ্চিত জীবন থেকে তার মেয়েদের নিশ্চিত জীবনে উত্তরণ ঘটবে কিনা।

ত্রিপুরায় পৌঁছে হেমেন্দ্রবাবু তাব এক আত্মীয়ের বাড়ীতে ছোট একটি ঘর ভাড়া করে কমলিনীর মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা করলেন এবং নিজে দিনকয়েক ত্রিপুরায় থেকে এক প্রাইভেট স্কুলে বড় মেয়ে পাঞ্চালীর জন্য শিক্ষিকার কাজ যোগাড় করে ফেললেন। বেতন যদিও খুবই কম তবুতো টিকে থাকার একটা সামান্য অবলম্বন হল। তারপর বাড়ীর মালিক এবং অন্যান্য পরিচিতদের অন্য দুই বোনের চাকরীর ব্যবস্থার জন্য বলে কয়ে পাকিস্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। হেমেন্দ্রবাবু রওনা

হওয়ার সময় বর্ণালী কেঁদে ফেলল। তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করলেন,প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। পাতানো কাকার জন্য বর্ণালী চোখের জল ফেলছে অথচ আপন কাকার কথা মনে পড়লে বিতৃষ্ণায় মন ভরে যায় ঈশ্বরের কি বিচিত্র লীলা। সংসারে কে যে আপন কে যে পর বুঝা কঠিন।

মেয়েরা চলে গেলে কমলিনীব দিন যেন আর কাটে না। তার মনে একটা আশা আশংকার দোলাচল। বাসাটা মেয়েরা চলে যাওয়ায় মনে হয় একেবারে শূন্য হয়ে গেছে। মেয়েদের খবরের জন্য কমলিনী হাপিত্যেশ করে হেমেন্দ্রবাবুর ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছিলেন। অবশেষে হেমেন্দ্রবাবু ফিরে এসে সবকিছু কমলিনীকে বললেন। মেয়েরাও হেমেন্দ্রবাবুর হাতে একটি বিস্তারিত চিঠি দিয়েছিল। মেয়েদের চিঠি পড়ে তিনি বুঝতে পারলেন, তারা মোটেই মন খারাপ করে নেই। তবে বর্ণালীটার জন্য একটু চিন্তা। খুবই নরম মনের মেয়ে বর্ণালী। তবু যাহোক এখানকার মত সেখানেতো সারাক্ষণ ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতে হবে না। তাছাড়া একমেয়ের ছোটখাট চাকরীও হয়ে গেছে। হেমেন্দ্রবাবুর জন্যই আজ এটুকু হল। কমলিনীর মনে হেমেন্দ্রবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত রইল না। পৃথিবীতে এমন নিঃস্বার্থ উপকারী মানুষ যে আছে তা কমলিনীর জানা ছিল না।

বেশীদিন দেরী হল না। অল্প কিছুদিন পরেই পাঞ্চালীর স্কুলের এক প্রবীণ শিক্ষকের চেষ্টায় অন্য আর এক প্রাইভেট স্কুলে বর্ণালীরও চাকরী হয়ে গেল। বেতনটা আরও কম। তবু দু'জনের টাকায় কোন রকমে তিনজনের দিন চলে যায়। পাঞ্চালী বর্ণালী দুজনেই ম্যাট্রিক পাশ। তবু ওদের দুজনেরই চাকরী হয়ে গেল। আর মিতালী আই.এ পাশ। অথচ তার চাকরী হল না। মিতালী অবশ্য এতে দমে গেল না। কারণ ওরা খুবই উদ্যমী। বিদেশ বিভূঁয়ে এসে নিজেরপায়ে দাঁড়ানোর জন্য ওরা কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগল। তবে এখানে তাদের জীবনযাত্রাটা মোটেই সুখকর নয়। বাঁশের বেড়া দেওয়া ছোট একটি চালা ঘরে ওদের বাস। বাড়ীওয়ালার দেওয়া নড়বড়ে একটি তক্তাপোষে ওদের তিনজনের একত্রে ঘুম, এনামেলের একটা ছোট ডেকচিতে ভাত তরকারী সবই রান্না করা, কলাই করা ছোট ছোট থালায় তাদের ভাত খাওয়া। জীবনযাত্রার এমন নগণ্য উপকরণে এরা অভ্যস্ত নয়। তবু তাদের কোন দুঃখ নেই। তারা যে পাকিস্থানের ভয় আতংক ও বাড়ীর দমবন্ধ হওয়া পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়েছে, এটাই তারা পরম সৌভাগ্য বলে মনে করছে।

ত্রিপুরাতে বেশ কিছু সরকারী স্কুল ছিল। নূতন করে আরও অনেক স্কুল হচ্ছিল।

সরকারী স্কুলে মাইনে অনেক বেশী। তাই প্রাইভেট স্কুলের চাকরী বজায় রেখে ওরা সরকারী স্কুলে চাকরীর জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। এখানে আসার পর ধীরে ধীরে তাদের পরিচয়ের পরিধিও বাড়ছিল। তাই একে তাকে ধরে ওরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। যথার্থ চেষ্টা উদ্যম কখনও বিফলে যায় না। মিতালী সরকারী স্কুলে চাকরী পেয়ে গেল। ওদের চেয়ে মিতালীর মাইনেটা অনেক বেশী হওয়ায় ওরা এখন বেশ স্বচ্ছল হল। এরমধ্যে পাসপোর্ট করে কমলিনীও একবার এসে মেয়েদের দেখে গেছেন। এখানে মেয়েরা চাকরী করছে। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছে। মেয়েদের মানইজ্জৎ নিয়ে এখানে কোন টানাপোড়েন নেই দেখে কমলিনী খুবই স্বস্তিবোধ করলেন। আর মেয়েরা যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে তাতেও তিনি নিশ্চিন্তবোধ করলেন। কিন্তু সময়মত মেয়েদের বিয়েথার ব্যবস্থা করতে পারছেন না বলে তার মনে একটা অস্বস্তির কাঁটাও বিঁধে রইল।

মেয়েরা ত্রিপুরায় চলে গেলে কমলিনী কিশোরগঞ্জের ভাড়া বাসা ছেড়ে দিয়ে দুই ছেলে অঞ্জন ও সুমনকে নিয়ে বাড়ীতে চলে এলেন। দেশের অবস্থাও এখন অপেক্ষাকৃত ভাল। পবিত্রর সঙ্গেও তার সম্পর্ক এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। এতে কমলিনী মনে বড়ই শান্তি পেলেন। তবে ছন্নছাড়া গ্রামের স্কুলটিতে পড়াশোনা তেমন হয়না। এজন্য অঞ্জন সুমনের পড়াশুনার বেশ ক্ষতি হচ্ছে। এদের পড়াশুনার জন্য কমলিনীর মনে সবসময় একটা অস্বস্তি। নইলে বাড়ীতে এখন কোন অসুবিধে নেই কিছুদিন এভাবে থেকে যদি জমিটমি বিক্রী করে কিছু টাকার সংস্থান করা যায়, তবে ত্রিপুরাতেই একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নেওয়া যায়। আর মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থাও করা যায়। এ সম্বন্ধে পবিত্রর সঙ্গে কমলিনীর অনেক কথাবার্তা হয় এবং দু'জনে মিলে হিন্দুস্থানে একটা বাড়ী করার পরামর্শ করে। পবিত্রর সঙ্গে কমলিনীর আগেকার সুসম্পর্ক প্রায় ফিরে এসেছে। সবদিক থেকে ভাল থাকলেও পবিত্রর সঙ্গে অচলার বাড়াবাড়িটা তিনি মোটেই বরদাস্ত করতে পারছেন না। ঐ ডাকিনী যেন পবিত্রকে গুণ করে ফেলেছে। ওর জন্যই তার অমন সোনার ছেলে পর হয়ে গিয়েছিল। অচলা যে পবিত্রর ভবিষ্যতের মাথা খাচ্ছে তা পবিত্র বুঝতে না পারলেও তিনিত ঠিকই বুঝেন। পবিত্রর ভবিষ্যতের পথ পরিস্কার করার জন্য কমলিনী পবিত্রর বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন এবং অল্প চেষ্টাতেই ভাল মেয়েও পেয়ে গেলেন। পবিত্র বিয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত কমলিনীর দৃঢ়তার কাছে তাকে নতিস্বীকার করতে হল। কমলিনীর পছন্দ করা মেয়েকেই পবিত্র বিয়ে করতে বাধ্য

হল। দেবেন্দ্রের সন্তানদের মধ্যে এই প্রথম বিয়ে। তাই কমলিনী খুব ধূমধামের সঙ্গেই পবিত্রর বিয়ে সম্পন্ন করলেন। উৎসব অনুষ্ঠান,খাওয়া দাওয়া কোনদিকেই কোন ত্রুটি রাখলেন না।

নববধূ মনিকা পবিত্রর মত অতফর্সা নয়। তাকে সুন্দরী বলা যায় না। তবে খুব মিষ্টি চেহারা তার। স্বভাবও খুব নম্র। অচলার মত এত চাতুর্য সে জানেও না বোঝেও না। শাশুড়ীকে সে খুবই মান্য করে এবং নিজে থেকেই শাশুড়ীর সেবা যত্নের জন্য এগিয়ে আসে। কমলিনীও পুত্রবধূকে বড়ই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন।

পবিত্রর বিয়ের পরেই কমলিনী বড়মেয়ে পাঞ্চালীর বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। পাঞ্চালীর জন্য ত্রিপুরাতেই মোটামুটি একটি পাত্র যোগাড় হয়ে গেল। কমলিনী পাঞ্চালীর বিয়ের জন্য টাকা চাইলে পবিত্র কোনরকম আপত্তি না করে বিয়ের টাকা সংগ্রহ করে দিল। যথাসময়ে পাঞ্চালীর বিয়ে হয়ে গেল। কমলিনীর মাথা থেকে একটি বোঝা নামল।

মিতালী বর্ণালী চাকরী করছে, আবার প্রাইভেটে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পড়াশুনাও করছে। দিদির বিয়ের পর তারা মায়ের কাছে প্রস্তাব বাখল ছোট ভাইদের ত্রিপুরায় পাঠিয়ে দিতে। কারণ দেশের বাড়ীতে ওদের পড়াশুনা একেবারেই হচ্ছে না। প্রস্তাবটা কমলিনীর কাছেও ভাল বলেই মনে হল। ত্রিপুরায় গেলে ছেলেদের পড়াশুনা যেমন ভাল হবে, তেমনি মেয়েদুটোর একটু সুবিধেও হবে। বিদেশ বিভূঁয়ে একা একা দুটো মেয়ে পড়ে থাকার চেয়ে সঙ্গে যদি দুটো ভাই থাকে তবে শোভন হয়। কমলিনী তাই দেরী না করে অঞ্জন সুমনকে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে দিলেন। বর্ণালী তাদের নিজের স্কুলে ভর্তি করে দিল।

ছেলে মেয়েরা আছে ত্রিপুরায়। দুই মেয়ের উপার্জনে সেখানে সংসারও চলছে, ছেলেদের পড়াশুনাও চলছে। কমলিনী দেশের বাড়ীতে পড়ে আছেন সম্পত্তির প্রাপ্য অংশ বিক্রি করে কিছু টাকা পাবার আশায়। কিন্তু এ ব্যাপারে পবিত্রর একেবারে সাড়া নেই। সম্পত্তি তার হাতে। সে যদি বিক্রী টিক্রী করাব উদ্যোগ না নেয়, তবে কমলিনীর কিছুই করার ক্ষমতা নেই। সব সম্পত্তি বিক্রি করে পাকিস্থানের পাট উঠিয়ে পবিত্রকেও সঙ্গে করে ত্রিপুরায় নিয়ে যাওয়ার খুবই ইচ্ছে কমলিনীর। কিন্তু কমলিনীর প্রস্তাবটা শুনে পবিত্র একেবারে ছি ছি করে উঠল। ত্রিপুরার মত পাহাড় জঙ্গলে ভরা অনুন্নত জায়গায় কোন ভদ্রলোক বাড়ী করে নাকি? হিন্দুস্থানে যেতে হলে সে কোলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও যাবে না। কিন্তু হিন্দুস্থানে যাওয়ার মত তার কোন গবজ দেখা যায় না।

আসলে বিয়ের পরও সে চতুর অচলার প্রভাব মোটেই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অচলা যখন যে কুবুদ্ধি তাকে দেয়, সবই তার কাছে সুবুদ্ধি বলে মনে হয়। নূতন বউ মনিকা অতশত বুঝে না। সে খুবই সহজ সরল, বয়সও তার কম। পবিত্র তাকে যেমন চালায় সে তেমনি চলে। তাছাড়া অচলার চালাকী বুঝা তার মত সহজ সরল মেয়ের কর্ম নয়।

আত্মীয় পরিজনহীন ত্রিপুরায় চারটি অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে পড়ে আছে। তাদের কোন অভিভাবক নেই, ভাতজল দেওয়ারও লোক নেই। মেয়েরা চাকরী করছে। প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। তাই জীবনযাত্রা চালানোর জন্য অবশ্য করণীয় কাজগুলো করার সময় তাদের হয় না। তাই তারা মাকে চলে আসবার জন্য অনবরত চিঠির মারফত তাগাদা দিচ্ছে এবং কমলিনী যাচ্ছেন না বলে ওরা খুবই বিরক্ত হচ্ছে। কিন্তু কমলিনী যে কেন যেতে পারছেন না তা ওরা ছেলেমানুষ বলে ঠিক বুঝতে পারে না।

সম্পত্তির প্রাপ্য অংশের সবটা না হোক, অন্ততঃ কিছু অংশ বিক্রী করে যা হয় কিছু টাকা পাওয়ার জন্য কমলিনী অশেষ চেষ্টা করলেন। কিন্তু পবিত্র তাকে কপর্দকও দিতে নারাজ। গ্রামের কিছু মাতব্বর লোক ও কয়েকজন প্রজার সঙ্গেও শেষ চেষ্টাস্বরূপ কমলিনী কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাতেও কোন সুরাহা হল না। পবিত্রকে অসন্তুষ্ট করে কমলিনীকে সাহায্য করতে কেউই এগিয়ে এল না। অবশেষে ব্যর্থ কমলিনী হতাশ মনে রিক্তহস্তে দেশের মাটি ত্যাগ করে চিরদিনের মত ত্রিপুরায় চলে এলেন। এরপর থেকে পবিত্রর সঙ্গে কমলিনী ও তার সন্তানদের সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হয়ে গেল।

পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক আগেই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কেউ কারোর সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ রাখে না। তবে কোন এক অদৃশ্য সূতোর টানে প্রত্যেকের বিশেষ খবরগুলো প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে যায়। এরমধ্যে কেউ কারোর সুখের খবর পেলে দুঃখিত হয়। দুঃখদুর্দশার খবরপেলে পুলকিত হয়। আবার দুর্দশাদুর্গতির সঠিক খবর কানে না তুলে অতিরঞ্জন করে উপভোগ করে। এটাই হল এই পরিবারটির অধিকাংশলোকের হৃদয়ধর্ম। কমলিনীর কালো মেয়েরা যে শেষ পর্যন্ত চাকরীতে নেমেছে এ খবরটাওযথারীতি বাড়ীর সবার কানে পৌঁছে গিয়েছিল। ওরা মুসলমানদের হাতে লাঞ্ছিত হবে,এটা বড়ই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তাই বলে ওরা সম্মানজনক শিক্ষকতার কাজ করছে জানলেও তা মেনে নেওয়া যায় না। তাই তাদের মধ্যে রটনা হল ওরা একজন সিনেমা হলে ঝি গিরি করছে, একজন হোটেলে বাসন

মাজছে। আর একজন হাসপাতালে দাইয়ের কাজ করছে। কিন্তু ওরা যে বি. এ. এম. এ পাশ করে ফেলেছে,এটাও জেনেছে সবাই। এ প্রসঙ্গ সবাই সযত্নে চেপে গিয়ে ওদের কাল্পনিক অবমাননার বার্তা ছড়ায়। এসব রটনা করে তারা বড়ই আত্মতৃপ্তি লাভ করে। কারণ কালো মেয়ের পরিণতি কি কখনও ভাল হতে পারে? কমলিনীর মেয়েরা সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে হিন্দুস্থানে এসে এমন থিতু হওয়াটা কারোরই পছন্দ হয়নি। তাই তারা কমলিনীর মেয়েদের নামে নানা কেচ্ছা কাহিনী রটনা করে। এসব কথাও কেমন করে কমলিনীদের কানে পৌঁছে যায়। এই এক আশ্চর্য ব্যাপার। এসব রটনা শুনে কমলিনীর বড় দুঃখ হয় ।অথচ এই কমলিনীর হাতের অন্ন গিলেই এ বাড়ীর সবাই বড় হয়েছে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর আজ কমলিনীর মেয়েদের কাল্পনিক অধঃপতন চিন্তা করে কতই না পুলক প্রকাশ করছে। ঈশ্বর এদের অন্তরে এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধও দেননি। তবে এ পরিবারে কেউ কারোর ভাল দেখতে পারে না বটে, তবে সবারই সবচেয়ে বেশী পুলক প্রকাশের বিষয় হল কমলিনীর মেয়েদের যে কোন অপমানজনকপরিণতি। যদিও কমলিনীর মেয়েদের ওরকম পরিণতির কোন সম্ভাবনা আর নেই। কারণ চাকরী করতে করতে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়েওরা বি. এ. এম. এ পাশ করে ফেলেছে। ওদের ঐ পাশ করাটা বাড়ীর লোকের এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদেরও একটা বড়রকম জ্বালার কারণ হয়েছে। কমলিনীর মেয়েরা দেখিয়ে দিয়েছে বিয়ে ছাড়াও মেয়েদের প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সুন্দরতর ও সম্মানজনক অন্য পথও খোলা আছে।

সরাসরি খবর আদান প্রদান না হলেও খবর এদিক ওদিক যাওয়া আসা করে। দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর ওদিকেও কারোর কারোর সুখশান্তিতে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। দেবেন্দ্রের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই শচীন্দ্রের বড় ছেলের বিয়ে হয়। নূতন বউয়ের আচার আচরণে পরিবারের লোকজন মোটেই সুখী হয়নি। তবু দিন চলছিল একরকম। এরমধ্যেই শচীন্দ্র বায়ুরোগে আক্রান্ত হন। দিন দিন রোগের প্রকোপ বাড়তে থাকে এবং পরিবারের লোকেদের রোগী নিয়ে খুবই হয়রানি। ভোগ করতে হয়। মনের ভারসাম্যহীন অবস্থায় প্রায়, পাঁচ বছর জীবিত থেকে অনেক কষ্ট পেয়ে এবং অন্যকে অনেক কষ্ট দিয়ে অযত্নে অবহেলায় অবশেষে তিনি ভবের হাট থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। শচীন্দ্রের মৃত্যুর খববটা পর্যন্ত দেবেন্দ্রের পরিবারে জানানো হয়নি। কিন্তু তবু দেবেন্দ্রের পরিবারের লোকজন যথারীতি খবরটা অশৌচ থাকাকালীনই পেয়ে গিয়েছিল।।

গঙ্গামণির ছেলেমেয়েরা আর কেউই জীবিত নেই। এখন পরবর্তী প্রজন্মের জমানা। পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা অর্থাৎ গঙ্গামণির বংশধররা সবাই আছে হিন্দুস্থানেরই নানান জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। শুধু দেবেন্দ্রের ছেলে পবিত্র একা পাকিস্থানে রাজচন্দ্রের সম্পত্তি ভোগ করছে। কারোর সঙ্গে কারোর যোগাযোগ না থাকলেও দ্বেষভাব কারোর মন থেকে মুছে যায়নি। যারা অপেক্ষাকৃত কাছের মানুষ তারাও কারণে অকারণে একে অন্যের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। এ পরিবারের প্রতিটি মানুষ যেন একটা করে আলাদা দ্বীপে পরিণতহয়েছে ।এখন সবার সব খবর পাওয়া যায় না বটে তবে বিশেষ খবরগুলো বাতাসে ভর করে সবার কাছেই পৌঁছে যায়।

মহেশের তৃতীয় পক্ষের সন্তানরা মানে মর্যাদায় তেমন না হলেওশোনা যায় ধনে অনেক বড় হয়েছে। ধড়িবাজ সুজয় অবৈধ উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে খুবই ধনী হয়েছে। ধনের অহঙ্কারে সে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কেও আত্মীয় বলে স্বীকার করে না। ছোট ভাই সুনীল অবশ্য জীবনে তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তবু ওরা আছে ভালই।

মহেশের দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানরা কেউ কেউ বেশ উচ্চশিক্ষা লাভ করে প্রতিষ্ঠিত জীবনযাপন করছে। সুজয়ের মত ধনী না হলেও শিক্ষাজগতে তাদের বেশ নামডাক আছে। আবার কেউ কেউ দৈন্য দশায়ও ভুগছে। যার যার মত সবাই আছে। কারোর প্রতি কারোর অন্তরের টান নেই। দৈন্যদশা প্রাপ্তদের প্রতি সামান্যতম সাহায্য করার প্রবৃত্তি স্বচ্ছলদের নেই।' আত্মস্বার্থে তারা সবাই মগ্ন।

পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে করুণ পরিণতি হয়েছে মহেশের প্রথম পক্ষের ছেলে সৌভাগের। তার এই করুণ পরিণতির জন্য সে নিজেই দায়ী। তার রত্নতুল্য দুই ছেলে মোহন ও মাখনই তাকে এই করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। আদরে আস্কারায় ওরা একেবারে বখে গেছে। তাই ওদের লেখাপড়াও হয়নি। ছেলেরা যে একেবারে গোল্লায় যাচ্ছে, স্নেহে গর্বে অন্ধ সৌভাগ্য তা দেখেও দেখেনি। ছেলেরা যখন যা করতে চেয়েছে। তাতেই সে সায় দিয়েছে। ছেলেদের মা মাঝে মাঝে বাধা দিতে গেলে সৌভাগ্য তাতে বাদ সেধেছে। তাই বড় ছেলেটি হয়েছে মিথ্যাবাদী, লোভী প্রতারক, আর ছোটটি পাড় মাতাল। ছেলেদের এই অধঃপতন দেখেও সৌভাগ্যের বোধ জাগে না। তবু তাদের তোয়াজ করে। সৌভাগের এই প্রশ্রয়ের পরিণাম হল বড়ই বেদনাদায়ক। সৌভাগ্য তার বাড়ীসম্পত্তি সব ছেলেদের নামেই করেছিল।

ছলনাপটু লোভী মোহন কায়দা করে মদ্যপ ছোট ভাই মাখনের সই নিয়ে গোপনে সব সম্পত্তি বিক্রী করে পর্যাপ্ত টাকা নিয়ে সৌভাগ্যকে দিনসাতেকের জন্য গৌহাটী থেকে ঘুরে আসছে বলে চম্পট দিল। সৌভাগ্য ও তার স্ত্রী যোগমায়া কিছুই টের পেল না। মোহন যাবার সময় মাখনের হাতে কিছু টাকা তুলে দিল। মাখন সেই টাকায় বেশ কয়েক বোতল মদ গিলে মাতলামীর মাত্রা বাড়িয়ে দিল। মোহনের যাত্রপথে কোন বিঘ্ন ঘটল না। তারপর ক্রেতারা যখন বাড়ী জমি দখল করতে আসল, তখন সৌভাগ্য ও যোগমায়ার দুজনেরই চক্ষুস্থির। কিন্তু করারতো কিছুই নেই। যাদের বিষয় তারা বিক্রী করেছে। আর তারা নাবালকও নয় যে সৌভাগ্য একটা কিছু বিধিব্যবস্থা করতে পারবে। আদরের পুত্রের দুষ্কৃতির জন্য সৌভাগ্যকে সাধের জমিজমা অপরের হাতে তুলে দিয়ে পরিবারের হাত ধরে কপর্দকহীন অবস্থায় পথে বেরিয়ে আসতে হল। আর এদিকে মাত্র বাইশ বছর বয়স্ক মোহন এতটাকা পয়সা নিয়ে সেই যে গেল, আর ফিরে আসল না। শোনা যায়, যাদের কাছে সে সম্পত্তি বিক্রী করেছিল, তারা লোক ভাল নয়। মোহন টাকা পয়সা নিয়ে গৌহাটী গেলে তারাই লোক লাগিয়ে তাকে খুন করে টাকা পয়সা লুটে নেয়। পরিবারের সবাই ঘটনাটা জানল কিন্তু সৌভাগ্যের ধনী প্রতিষ্ঠিত ভাইরা তাকে একদিনের জন্যও আশ্রয় দিল না,বা দু'দশ টাকা দিয়ে সাহায্যও করল না অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। দুর্গত আত্মজনকে সাহায্য করা এ পরিবারের দস্তুর নয়। নিঃস্ব সৌভাগ্য স্ত্রীকে নিয়ে উঠল এক দূর সম্পর্কের দরিদ্র শ্যালিকার বাড়ীতে। মাখনের অবশ্য কোন আশ্রয়ের দরকার নেই। মদ খেয়ে অচৈতন্য হয়ে সে যেখানে সেখানে পড়ে থাকে।

এই আঘাতে এবং অভাবে সৌভাগ্যের শরীর মন একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাই শ্যালিকার আশ্রয়ে তাকে বেশীদিন থাকতে হল না। অনাহারে অবহেলায় দুঃখে সে মৃত্যু বরণ করল। খুবই করুণ তার মৃত্যু। ভাইরা সব শুনল। কিন্তু কেউ মৃতদেহ সৎকার করতেও এলনা। মাতাল ছেলেরও কোন হদিশ পাওয়া গেল না। শ্যালিকার স্বামী পুত্রেরা পাড়ার লোকজনের সাহায্যে কোনমতে দাহকার্য্য সম্পন্ন করল।

সৌভাগ্যেব স্ত্রী যোগমায়া বাপের একমাত্র সন্তান। তাই বাপমায়ের খুব আদরেই সে বড় হয়েছে। সৌভাগ্যও সারাজীবন তাকে অতিশয় যত্নেই রেখেছে। দুঃখ কাকে বলে তা যোগমায়ার জানা ছিল না। তাই আচমকা এতটা দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়ে স্বামীর মৃত্যুর পর সে বদ্ধ পাগল হয়ে গেল। পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে একদিন রেলের চাকার তলে মাথা দিয়ে সে নিজেই তার দুর্গত জীবনের অবসান ঘটাল। এর

অল্প কিছুদিন পরেই রাস্তার ধারে মাতাল মাখনের লাশও পড়ে থাকতে দেখা গেল। বেওয়ারিশ লাশ দেখে লোকে ভীড় করল। নিজস্ব গাড়ীতে সুজয়ও যাচ্ছিল ঐ পথে। ভীড় দেখে গাড়ী থামিয়ে নেমে লাশ দেখল ও চিনল। তুলে নিয়ে গিয়ে সৎকার করবে কিনা একটু ভাবল। তারপর গাড়ীতে স্টার্ট দিল। লাশ পড়ে রইল পিছনে।

সৌভাগ্যের এই পরিণতির জন্য সে নিজেই দায়ী একথা পরিবারের লোকজনের মধ্যে খুব আলোচনা হয়। ছেলেগুলো যে বিপথে যাচ্ছে দেখেও সে ওদের প্রশ্রয় দিয়েছে। আর এই প্রশ্রয় দেওয়ার ফলই সে পেয়েছে। মৃত সৌভাগ্য সম্বন্ধে তার ভাইদের মধ্যে এমন সমালোচনা হয়। কিন্তু তার করুণ পরিণতির জন্য তাদের মনে এতটুকু করুণার উদ্রেক হয় না। এক পিতার সন্তান হয়েও তারা বিপন্ন সৌভাগ্যের জন্য এতটুকু সাহয্যের হাত প্রসারিত করেনি। পরিবারের অন্যদের তো সাহায্যের মানসিকতার প্রশ্নই উঠে না। এ পরিবারে ভাইয়ের মনে ভাইয়ের প্রতি আছে শুধু বিদ্বেষ, ভালবাসার ছিটেফোঁটাও নেই।

দেবেন্দ্রের প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান পবিত্র পাকিস্থানের সম্পত্তির দখলদারী নিয়ে পাকিস্থানেই বসবাস করছে। পাকিস্থানে এখন উৎপাত উপদ্রব কিছুটা কম। যতটুকু আছে তার সঙ্গে পাকিস্থানে বসবাসকারী স্বল্পসংখ্যক হিন্দুরা নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলেও পাকিস্থানের অবশিষ্ট হিন্দুদের মধ্যে সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করে হিন্দুস্থানে চলে আসার তেমন আগ্রহ নেই। পাকিস্থান আসলে হিন্দুদের জন্য মোটেই নিরাপদ জায়গা নয়। পবিত্র সেখানে স্বজনহীন বন্ধুহীন অবস্থায় আছে। মাঝে মধ্যে যে উৎপাত উপদ্রবের সন্মুখীন হচ্ছে না তা নয়। তবু হিন্দুস্থান চলে আসার মানসিকতা তার নেই। কমলিনী স্থায়ীভাবে ত্রিপুরায় আসার পর দু'একবার চিঠির মারফত তাকে হিন্দুস্থানের যে কোন জায়গায় চলে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু পবিত্র সে পরামর্শ গ্রহণ করেনি। এমন কি মা ভাইবোনদের সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগের ব্যাপারেও সে মোটেই আগ্রহী ছিল না। এদিকে বড় ভাই হয়ে পবিত্র যে ছোট ভাইবোনদের প্রতি কোন দায়িত্ব কর্তব্য পালন করল না, এজন্য কমনিলীর ছেলেমেয়েদের মনে পবিত্রর প্রতি যথেষ্ট অনুযোগ, অভিযোগ, ক্ষোভ জমেছিল। তাই পবিত্রও তার বৈমাত্রেয় ভাইবোনদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ধীরে ধীরে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। কমলিনীর সন্তানরা অশেষ সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত বেশ ভালভাবেই দাঁড়িয়ে গেছে। সবাই যথেষ্ট বিদ্বান হয়েছে এবং চাকরীবাকরীও ভালই করছে। কিন্তু সংগ্রামকালে তাদের মধ্যে যে দৃঢ় ঐক্য ছিল

পরবর্তীকালে তা খানিকটা শিথিল হয়ে গেছে। একটা বিচ্ছিন্নতার ফল্গুধারা তাদের মধ্যেও সূক্ষ্মভাবে প্রবহমান। প্রাণপণ লড়াই করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেও বংশের ঐ বিশেষ বৈশিষ্টের প্রভাব তারাও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

শচীন্দ্রের ছেলেমেয়েরা শচীন্দ্রের মতই আত্মকেন্দ্রিক। তারা শচীন্দ্রের মত এতটা যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। বাপের মত দু'হাতে উপার্জনও করতে পারেনা। তাই তারা শচীন্দ্রের মত এত জাঁকের জীবন যাপন করতে পারছে না। তবু তারা মোটামোটি স্বচ্ছল অবস্থাতেই আছে। তাদের মধ্যে কোন ঝগড়া কাজিয়া নেই। কিন্তু তারাও ভাইবোন পরস্পর থেকে বিছিন্ন, নিজস্ব গণ্ডীতে একান্তভাবে সীমাবদ্ধ। বংশের বিচ্ছিন্নতার ধারা থেকে তারাও মুক্ত নয়।

রাজচন্দ্রের দৌহিত্রবংশ বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে জীবনযাপন করছে। মাঝখানে সময়ও গড়িয়ে গেছে অনেকখানি। পরিবেশের প্রভাবেও সময়ের ব্যবধানে তাদের জীবনযাপন প্রণালী ও মানসিকতার স্বাভাবিকভাবেই অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবে যতদূর খবর পাওয়া যায়, তাতে জানা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও তাদের একটা মিল রয়েছে। নীলগঞ্জে ওদের পূর্বপুরুষরা যেমন জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই একঘরে হয়ে দিন কাটিয়েছে, তালগাছের মত একা দাঁড়িয়ে থেকেছে, ওরাও সবাই প্রায় তাই থাকছে। ওরা স্বজনবিমুখ বলেই স্বজনবিহীন। আবার পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গেও কেন জানি ওদের মিল হয় না। কোন অজ্ঞাত কারণে ওদের বন্ধুও বড় একটা জোটে না। তাই ওরা প্রত্যেকেই যেন স্বজন বিহীন, বন্ধুবিহীন এক একটা নিঃসঙ্গ দ্বীপ।

সম্পত্তি সংক্রান্ত হিংসা বিদ্বেষ আজ আর কারো মনে রেখাপাত করে না। কোন অতীতে ভিন্নরাষ্ট্রে তাদের একটুকরো সম্পত্তি পড়ে রয়েছে, সেটা আজ আর কারোর মনেই পড়েনা। সেই যৌথসম্পত্তি আজ থেকেও নেই। তাই কারোর সঙ্গে কারোর স্বার্থের সংঘাতও নেই। এখন যে যেমন পারে করে খাচ্ছে। কারোর সঙ্গে কারোর স্বার্থসম্পর্কের লেশমাত্রও নেই। তবু সাবেককালের মত গঙ্গার বংশধরদের মধ্যে আত্মজনের মধ্যে ঈর্ষাবিদ্বেষের ধারাটি আজও সমভাবে প্রবাহমান। কিন্তু কেন এই অহেতুক ঈর্ষা? কেন এই বিদ্বেষ? এর কারণ কি নিষ্পাপ গঙ্গা-নব ও শৈলর হৃদয়বিদারক মরণ-বরণজনিত পাপের ফল?

রায়পরিবারের এই প্রবাহমান বাদ বিবাদ, ঈর্ষা-দ্বেষের সঙ্গে রাজচন্দ্রের কোন সংস্রব নেই। এগুলি তার কন্যা গঙ্গামণিরই ভাগ্যদোষ। দশভুজা দেবী দুর্গার ভক্ত

নিঃসন্তান রাজচন্দ্র দেবীর চরণে তাঁর বিত্ত ভোগ করার জন্য বংশধর যাচ্ঞা করেছিলেন। পুত্র-পৌত্র লাভ না হলেও দেবীর বরে রাজচন্দ্র কন্যা ও দৌহিত্র লাভ করেছিলেন এবং দৌহিত্রকে তার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকার দান করে রাজচন্দ্র হৃষ্টচিত্তে কালের নিয়মে - স্বর্গবাসী হয়েছিলেন। সে অনেক কাল আগের কথা। এই দীর্ঘসময়ের মধ্যে দেশকালের বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অখণ্ড ভারতভূমি ভারত ও পাকিস্থান এই দুই খণ্ডেবিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে। আবার অনেক সংগ্রামের ফলেপূর্ববঙ্গ পাকিস্থান থেকে আলাদা হয়ে 'বাংলাদেশ' নামে ভিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কালের বিবর্তনে কত গ্রাম কত শহর উৎসন্নে গিয়েছে। কত নূতন বসতি গজিয়ে উঠেছে। কত নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। কত নদীনালা খালবিল হেজে মজে গিয়েছে। মুসলমান রাষ্ট্র বাংলাদেশে রাজচন্দ্রের গ্রাম নীলগঞ্জ হিন্দুশূন্য হয়েছে। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয়, তথাপি রাজচন্দ্রের দৌহিত্র বংশের একটি ধারা বংশানুক্রমে কত বিপদ বরণ করে, মান খুইয়ে প্রাণ দিয়ে আজও রাজচন্দ্রের সম্পত্তি আঁকড়ে পড়ে আছে। বর্তমানে রাজচন্দ্রের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রাজচন্দ্রের বিষয় সম্পত্তির ভোগ দখলদার। দেশকালের এত উত্থান পতনের মধ্যেও এখন পর্যন্ত যে রাজচন্দ্রের দৌহিত্রবংশ রাজের বিষয় সম্পত্তি আগলে নীলগঞ্জ গ্রামে পড়ে আছে, তা দেবী দুর্গার কৃপাধন্য রাজচন্দ্রের প্রতি দেবীর কৃপাদৃষ্টির ফলেই সম্ভব হয়েছে কিনা কে জানে।